বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বাংলাদেশের অনুবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা

১৩তম বর্ষ ২য় ও ৩য় যৌথসংখ্যা এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০১৯

সম্পাদক
শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
কক্ষ: ৬০৪, ৬ষ্ঠ তলা, রোজভিউ প্লাজা, হাতিরপুল কাঁচাবাজার, ঢাকা ১২০৫ ।
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়হ
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী: সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

কম্পোজ
সম্প্রাট খান লিয়ন

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৩ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

এক ভাষাকে অন্য ভাষায় আকৃতিদানের একমাত্র পথ হচ্ছে অনুবাদ। ভাষান্তর করলেই অনুবাদ হয় না। অনুবাদ হয় চিন্তা বা চেতনার। ভাষা তার অবয়ব দেয় মাত্র। পৃথিবীর এক প্রান্তের সাহিত্যের ভাষান্তরিত চেতনা-স্বাদ অন্য প্রান্তের পাঠকের মননে জ্ঞানের যে সমৃদ্ধি ঘটায় তা কেবল এই শিল্পের মাধ্যমে সম্ভব। এ কারণে বিশ্বজুড়ে এই শিল্পের পাঠকপ্রিয়তাও ব্যাপক।

মধ্যযুগের সেই কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসের সময়কাল থেকে বাংলাভাষায় আনুবাদশিল্পের যাত্রা শুরু। বর্তমানে বাংলাভাষায় অনূদিত বিভিন্ন ভাষার রচনা-সাহিত্যের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু আমাদের বাংলাভাষার সাহিত্য-রচনা অন্যান্য ভাষায় কতটা অনূদিত হয়েছে এবং সেগুলো সংখ্যাগত ও শৈল্পিকমানে কতটা উন্নিত তা বিচার্যের বিষয়।

এক্ষেত্রে অনুবাদশিল্পীদের এবং এ-বিষয়ক রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক ভুমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রকাশকদের ভূমিকাও এক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ। অনুবাদশিল্পীরা এই শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারছেন না, যা এই শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। তারা প্রকাশকদের কাছ থেকে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতারিত হন হরহামেশা। ফলে তাদের মধ্যে বিরাজ করে অসন্তোষ।

অন্যের অনুবাদ নিজের বলেও প্রকাশ করার এক বিকৃত প্রবণতা দেখা যায় কারও কারও মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রে মূল বইয়ের সাথে অনুবাদের কোনো মিলও খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার বর্তমান সময়ে 'গুগল অনুবাদ' নামক আরেক ধরণের বিকৃত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অনুবাদ শিল্পের বাস্তব এসব সমস্যা ও সমস্যা থেকে উত্তোরণের নানা উপায় নিয়ে লিখিত প্রবন্ধ নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে 'হালখাতা'র এ সংখ্যাটি। আশা করা যায়, অনুবাদ-প্রিয় পাঠক অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে সচেষ্ট হবেন এ সংখ্যা থেকে।

সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা যুক্ত, তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

শরমিন নিশাত
সম্পাদক, হালখাতা
০১.০৯.২০১৯

সম্পাদকীয়: দুই

বাংলাদেশের বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চার ওপরই নির্ভর করে এই ভাষা ও সাহিত্যের দূরবর্তী ভবিষ্যৎ। এই ভাষার মধ্যদিয়ে গত শত শত বছরে যে সাহিত্য-সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিশাল সাহিত্যরাশিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরবার প্রধান দায়ও এই দেশটির।

আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে, সাহিত্য কেবল 'অনুবাদ'-এর মাধ্যমেই বিশ্বের কাছে তুলে ধরা সম্ভব। সুতরাং অনুবাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞা ও অবহেলার অর্থ হলো বিশ্বের কাছে নিজেদের ছড়িয়ে দিতে না চাওয়া। হয়তো সচেতনভাবে নয়, তবে বাস্তবে যা ঘটে গেছে সেটি হলো, গত আড়াই'শ বছরের বাংলাসাহিত্যকে বিশ্বের সামনে গলাটিপে শ্বাসরোধ করে রেখেছি আমরাই!

কোনো বড় কাজই একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ রকম দরিদ্র একটি দেশে অনিবার্যভাবে দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর। সে ক্ষেত্রে বলা যায় বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটির নাম 'বাংলা একাডেমী'। অথচ এই প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি হিসেব চাওয়া হয়, গত পঞ্চাশ বছরে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যের কতটুকু তারা ভিন্নভাষার পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছে, তাহলে খুবই হতাশাব্যাঞ্জক জবাব আসবে এই প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে। যা আমাদের ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল স্পিরিটের পরিপন্থি! সময় গড়াতে থাকে, সময় গড়িয়ে গেছে! কিন্তু এও বিশ্বাস করতে চাই, সময় ফুরিয়ে যায় না, ফুরিয়ে যায়নি! সে কারণেই আজ কথা বলে উঠেছে নতুন স্বর, নতুন গতি, নতুন যোদ্ধারা। আমরা নিশ্চয়ই কেবল রাস্তা, ব্রিজ আর মেট্রোরেলকেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন হিসেবে মেনে নিতে পারি না, আমরা মনে করি, মানুষের সৃজন আর মননের উন্নয়ন না ঘটলে সার্বিক উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না।

যার কারণে বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা' 'বাংলাদেশের অনুবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ' শীর্ষক সংখ্যাটি বের করবার প্রয়োজন বোধ করেছে।

এ সংখ্যায় দেশের উল্লেখযোগ্য অনুবাদ শিল্পী এবং অনুবাদ প্রেমীরা তাঁদের নিজ নিজ চিন্তা, পরামর্শ ও প্রস্তাব তুলে ধরেছেন।

সংখ্যাটিতে অনুবাদ বিষয়ক যে নানাবিধ সমস্যা এবং সমাধানসমূহ উঠে এসেছে, সেগুলো হালখাতার পাঠকদের এ-বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতে আরও সহযোগিতা করবে আশা করা যায়।

শওকত হোসেন
প্রধান সম্পাদক, বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা
০১ অক্টোবর ২০১৯

সূচি

প্রবন্ধ

অনুবাদের তত্ত্ব ও প্রসঙ্গ কথা
মোজাফ্ফর হোসেন ০৬

অনুবাদ নিয়ে বাদানুবাদ: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ
মো. আবু জাফর ২২

অনুবাদের চারটি দিক
খন্দকার স্বনন শাহরিয়ার ২৮

অনুবাদে কী পাওয়া যায়?
জাভেদ হুসেন ৩২

প্রবন্ধ

অনুবাদের সমস্যা: এক ও অনুবাদের সমস্যা: দুই
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ৩৭

সাহিত্য ও দর্শনের অনুবাদ নিয়ে ...
বিপাশা মন্ডল ৫০

সাহিত্যাকাশের উজ্জল এক মহাদিগন্তের নাম ভাষান্তর
জান্নাতুন নিসা ৫৬

অনুবাদ: সমৃদ্ধ করে ভাষার প্রকাশভঙ্গি ও সংস্কৃতি
অনন্ত উজ্জ্বল ৬৮

প্রবন্ধ

অনুবাদ ও বাংলা সাহিত্য
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ৭১

স্বাধীনতা-উত্তরকালের অনুবাদ সাহিত্য
আবদার রশীদ ৮১

একুশ শতকের দাবি ও সম্ভবনা: বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য: সমস্যা ও উত্তরণ
আ লী আ হ ম দ ৮৭
অনুবাদ চর্চা ও বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য
আ হ মে দ মা ও লা ৯৭
বাংলাদেশে অনুবাদ চর্চা
শা হ আ ল ম সা রো য়া র ১০০
বাংলাদেশের অনুবাদশিল্পের সম্ভাবনা ও সংকট
নূ র কা ম রু ন না হা র ১০৩
অনুবাদকের বর্তমান প্রেক্ষাপট
শৌ ফি ক বা বু ১১৮

ক থো প ক থ ন
বাংলাদেশে অনুবাদ চর্চায় করণীয়
আ মি নু ল ই স লা ম ভূ ই য়া, হা বী বু ল্লা হ সি রা জী ও জি. এইচ. হা বী ব ১২০

প্র তি ক্রি য়া
অনুবাদ নিয়ে দুটি কথা
শ ও ক ত হো সে ন ১২৮

অনুবাদের তত্ত্ব ও প্রসঙ্গ কথা

মো জা ফ্ ফ র হো সে ন

বিশ্বসাহিত্যে বহুল চর্চিত ও জনপ্রিয় বিষয় হল অনুবাদ। আবার একই সঙ্গে সমালোচিত বিষয়ও বটে। অনুবাদকে আমরা শিল্প ও সাহিত্যের অন্যতম আদি ফর্ম হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। লিখিত সাহিত্যযুগের শুরুই হয়েছে অনুবাদের ভেতর দিয়ে। কবিরা মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনি কিংবা লোকায়ত ধর্মের মর্মবাণী যে ছন্দে ছন্দে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা মূলত এক প্রকারের অনুবাদই। স্বভাষিক অনুবাদ। অনেক ভাষার ধ্বনির লিখিত রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে খ্রিস্টীয় ধর্মশিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন থেকে। বাইবেলের অনুবাদই ছিল সেখানে মূল উদ্দেশ্য। জ্যঁ দিলিল্লে ও জুডিথ উডসওয়ার্থ সম্পাদিত *Translators through History* বই থেকে জানা যায়, 'লিখনের সঙ্গেই ইতিহাসের জন্ম হল। সেই সঙ্গে অনুবাদেরও। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সুমেরীয় এবলাইট শব্দাবলি উৎকীর্ণ ৪ হাজার ৫০০ বছর পুরনো মাটির ফলক আবিষ্কার করেছেন। এই দ্বিভাষিক তালিকাগুলো সুদূরতম ইতিহাসেও অনুবাদের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। — প্রাচীন সভ্যতায় অনুলেখকরা লিখন, শিক্ষাদান এবং অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।' [অনুবাদক যুগে যুগে : জ্যঁ দিলিল্লে ও জুডিথ উডসওয়ার্থ, অনুবাদ জি এইচ হাবীব, সিল্করুট, বণিক বার্তা]।

অনুবাদের অর্থকে আরো প্রসারিত করলে আমরা বলতে পারি, সৃজনশীল সাহিত্যও এক ধরনের অনুবাদ — চিন্তা-চেতনার ভাষিক অনুবাদ। কাজেই বলা চলে সব ধরনের সাহিত্যই এক ধরনের অনুবাদ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে রচিত হয়েছে কাগজে। আক্ষরিক বা প্রায়োগিক অর্থে অনুবাদ বলতে আজ আমরা যা বুঝি সেটিও এসেছে বহু বছর আগে। অনুবাদসাহিত্যকে পৃথক এক জন্‌র হিসেবে বিবেচনা করলে, কাব্যসাহিত্যের পরপরই অনুবাদসাহিত্যের জন্ম। এরপর নাট্যসাহিত্য, মহাকাব্য এবং আরো অনেক পরে প্রবন্ধসাহিত্য ও কথাসাহিত্য এসেছে।

সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্যকর্ম হিসেবে গণ্য মেসোপটেমীয় মহাকাব্য *গিলগামেশ* — প্রায় ২১০০ খ্রিস্টপূর্বে রচিত। এই মহাকাব্যের যে ব্যাবিলনীয় সংস্করণ উদ্ধার করা গেছে তা মূল নয়, কপি বা অনুলিপি। একইভাবে বিশ্বসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস জাপানি ভাষায় লিখিত ৯৭৮

(মতান্তরে ৯৭৩) খ্রিস্টাব্দে মুরাসাকি শিকিবু রচিত *দ্য টেল অব গেঞ্জি* উপন্যাসটির মূল পা-ুলিপি পাওয়া যায়নি। বিপুলসংখ্যক নকল কপি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। তাই এসব অনুলিপির মধ্যে যে স্বভাষিক অনুবাদের ঘটনা ঘটেনি তা বলা যাচ্ছে না।

প্রথম সর্বাধিক অনূদিত গ্রন্থ পবিত্র বাইবেল। তবে পবিত্র বলেই বাইবেলের অনুবাদ তৎকালীন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত পি-তরা মেনে নিতে পারেননি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে গ্রিক ভাষায় অনূদিত বাইবেলকেই মনে করা হয় প্রথম ফরমাল অনূদিত গ্রন্থ। ইংরেজি ভাষায় বাইবেল অনুবাদের প্রারম্ভিক ইতিহাসটা সুখকর নয়। সপ্তম হেনরির দ্বিতীয় রানি অ্যান বোলিনের *কাজের মেয়ের ডায়রি* থেকে জানা যায়, বাইবেল-অনুবাদক উইলিয়াম টিনডেল এই অপরাধে সাজা পান। তাঁর সমর্থক জন ফিশার প্রথমে দেশত্যাগ করেন। তারপর দেশে এলে তাঁকে প্রাণদ- দেওয়া হয়। কারণ মনে করা হয়

— To write such a thing in English is ranking heresy. Latin has always been the language of religion. What will happen to the authority of the church if people start to take the mysteries of the God into their own hands? এর বহু বছর পর সপ্তদশ শতকে এসে কিং জেমস একটা পরিষদ গঠন করেন বাইবেল অনুবাদ করার জন্য। কিং জেমসের বাইবেল ইংরেজিতে অনুবাদ হয়। কেন অনুবাদ হবে তার কারণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : Translation is that which openeth the window, to let in the light; that breaketh the shell, that we may eat the kernel, that puteth aside the curtain, that we may look into the most Holy place, that removeth the cover of the well, that we may come by the water. (From the preface 'The translator to the reader') এই ভূমিকা থেকে জানা যায়, অনুবাদ প্রয়োজনীয় কেন। এক জগতের আলোকে অন্য জগতের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। এক ভূমির সুস্বাদু বৃক্ষের চারাগাছ অন্য ভূমিতে রোপণ করে সেই ফলের স্বাদ থেকে কাউকে বঞ্চিত না করতে চাওয়া। এ কাজ মহৎ নয়তো কি?

দুই.

বিশ্বের যে-কোনো জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশজুড়ে আছে। আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ছিল উদারভাবে গ্রহণের যুগ, প্রকারান্তে অনুবাদের যুগ। লেখকরা পারস্য, আরব ও ভারতীয় লোককথাকে স্বীয় সৃজনশীলতা মধ্য দিয়ে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন। অনুবাদকরা নিজে ছিলেন বড় কবি। যে কারণে বেশিরভাগই হয়ে উঠেছে স্বাধীন সৃজনশীল অনুবাদ। কখনো কখনো মৌলিক সাহিত্যের স্বীকৃতি পেয়েছে সেসব। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বাল্মীকি রচিত রামায়ণের প্রথম অনুবাদক পনেরো শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি হলেন প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কৃত্তিবাসের রামায়ণের নাম 'শ্রীরাম পদাবলী'। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী সতেরো শতকে রামায়ণ বিনির্মাণ করেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে। 'ফেমিনিস্ট স্টাডি' আধুনিক বিষয় হলেও তিনি সেই সময়েই রামায়ণের নারীবাদী পাঠ উপস্থাপন করেছেন;

তাঁর রামায়ণে সীতা প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেই অর্থে আমরা এটিকে 'সীতায়ন' বলতে পারি। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, অপর নাম বেদব্যাস, রচিত মহাভারতের প্রথম অনুবাদক ষোলো শতকের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পরাগল খান; ফলে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম ছিল পরাগলী মহাভারত। ভাগবত বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু। এজন্যে তিনি বাদশাহ রুকনউদ্দিন বরবক শাহের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন। তাঁর ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

এর বাইরে ইরানি কবি ফেরদৌসীর *ইউসুফ-জুলেখা* কাব্যের বাংলায় অনুবাদ করেন শাহ্ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ। ফারসি থেকে *লাইলি-মজনু* অনুবাদ করেন দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খায়ের। ফকির গরীবুল্লাহ ফারসি থেকে অনুবাদ করেন *জঙ্গনামা*। ফারসি থেকে *গুলেবকাওলী* অনুবাদ করেন নওয়াজিস খান, মুহম্মদ মুকীম। এছাড়া মধ্যযুগের নাথ সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, শায়ের এবং কবিওয়ালা, বটতলার পুঁথি সাহিত্য প্রভৃতি একপ্রকারের স্বাধীন অনুবাদ বলা চলে।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে অনুবাদের ধারা সম্পর্কে বুঝতে আমরা আলাওলের (১৬০৭-৭৩) অনুবাদের ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারি। আলাওলকে বাংলার জিওফ্রে চসার (আনুমানিক ১৩৪০-১৪০০ খ্রি.) বলা যেতে পারে। চসার কেবল ইংরেজি সাহিত্যের মহৎ কবি নন, অনুবাদকও। তিনি বোয়েথিয়াসের *Consolation of Philosophy* অনুবাদ করেছিলেন। ফরাসি ভাষায় রচিত অনেক সাহিত্যকর্ম তিনি নিজের মতো করে ইংরেজিতে রচনা করেছেন, যাঁর মধ্যে *Romaunt of the Rose* উল্লেখযোগ্য। চসার লাতিন থেকে ওভিদ ও ভার্জিল এবং ইতালীয় থেকে বোক্কাচিও'র রচনা অনুবাদ করেছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনভাবেই অনুবাদ করেছেন এবং যেখানে প্রয়োজন মনে করেছেন, সেখানে নানা কিছু যোগ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ স্বাধীন ও সচেতন রীতি অনুসরণ করেছেন আলাওল। তিনি প্রথমে প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের ভাষা আওয়ালী এবং পরে ফারসি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছিলেন। চসারের মতো তিনিও অনুবাদের ভেতর মৌলিক রচনা সংযুক্ত করে দিয়েছেন। আমরা জানি, আলাওলকে রোসাঙ্গের ফিরিঙ্গিরা ধরে নিয়ে যায়। তাঁর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পেয়ে রোসাঙ্গের মুসলিমরা তাঁকে বৌদ্ধ রাজ্যের মুসলিম মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের কাছে নিয়ে যায়। ১৬৫১ সালে আলাওল তাঁর আদেশে মুহম্মদ জায়সী রচিত সুফি প্রেমকাহিনি *পদুমাবৎ* বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। আলাওল ১৬৭১ সালে মজলিস নবরাজের আদেশে বারো শতকের ফারসি কবি নিজামী গঞ্জবী'র *সিকান্দারনামা* অনুবাদ করেন। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমসাময়িক কবিদের মতো আলাওল বাংলা ভাষায় কাব্যরচনা করা নিষিদ্ধ ও পাপের কারণ বলে মনে করেননি। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, সব কবির প্রতিভার উৎস এক এবং অনুবাদ করার সময়ও এই প্রতিভা দরকার। আলাওলের অনুবাদ পদ্ধতিকে ব্যাখ্যাত্মক বলে চিহ্নিত করেছেন দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো'র অধ্যাপক থিবো দুবের তাঁর 'আলাওলের অনুবাদ-পদ্ধতি' শীর্ষক গবেষণা গদ্যে।

তিনি বলেন, "অনূদিত কাব্যে মূলপাঠের ভাব সঠিকভাবে বহন না করলে নিজের মনের উক্তি প্রকাশ করা অনুচিত। এই কারণে আলাওল বলেন 'স্থানে স্থানে প্রকাশিমু নিজ মন উক্তি', অর্থাৎ সুযোগ পেলে বা দরকার হলে মূলপাঠ থেকে সরে গিয়ে নিজের মনের কথা প্রকাশ করব। সুতরাং আক্ষরিক অনুবাদের পাশে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ও উপাখ্যানের সংযোজন থাকে। এ দুটো ব্যাখ্যাত্মক উপকরণ মূলপাঠের অর্থ উদ্দীপনের জন্য কবি-অনুবাদক সংযোগ করেছেন।" ['আলাওলের অনুবাদ-পদ্ধতি', থিবো দুবের, ভাবনগর জার্নাল, ভলিউম-১, সংখ্যা-১, আগস্ট ২০১৪]।

আলাওলের আগে বিশ্বে যে গুটিকতক পণ্ডিত অনুবাদের কৌশলগত দিক নিয়ে ভেবেছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে চলে আসে জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদক মার্টিন লুথারের (১৪৮৪-১৫৪৬) নাম। আলাওলের মতো লুথারও মনে করতেন, অনুবাদ সবসময়ই এক ধরনের ব্যাখ্যা (interpretation). অনুবাদকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নৈতিক এবং পরিস্থিতিগত যথার্থতা অর্জন।

লুথারের বিরুদ্ধে অনুবাদের মাধ্যমে বাইবেল বিকৃত করার অভিযোগ উঠলে তিনি নিজের অবস্থান তথা তাঁর অনুবাদের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে দুটি প্রবন্ধ লিখে নিজ অনুবাদের পক্ষ সমর্থন করেছেন : Sendbrief vom Dolmetschen (অনুবাদ-বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি বা খোলা চিঠি, ১৫৩০) ও Summarien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens (স্তোত্রগুলোর অনুবাদের সমর্থনে কিছু কথা, ১৫৩১-৩৩)। লুথার বাইবেল পরিবর্তন করেছেন বা বিকৃত করেছেন এই মর্মে ক্যাথলিক কর্মকর্তারা যে অভিযোগ এনেছিলেন, তার জবাব দেওয়ার জন্য এ বই দুটো রচিত হয়েছিল।

আধুনিক সাহিত্য হয়ে উঠেছে আরো বেশি অনুবাদনির্ভর। বিশ্বায়ন ও পুঁজিনির্ভর এই যুগে বই প্রথমত পণ্য এরপর শিল্প হিসেবে গণ্য হচ্ছে। যে-কোনো ভাষার ভালো বই প্রকাশের পরপরই ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময় অনুবাদের ভেতর দিয়ে। ফলে বিশ্বে মৌলিক গ্রন্থের চেয়ে অনেক বেশি বিক্রি হচ্ছে অনূদিত গ্রন্থ।

তিন.

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভালো হয় উৎস ভাষা (Sourch Language) এবং লক্ষ্য বা উদ্দিষ্ট ভাষাতে (Target Language) প্রায় কাছাকাছি দক্ষতা থাকলে। যেমন আমরা জানি স্যামুয়েল বেকেট তাঁর বিখ্যাত অ্যাবসার্ড নাটক *ওয়েটিং ফর গডো* প্রথমে ফরাসি ভাষায় লিখে নিজেই আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। কবি টিএস এলিয়টও তাঁর 'ওয়েস্টল্যান্ড' কবিতাটির পঞ্চম অংশ 'Death by Water' প্রথমে ফরাসি ভাষায় লিখে পরে তা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ভ্লাদিমির নবোকভও বহুভাষিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথম উপন্যাস রুশ ভাষায় লেখেন, পরে ইংরেজিতে লিখে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পান। বাংলা ভাষায় আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথা বলা যেতে পারে, যিনি গালিবের গজলের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা বাংলা না হলেও তিনি বাংলা ভাষায় পণ্ডিততুল্য ছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ও ইংরেজি এবং বাংলা দুই ভাষাতেই লেখালেখি করেছেন। বর্তমানে

ফরাসিবিদ, এলিয়ট-বিশেষজ্ঞ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক চিন্ময় গুহ মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেন। তবে ভালো অনুবাদের জন্য দুটি ভাষায় সমান দক্ষতা থাকা অপরিহার্য না হলেও লক্ষ্য-ভাষায় পূর্ণ দখল থাকা দরকার।

অনুবাদের ক্ষেত্রে উৎস-ভাষার আভিধানিক অর্থ জানাই যথেষ্ট নয়। অঞ্চল ভেদে এমনকি সময়ভেদেও শব্দের প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক অর্থও জানতে হবে। একই ধরনের দুটি শব্দ পুরোপুরি ভিন্ন অর্থ বোঝাতে পারে। ইংরেজিতে 'pious' মানে ধার্মিক ব্যক্তি বোঝায়, অন্যদিকে ফরাসি ভাষায় এর অর্থ রসবোধসম্পন্ন মানুষ। ফ্রান্সে 'liberal' মানে ডানপন্থী, আমেরিকায় সেটা বামপন্থী। এমনকি সংস্কৃতিগত কারণেও স্থানভেদে এক স্থানের স্তুতিকথা অন্যস্থানে গালি হিসেবে ব্যবহারের নজিরও দেখা যায়। যেমন, যুক্তরাজ্যে 'fag' মানে সিগারেট, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে 'fag' বলতে হোমোসেক্সুয়াল পুরুষ বোঝায়। আবার আমেরিকানদের কাছে 'ব্লাডি' গালি না হলেও ব্রিটিশদের কাছে গালি হিসেবে চিহ্নিত। এই কারণে অনুবাদ কেবল ভাষাগত বিষয় নয়, সাংস্কৃতিক বিষয়ও বটে।

সংস্কৃতিকে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি মানুষের কতগুলো বিশ্বাস ও আচরণের সমষ্টি হিসেবে। বিশ্বাসের মধ্যে ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি ও আচরণের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতি। আর এসবেরই প্রকাশ ঘটে ভাষার মাধ্যমে। অনুবাদ এক্ষেত্রে ভাষা বদলের মধ্য দিয়ে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতিকে সম্পৃক্ত করে। নিডা ও টাবের অনুবাদের সংজ্ঞা থেকেও আমরা তেমনটি পাই। তাঁরা বলেন : 'অনুবাদ হচ্ছে উৎস ভাষার বিষয়বস্তুকে লক্ষ্য ভাষায় মোটামুটি কাছাকাছিভাবে প্রকাশ করা। কাছাকাছি বলতে প্রথমত, অর্থের দিক থেকে এবং দ্বিতীয়ত, রচনাশৈলীর দিক থেকে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়াবলি বিবেচনা করে বলা যায়, অনুবাদ বলতে সমার্থকবোধকে প্রকাশ করা বোঝায়, একই অর্থ প্রকাশ করা নয়।' [দ্য থিওরি অ্যা প্র্যাকটিস অব ট্রান্সলেশন]।

চার.

তাত্ত্বিকরা অনুবাদকে থিওরি হিসেবে দাঁড় করানোর পর নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আসছেন। ফলে অনুবাদের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ নিয়ে একক কোনো মত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই অনুবাদের প্রকারভেদ নিয়ে কথা বলতে হলে কয়েক প্রকারের অনুবাদ নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ক্যাটফোর্ড (১৯৬৫) অনুবাদের শ্রেণিবিভাগ করেন এর পর্যায়, বিন্যাস ও ব্যাপ্তি অনুসারে। নিডা ও টাব (১৯৭৪) যে দুই ধরনের অনুবাদের কথা বলেছেন, তা হল : অর্থ ও কাঠামো সমার্থক এবং ভাব-সমার্থক। তবে অনুবাদের একটি আধুনিক পদ্ধতি প্রস্তাব করেন নিউমার্ক (১৯৮২)। তিনি অর্থগত অনুবাদ, ভাব-বিনিময়গত অনুবাদ, অনুবাদ এবং সংস্কৃতি– এই তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, অর্থগত অনুবাদের ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়া হয় লিখিত বক্তব্যের ওপর। অন্তর্নিহিত শক্তি এখানে বিবেচ্য নয়। এক্ষেত্রে অনুবাদকের কাজ হয়ে থাকে উৎস-ভাষার বাক্যগঠন ও অর্থদ্যোতনা অপরিবর্তিত রেখে উদ্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা। অর্থগত অনুবাদের চেয়ে

ভাব-বিনিময়গত অনুবাদ অনেক বেশি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। তাই নিউমার্ক এ ধরনের অনুবাদকেই প্রাধান্য দেন।

অনুবাদ ও সংস্কৃতি বিষয়ে নিউমার্ক বলছেন যে, সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের কারণে সাংস্কৃতিক-পূর্বানুমান ও মূল্যবোধগুলো প্রতিটি সংস্কৃতির নির্দিষ্ট মানসিক বৈশিষ্ট্য তৈরি করে দেয়। এবং ধরে নেওয়া যায়, এ বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো কোনো সংস্কৃতিতে খুব কাছাকাছি। তাই বলে দুটো ভিন্ন সংস্কৃতির মানসিক বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি একরকম হয় এমন ঘটনা নিতান্ত বিরল। এই মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দিষ্ট সংস্কৃতির ভাষায় প্রতিফলিত হয়; আর ভাষা হচ্ছে এক ধরনের অদৃশ্য দেয়াল যা বিভিন্ন সংস্কৃতির কাছে পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে দেখায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশ্চিমা বিশ্বে ড্রাগন ভীষণ বিপজ্জনক প্রাণী অথচ প্রাচ্যদেশে সেটি সৌভাগ্যের প্রতীক। বাংলাদেশে কাউকে তুচ্ছার্থে 'গরু' বলা হলেও উত্তর আফ্রিকায় গরু সৌভাগ্যের প্রতীক।

ইংরেজ কবি জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) তাঁর Preface to Ovid's Epistles-এ অনুবাদকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন : মেটাফ্রেজ (Metaphrase), প্যারাফ্রেজ (Paraphrase) এবং ইমিটেশন (Imitation). Metaphrase হল 'word for word and line by line' অনুবাদ; যাকে বলা যায় আক্ষরিক অনুবাদ। Paraphrase বিশ্বস্ত স্বাধীন অনুবাদ। অনুবাদক মূলের শব্দগুলো হুবহু অনুসরণ না করে তার অর্থকে অনুসরণ করেন। কখনো কখনো পুরো বাক্যাংশ কিংবা বাক্যও পাল্টে যেতে পারে। একে 'sense for sense' অনুবাদও বলা যায়। Imitation হল এটা এক ধরনের অনুকৃতি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলছেন প্রতিরূপ। এ অনুবাদে শাব্দিক ও ভাবগত সাযুজ্য উভয়কে বিসর্জন দেওয়া হয়। এটি স্বাধীন অনুবাদ না অনুসরণ, তা নিয়ে মতভেদ আছে।

Metaphrasing বা আক্ষরিক অনুবাদ সাধারণত বিজ্ঞান বা টেকনিক্যাল বিষয়ে করা হয়। সাহিত্যের আক্ষরিক অনুবাদকে অনেকে আদর্শিক অনুবাদ হিসেবে মনে করেন না। তবে যাঁরা আক্ষরিক অনুবাদকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁদের মধ্যে উচ্চস্বরে উচ্চারিত হয় হোর্হে লুই বোর্হেসের কথা। লাতিন বিশ্বের এই মহান লেখক অনুবাদশিল্প নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন ১৯৬৭ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নরটন লেকচার' নামে খ্যাত এক বক্তৃতায়। বোর্হেস সেখানে দৃষ্টান্তসহ আক্ষরিক অনুবাদের সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরে মূলের চেয়ে অনূদিত কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আসলেই কি অনুবাদ মূলকে ছাপিয়ে যেতে পারে? বোর্হেস বলছেন : 'আক্ষরিক অনুবাদ শুধু, যেমনটা ম্যাথু আর্নল্ড বলেছেন, অভব্যতা ও অস্বাভাবিকতাই নিয়ে আসে না, সঙ্গে আরও আনে অচেনা অনুভূতি ও সৌন্দর্য।' [মাসরুর আরেফিন : 'বোরহেস ও আক্ষরিক অনুবাদের সৌন্দর্য', কালের খেয়া, দৈনিক *সমকাল*]। তবে বোর্হেস এই আক্ষরিক অনুবাদ বলতে শব্দ ধরে ধরে অনুবাদ নয়, বোধের বিশ্বস্ত অনুবাদের কথা বলছেন। কারণ আমরা জানি, অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভবও নয়। আক্ষরিক অনুবাদে মূলকে অক্ষুণ্ন রাখতে গিয়ে বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। উদাহরণ হিসেবে খন্দকার আশরাফ রচিত 'তরজমার জমাখরচ' প্রবন্ধ থেকে একটা অংশ উদ্ধৃত করছি : 'কবিতা বা কাব্যমি-ত রচনার আক্ষরিক অর্থাৎ

অভিধানে দেয়া অনুবাদে কী হয় তার একটি নমুনা আমাকে দেখিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তাঁরই এক বন্ধু, তিনিও বিখ্যাত, কিন্তু নাম বলছি না, শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকের বিখ্যাত স্বগতোক্তি 'To be or not to be'-এর অনুবাদ করতে গিয়ে একটি মজার কা- করেছিলেন। ঐ স্বগতোক্তির এক জায়গায় আছে, Aye, there is the rub– 'সেখানেইতো সমস্যা', বা 'ও জায়গাটাই তো বিঁধছে'; অনুবাদক লিখলেন, 'হ্যাঁ, সেখানেই তো ঘষাঘষি।' রবীন্দ্রকাব্যের অনুবাদক টমসন সাহেবও এরকমভাবেই 'অরূপরতন' শব্দটির অর্থ করেছিলেন 'ugly gem'! শুধু শব্দের অর্থবিভ্রাট নয়, বিভ্রাট ঘটে অন্যত্রও। একটি সাহিত্যকর্ম একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকেও বিম্বিত করে। সেই পরিমণ্ডল সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে অনুবাদক বিপদগ্রস্ত হন সহজেই। কয়েক বছর আগে জীবনানন্দ দাশের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে এক অনুবাদক 'সিন্ধুসারস' শব্দটির অনুবাদ করেছিলেন 'The Indus Stork' : সিন্ধু বলতে তিনি সমুদ্র না বুঝে পাকিস্তানের সিন্ধু নদী বুঝেছিলেন।' [তর্জমার জমাখরচ। শাশ্বতিকী অনুবাদ সংখ্যা, সম্পাদক বর্তমান আলোচক]

ইংরেজি ভাষায় ছন্দ মাপা হয় মিটার বা স্ট্রেস মেপে, বাংলায় মাত্রা দিয়ে। কাজেই গদ্যের আক্ষরিক অনুবাদ কিছুটা সম্ভব হলেও কবিতার আক্ষরিত অনুবাদ সম্ভবই নয়। তাছাড়া খালিকুজ্জামান ইলিয়াস 'অনুবাদের সৃজনশীলতা' প্রবন্ধে যেমনটি বলছেন, 'সেতারে যেমন বেহালার স্বর নেই, সানাইয়ে নেই পিয়ানোর স্বর, তেমনি এক ভাষায় নেই অন্য ভাষার স্বর।' তাই সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা আদর্শ অনুবাদ বলতে paraphrasing বা মূলানুগ অনুবাদকে বুঝি। imitation বা অনুকৃতি স্বাধীন অনুবাদ নয়, কারণ এখানে মূলটা অনেক সময় হারিয়ে গিয়ে নতুন একটি টেক্সটের জন্ম হয়। বড়মাপের কবিরা সাধারণ এই ধরনের অনুবাদ করে থাকেন। এজন্যে বলা হয়ে থাকে কবিরা আদর্শ অনুবাদক হতে পারেন না। ওক্টাবিও পাস তাই বলছেন, 'তাত্ত্বিকভাবে কবিদেরই উচিত কবিতার অনুবাদ করা। কিন্তু প্রায়োগিকভাবে লক্ষ করা যায়, খুব কমসংখ্যক কবিই ভালো অনুবাদক।' [অনুবাদ : সাহিত্য ও আক্ষরিকতা, অনুবাদ : আবদুস সেলিম] অধিকাংশ সময় দেখা যায়, কবিরা অনুবাদের মাধ্যমে মূলকে নিজের করে ফেলেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখব বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের কবিতা বিদেশি কবিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে অনেক কিছু গ্রহণ করেছে। সেটা এক ধরনের অনুবাদই। কিন্তু এমন করে আত্মস্থ করে স্বভাষায় প্রকাশ করেছেন যে সেটি আর মূলানুগ থাকেনি। স্বাধীন সৃষ্টি হিসেবে আমরা সেগুলো গ্রহণ করতে পারি। একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের 'হায় চিল' কবিতা প্রখ্যাত আইরিশ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটসের 'He Reproves the Curlew' কবিতাটির অনুকরণে লেখেন। বোঝার জন্য দুটি কবিতা আমি পরপর তুলে দিচ্ছি :

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো না ক' উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে;

পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে-যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে, হায়, হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদো না ক' ধানসিড়ি নদীটির পাশে। [হায় চিল: জীবনানন্দ দাশ]

O CURLEW, cry no more in the air,
Or only to the water in the West;
Because your crying brings to my mind
Passion-dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my breast:
There is enough evil in the crying of wind. [He Reproves the Curlew: William Butler Yeats]

অনুরূপভাবে প্রায় হুবহু অনুকৃতি না হলেও এডগার এলেন পো'র 'টু হেলেন' কবিতাটির সঙ্গে বিষয়গত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতার সঙ্গে। ফ্রস্টের বিখ্যাত ও বহুল পঠিত কবিতা 'Stopping by Woods on a Snowy Evening'-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন শামসুর রাহমান। গীতিধর্মী কবিতাটির তিনি অনুবাদ করেন ছড়াধর্মী ছন্দে। কিছু চিত্রকল্পের অনুবাদ করেছেন মূল থেকে সরে গিয়ে। The woods are lovely, dark and deep-এর বাংলা করেছেন 'কাজল গভীর এ-বন মধুর লাগে'। আবার My little horse must think it queer-এর অনুবাদ করেছেন 'ঘোড়াটা ভাবছে ব্যাপার চমৎকার'। ফ্রস্টের কথাটা এখানে বদলে গেছে। একইভাবে Tree at My Window কবিতার Vague dream-head lifted out of the ground, And thing next most diffuse to cloud-এর অনুবাদ করেছেন 'মাটি থেকে উঠে এলো আবছা স্বপ্ন-চূড়ো আর তারপর কুয়াশার মেঘ এলো ছেয়ে'। এটিও বেশ স্বাধীন অনুবাদ। এই কারণে বাংলাদেশের এই প্রখ্যাত কবি বিশ্বস্ত অনুবাদক হয়ে উঠতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* অনুবাদ, ঈশ্বরচন্দ্রের *ভ্রান্তিবিলাস* বা গিরীশ ঘোষের *ম্যাকবেথ*, মুনীর চৌধুরী ও প্রফেসর কবীর চৌধুরীর *ওথেলো*, সৈয়দ শামমুল হকের *ম্যাকবেথ* — এগুলোও অনুবাদ করা হয়েছে মূল থেকে খানিকটা সরে এসে। এক ধরনের পুনর্লিখনের প্রয়াস সেখানে আছে।

অনুকৃতির আরো চমৎকার উদাহরণ হতে পারে শেকসপিয়রের নাটকগুলো। শেকসপিয়রের প্রায় সব নাটকই কোনো না কোনো প্রচলিত কাহিনি বা লোককথার পুনর্নির্মাণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বিশ্বের বড় বড় লেখক এই কাজটি করেছেন। যেমন রবার্ট ব্রাউনিং যখন 'The Pied Piper of Hamelin' লেখেন তখন সেটিও নতুন সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। ড্রাইডেনের ভাষায় এগুলোকে ইমিটেশন বলা যায় : 'মূলের সংকেত দ্বারা অনুপ্রাণিত স্বাধীন ও নতুন সৃষ্টি। ড্রাইডেন যদিও ইমিটেশনকে অনুবাদেরই একটা শ্রেণি হিসেবে গণ্য করেছেন, তবে তাকে গুরুত্ব দেননি।'

[ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ/জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী]। একইভাবে বোর্হেসও ইমিটেশনকে অনুবাদের আওতায় ফেলে বিচার করতে চাননি। তিনি বলছেন, "মূলকে ছাপিয়ে অনুবাদ যদি বেশি ভালো হয়ে যায় তাহলে তা আর 'অনুবাদ'ই থাকে না, হয়ে যায় সৃজনশীল নতুন সাহিত্য। তো, বিচারের বিষয় যখন অনুবাদ, তখন এমন অনুবাদ নিয়ে বলার আর কীই-বা থাকে, যা কিনা মূলের চেয়েও সুন্দর, অর্থাৎ অন্য অর্থে, যা কিনা আর অনুবাদই থাকছে না?" [মাসরুর আরেফিন/বোর্হেস ও আক্ষরিক অনুবাদের সৌন্দর্য]।

মধ্যযুগের কবি আলাওল, অনুবাদক হিসেবে যাঁর পরিচিত আমরা আগেই পেয়েছি, অনুবাদের তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করেছেন:

১. ভিন্ন ভাষায় মূলপাঠের অর্থ বোঝা

২. রসনির্ণয় করার উদ্দেশ্যে মূল কাব্যের রূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা

৩. নির্ণীত রস পুনরায় বহন করার জন্য বাংলা ভাষায় নতুন সাহিত্য ভাজন, অর্থাৎ পাঁচালি কাব্য রচনা করা— যাতে সভাসদরা পূর্ণভাবে রস উপভোগ করতে পারে।

পাশাপাশি আলাওল অনুবাদের তিনটি ক্রিয়া উল্লেখ করেন :

১. বুঝন — অর্থাৎ মূল পাঠের ভাষার বাচ্যার্থ বোঝা

২. ভাঙন — অর্থাৎ বাচ্যার্থ থেকে কাব্যের আন্তরিক ভাব ব্যাখ্যা করা

৩. কহন — এই সাহিত্যিক ভাব অনুভব করে পাঠক বা দেশি শ্রোতাদের সন্তোষের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় পাঁচালি রচনা করা। [কবি আলাওলের অনুবাদ-পদ্ধতি, থিবো দুবের, ভাবনগর, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা]।

পাঁচ

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করতে গেলে কাছাকাছি সমার্থক শব্দ বা near-equivalent নিয়ে ভাবতে হয়। মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক ইউজেনে নিদা এই সমার্থক শব্দ নির্বাচনের প্রয়াসকে দুভাবে চিহ্নিত করেছেন। একটি হচ্ছে Formal equivalence-এর অনুসন্ধান, অন্যটি Dynamic equivalence-এর অনুসন্ধান। প্রথমটি অনেকটা কাছাকাছি বা আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়াস। দ্বিতীয়টি লক্ষ্য ভাষায় যুতসই সমার্থক শব্দ বের করা। একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, একটি ভাষার অধিকাংশ শব্দের হুবহু প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় হয় না। এমনকি আন্তঃভাষাতেও সেটি সম্ভব নয়। অনেক সময় অর্থ হুবহু এক হলেও ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা আলাদা হওয়ার কারণে গ্রহণ করা যায় না। যেমন, বাংলা ভাষায় 'বিফল' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে অভিধানে আমরা পাই : ফলহীন, অচল, নিষ্ফল, অসমর্থ, ব্যর্থ। এর কোনোটিই বিফলের সম্পূর্ণ চরিত্র ধারণ করে না। ইংরেজিতে বহুল ব্যবহৃত 'সিরিয়াস' শব্দটির যে ব্যবহারিক ব্যাপ্তি, তা ধারণ করে এমন কোনো যুতসই প্রতিশব্দ বাংলাতে নেই। যে কারণে serious person, serious subject, serious issue, serious art— প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদের সময় সিরিয়াসের ভিন্ন ভিন্ন সমার্থক শব্দের

প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ অনুবাদ করার সময় অনেকগুলো অপশনের ভেতর বোঝাপড়া বা নেগোসিয়েশন করতে হয়। ইতালির কথাসাহিত্যিক উমবার্তো ইকো যে কারণে বলছেন, অনুবাদ মানেই হল নেগোসিয়েশন। তাঁর একটা বই আছে অনুবাদবিষয়ক : *মাউস অর র‍্যাট?* ইঁদুরের ইংরেজি প্রতিশব্দ মাউস হবে না র‍্যাট হবে। সিদ্ধান্তটা অনুবাদক নেবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে। আমি নিজের অনুবাদ থেকে একটা উদাহরণ দিতে পারি। মার্কিন গল্পকার এডগার এলান পো'র *A Tell Tale Heart* গল্পটি আমি অনুবাদ করে বিপদে পড়ে যাই শিরোনাম নিয়ে। আমি শিরোনামের অনুবাদ করার পক্ষপাতী। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন শেকসপিয়রের *As You Like It* বা ড্যানিয়েল ডিফো'র *Treasure Island*-এর মতো বিখ্যাত বইগুলোর নাম বিশ্বের সকল ভাষার সাহিত্যপ্রেমীদের মুখে মুখে থাকার কারণে এ ধরনের জনপ্রিয় বইগুলোর শিরোনাম ইংরেজিতেও রাখা যায়। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় অনুবাদ করলেই বরং বুঝতে সমস্যা হয়। এ ক্ষেত্রে *As You Like It* শিরোনামটি বাংলা বর্ণে 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' রাখা যেতে পারে। *A Tell Tale Heart*-এর ক্ষেত্রে সেটি করা যাচ্ছে না কারণ 'এ টেল টেল হার্ট' লিখলে Tell এবং Tale-এর বানানগত এবং অর্থগত পার্থক্য ধরা পড়ে না। ফলে একে বাংলা করা যুক্তিসংগত। *A Tell Tale Heart*-এর অনেকগুলো সম্ভাব্য বাংলা আমি দাঁড় করাতে চেষ্টা করি। 'কথা বলা হৃদয়', 'বাচাল হৃদয়', 'কথক মন' প্রভৃতি। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক অসীম কুমার দাসের সঙ্গে আলোচনা করে বাংলা করেছি 'বেফাঁস হৃদয়'। আরো অনেক অপশন নিশ্চয় আছে। অনুবাদক যৌক্তিক একটা বেছে নেবেন। এভাবেই একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটের অনুবাদ করার সময় অনুবাদককে অসংখ্যবার নেগোসিয়েশনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এটা করতে গিয়ে মূল টেক্সটের একটা সমালোচকীয় পাঠ দাঁড় করান তিনি। কবি-সমালোচক এজরা পাউন্ডও বলছেন সে কথা। তাঁর মতে, অনুবাদ হল 'এ ফর্ম অব ক্রিটিসিজম'। অর্থাৎ অনুবাদ হচ্ছে মূল টেক্সটের সমালোচকীয় পাঠ। যে কারণে একই টেক্সট ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণিক পাঠ হয়।

এসব বিবেচনায় অনুবাদ সবসময় কঠিনসাধ্য একটি কাজ। অনুবাদে আরো কিছু সমস্যা আছে যা কখনোই দূর হওয়ার নয়। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক যেমনটি বলছেন, 'Yet language is not everything. It is only a vital clue to where the self loses its boundaries. The ways in which rhetoric or figuration disrupt logic themselves point at the possibility of random contingency, beside language, around language.' [The Politics of Translation]; দুটি ভাষা দুটি সংস্কৃতির বোধকে ধারণ করে, অনুবাদের ভেতর দিয়ে এ দুটোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার কাজটি করা হয়। এ কারণে উৎস ভাষাগোষ্ঠীর ইতিহাস-সংস্কৃতি-মিথ-সামাজিক আচার ইত্যাদি গভীরভাবে জানা দরকার। সবচেয়ে ভালো হয়, অনুবাদক যে দেশের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করছেন সে দেশে কিছুকাল যাপন করতে পারলে। অর্থাৎ ভাষা শেখাটাই এখানে সব না। গ্লোবাল ইংরেজি আর স্থানিক ইংরেজি সবসময় এক হয় না। যে কারণে অভিধানের অর্থ সর্বত্র চলে না। নিশ্চয় ভাষা সবসময় কনটেক্সচুয়াল। অনুবাদককে সেটা ধরতে

হবে। না হলে জীবনানন্দ দাশের 'হয়তোবা হাঁস হবো— কিশোরীর— ঘুঙুর রহিবে লাল পায়'-এর অনুবাদ করতে গিয়ে হাঁসের লাল পায়ের ঘুঙুর উঠে যাবে কিশোরী পায়ে, যেমনটি কিছু কিছু অনুবাদে হয়েছেও।

কেউ যদি অনুবাদের ক্ষেত্রে একক কোনো লেখককে বা একই দেশ বা অঞ্চলের লেখকদের বেছে নেন তবে কিছু সুবিধা তিনি লাভ করতে পারেন। যেমন : বিখ্যাত অনুবাদক এডিথ গ্রোসম্যান ইয়োসা-মার্কেজ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, পাশাপাশি তিনি *দন কিহোতে* অনুবাদ করেছেন। গ্রোসম্যান অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর এক ভাষণে বলছেন, 'Fidelity is surely our highest aim, but a translation is not made with tracing paper. It is an act of critical interpretation. Let me insist on the obvious: Languages trail immense, individual histories behind them, and no two languages, with all their accretions of tradition and culture, ever dovetail perfectly…A translation can be faithful to tone and intention, to meaning. It can rarely be faithful to words or syntax, for these are peculiar to specific languages and are not transferable.'

ছয়.

অনুবাদ সাহিত্য সাহিত্যের চূড়ান্ত মর্যাদা পেতে পারে কিনা এ নিয়ে একটা মৃদু তর্ক বা সংশয় রয়েই গেছে। এ তর্ক যারা করেন তাঁরা উদ্ধৃত হিসেবে ব্যবহার করেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই কথাটি— অনুবাদে যা হারায়, তাই কবিতা। অনেকটা একই কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেন, 'বাছুর মরে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না, তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড়ভর্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরি করা হয়, তার গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে। তর্জমা সেইরকম মরা বাছুরের মূর্তি — তার আহ্বান নেই, ছলনা আছে। এ নিয়ে আমার মনে লজ্জা ও অনুতাপ জন্মায়। সাহিত্যে আমি যা কাজ করেছি তা যদি ক্ষণিক ও প্রাদেশিক না হয়, তবে যার গরজ সে যখন হোক আমার ভাষাতেই তার পরিচয় লাভ করবে।' অনুবাদের বিপরীতে ইতালির প্রচলিত একটা প্রবাদ আমরা স্মরণ করতে পারি : Traduttore, traditore অর্থাৎ Translator, traitor যার যুতসই বাংলা করেছেন অনুবাদক-ভাষাবিদ হায়াৎ মামুদ 'তর্জমা-জোচ্চুরি'। এর কারণ হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন : "পি-তজন প্রশ্ন করতে পারেন : ভাই, এটা কী হল? বলা হচ্ছে Translator-traitor, আর তুমি করলে translation-treason? ঠিকই, অভিযোগে যুক্তি আছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করে তখন বলব, 'আমি মাছিমারা কেরানি হইনি, আমি আমার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়েছি।' বলব, 'যে-কেউই তো লিখবেন 'অনুবাদক-প্রতারক', কিন্তু আমি লিখি 'তর্জমা-জোচ্চুরি', কেননা আমি ঐ খেলাটা হাতে-কলতে খেলতে চাই।" [অনুবাদে সৃজনশীলতার সীমানা, হায়াৎ মামুদ]

এই উন্নাসিকতার বিপরীতেও অনুবাদ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। বেনজামিন তাঁর 'দ্য টাস্ক

অব দ্য ট্রান্সলেটর' প্রবন্ধে বলছেন, অনুবাদের কাজ হল মূলের ঘাটতি কাটিয়ে উঠে একটা আদর্শ টেক্সটের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া। অর্থাৎ অনুবাদ মূলের চেয়েও খাঁটি। কথাটা বোর্হেস একটু ঘুরিয়ে বলছেন। তাঁর মতে, 'অনুবাদের জন্ম মূলের পরে হওয়ায় অনুবাদ মূলের চেয়ে বেশি আধুনিক এবং যে কারণে বেশি সভ্য। তিনি আরো বলছেন, আমরা যখন কোনো ভালো অনুবাদ পড়ি, তখন কতই-না ভালো হতো যদি আমরা না জানতাম যে কোনটা মূল আর কোনটা অনুবাদ। তখন দেখা যেত অনেক সময়েই আমাদের যেটা বেশি ভালো লাগছে সেটা মূল নয়, বরং মূলের ভাষান্তর। কোনটা বেশি ভালো কাজ, সে বিচারটা তখন অনেক নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে করা যেত।' [মাসরুর আরেফিন/বোর্হেস ও আক্ষরিক অনুবাদের সৌন্দর্য]। মার্কেজও প্রায় একই কথা বলেছেন তাঁর *ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিটিউড* উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদক গ্রেগরি রাবাসা সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে। তিনি বলেন : 'অনূদিত কর্ম মূলের চেয়ে ভালো কি খারাপ তা আমাকে ততটা আগ্রহী করে না যতটা করে এই সত্য যে অনুবাদকর্মে রত হওয়ার অর্থই হল সৃজনশীলতার ধারণার মোকাবিলা করা। সব লেখাই পূর্ববর্তী লেখাকে মুছে নতুনভাবে জন্ম নেয়—এমন উত্তরাধুনিক মতামতকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানতে হয় এবং অনুবাদশিল্প হল সেই সম্ভাবনারই একেবারে আক্ষরিক প্রতিরূপ।' [খালিকুজ্জামান ইলিয়াস/ অনুবাদের সৃজনশীলতা]।

একবিংশ শতকে এসে 'অনুবাদ সাহিত্য কিনা' এই তর্কের অবসান ঘটা দরকার। কেননা এটা প্রমাণিত যে, অনুবাদ অবধারিতভাবে সাহিত্য। এবং কখনো কখনো মৌলিক সাহিত্য। অনুবাদ সাহিত্য ক্লাসিকের মর্যাদাও পেয়েছে। যেমন রাজা জেমসের অনুবাদে বাইবেল কিংবা পোপের অনুবাদে হোমার ইংরেজি সাহিত্যে এখন ক্লাসিক হিসেবে স্বীকৃত। শেকসপিয়র বলতে গেলে সবচেয়ে চতুর ও সার্থক অনুবাদক। তাঁর লেখা প্রায় সব নাটকের কাহিনি তিনি বিভিন্ন সোর্স থেকে নিয়েছেন। এটিও এক প্রকার অনুবাদ। অনুবাদ মূলকে অনুসরণ করে বলে আমরা একে মৌলিক সাহিত্য বলে ভাবি না। মূলকে অনুসরণ করা অনুবাদ সাহিত্যের কোনো ত্রুটিপূর্ণ দিক নয়। মৌলিক সাহিত্যেরও কিন্তু এক বা একাধিক মূল থাকে, যেগুলোকে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে অনুসরণ করা হয়। কবি ওক্টাবিও পাস যে কারণে বলছেন : 'প্রতিটি রচনাই অনন্য অথচ প্রতিটি আসলে অপর একটি রচনার অনুবাদ। মানতেই হবে কোনো রচনাই মৌলিক নয়, কারণ সব ভাষার নির্যাস তো আসলে অনুবাদক্রিয়া—প্রাথমিকভাবে অবাচনিক বিশ্ব থেকে বাচনিক বিশ্বে এবং অতঃপর প্রতিটি প্রতীকচিহ্ন এবং প্রতিটি শব্দ অপর প্রতীকচিহ্ন ও শব্দেরই অনূদিত রূপমাত্র।' [অনুবাদ : সাহিত্য ও আক্ষরিকতা – অক্তাবিও পাস, অনুবাদ: আবদুস সেলিম, দৈনিক যুগান্তর সাহিত্য সাময়িকী] প্লেটো আরো ব্যাপক অর্থে বলছেন, বিশ্বের সবকিছুই ধারণার ছায়া কিংবা কোনো মূল ধারণার অনুকরণ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে মনে করা হয়, অনুবাদক নিজে সৃজনশীল লেখক হলে অনুবাদ ভালো হয়। মূলের প্রতি ভালোবাসা থেকে ভালো অনুবাদ সম্ভব। কথাটা আপাতভাবে সত্যি বটে। তবে অনেক উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাবে এটাই চূড়ান্ত কথা নয়। যেমন মার্কেজের *One Hundred Years*

of Solitude অনুবাদ করেছেন Gregory Rabassa। মার্কেজ এই অনুবাদ পড়ে বলেছিলেন, তাঁর অরিজিনালের চেয়ে ভালো হয়েছে। কেমন করে সেটি সম্ভব হল সে প্রসঙ্গে রাবাসা জানাচ্ছেন : 'কোথায় যেন গাবো লিখেছিলেন যে, তাঁর মতে আমার অনুবাদের পদ্ধতি হল—আমি প্রথমে তাঁর বইটি মন দিয়ে পড়েছি এবং তারপরে ইংরেজি ভাষায় তাকে নতুন করে লিখেছি। এটা হতে পারত এক মহান কীর্তি এবং সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেকবারই হয়েছে যে, এক মহান সাহিত্যের অথবা পৌরাণিক কাহিনি-অবলম্বনে রচিত হয়েছে সম্পূর্ণ অভিনব নতুন সাহিত্যকর্ম। আমার তরুণী নাতনি জেনিফার সম্প্রতি হানসেল আর গ্রেটেলের রূপকথা অবলম্বনে গ্রিক পুরাণের শৈলীতে রচনা করেছে নতুন কাহিনি, যাতে বজ্জাত ডাইনি ফিরে এসেছে সৎপথে। এটা কেমন করে সম্ভব হল যে আমি অনুবাদ করলাম শব্দের পর শব্দ, আর বাক্যের পর বাক্য, কিন্তু গাবো ভাবলেন ঠিক তার উলটো। অবশ্য আমি যেটা সচরাচর করি না—অনুবাদের আগে পুরো বইটা আগাগোড়া পড়েছি, সুতরাং তাঁর কথায় খানিকটা হলেও সত্যি রয়েছে।' [মার্কেজ অনুবাদের অভিজ্ঞতা/গ্রেগরি রাবাসা/অনুবাদ অংকুর সাহা]

কর্মজীবনে রাবাসা লিপিকার ছিলেন। তিনি নিজে কখনো উপন্যাস লেখেননি। পরে অবশ্য প্রচুর অনুবাদ করেছেন। এ রকম প্রফেশনাল অনুবাদকদের দ্বারাই বরং বিশ্বের অনুবাদ সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। পেশা হিসেবে যাঁরা অনুবাদকে বেছে নেন তাঁরা সবসময় মূলের প্রতি ভালোবাসা থেকে অনুবাদ করতে পারেন না। কিন্তু সেই কারণে সবসময় যে অনুবাদ খারাপ হয়, তা-ও নয়। অন্যদিকে মূলের প্রতি ভালোবাসা থেকে প্রচুর বাজে অনুবাদও আমরা পেয়েছি। আরো একটা কথা আমরা বলে থাকি, মূল ভাষা থেকে অনূদিত হলে অনুবাদের মান ভালো হবে। কথাটা যৌক্তিক শোনালেও বাস্তবিকপক্ষে সবসময় সত্য হয়ে ফলেনি। যেমন সরাসরি ফরাসি ভাষা থেকে অরুণ মিত্র'র বোদলেয়ার অনুবাদ ফরাসি না-জানা বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে উৎকৃষ্টতর হয়নি।

সাত.

দেশের অনুবাদ সাহিত্যে সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। যেমন সাম্প্রতিক সাহিত্যের কপিরাইট নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। যে পরিমাণ অর্থ এক্ষেত্রে ব্যয় করতে হয় তা প্রদান করে এবং অনুবাদকের পারিশ্রমিক দিয়ে প্রকাশকরা কোনো অনুবাদের বই ৫০০ কপি ছেপে লাভবান হতে পারবেন না। এক্ষেত্রে হয় ভালো বইয়ের পাঠক সৃষ্টি করতে হবে অথবা সরকারিভাবে অনুদানের বা কপিরাইট এনে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। টেকনিক্যাল বিষয়ে পরিভাষার অভাব রয়েছে। সরকারিভাবে বিষয়ভিত্তিক পণ্ডিতদের কাজে লাগিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সরকার যদি সেনাবাহিনী খাতে এত এত অর্থ বরাদ্দ করতে পারে, তবে কেন শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়? জ্ঞানচর্চাও তো একটা দেশের জন্য বায়বীয় অস্ত্র; নাকি? বোধের উন্নয়নে ব্যয় শরীরী উন্নয়নে ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি দরকারি, এটা কে না-বোঝে! তবে যেহেতু চলচ্চিত্রে অনুদানের ব্যবস্থা হয়েছে, সাহিত্যেও সেটি হবে বলে প্রত্যাশা করা চলে। পাশাপাশি সরকারকে নীতিমালা

করে অনুবাদকের পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থাও করতে হবে। বাংলা একাডেমি অনুবাদের সম্মানী কয়েকগুণ বাড়িয়েছে। এখন প্রকাশকরাও যদি এগিয়ে আসেন এবং তাঁরা যদি নিজ উদ্যোগে বিশেষজ্ঞ পরীক্ষক রেখে অনূদিত কোনো পাণ্ডুলিপি জমা পড়া মাত্রই ছেপে না দিয়ে সম্পাদনা করেন তাহলে আরো ভালো হয়। আমরা জানি, বাংলা একাডেমিতে এই প্রক্রিয়া চালু আছে।

পাশাপাশি, সময় হয়েছে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কাজগুলোকে অনুবাদ করে বিদেশি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি এবং কলকাতার বাংলা আকাদেমি যৌথভাবে প্রকল্প হাতে নিতে পারে। তবে অন্য ভাষায় অনুবাদ করে বই ছাপাটাই মূল কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে বাংলা সাহিত্যের জন্য বাজার সৃষ্টি করতে হবে। বিপণন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে।

অনুবাদ: বাংলা একাডেমির সেকাল-একাল একাডেমির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যে দুটি বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি ছিল অনুবাদ। ১৯৫৭ সালের ১৮ মে বিভাগসমূহ নতুন করে সাজানো হয়। এবং ছয়টি বিভাগ করা হয়। সেখানেও স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে অনুবাদ বিভাগ ছিল। ফলে অনুমান করা যায়, বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অনুবাদ খুব গুরুত্ব পেয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৫৫ সালের ২৬ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ববাংলার সরকার বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেখানেও অনুবাদ গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়, স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে অনুবাদ বিভাগ আর থাকেনি। ১৯৮২ সালে একাডেমির বিভাগসমূহ নতুনভাবে সাজানো হয়; সেখানে অনুবাদ বিভাগ উপ-বিভাগে পরিণত হয়। এবং এখন পর্যন্ত অনুবাদ উপ-বিভাগ বা একটি বিভাগের অধীনে আছে। সে অর্থে অনুবাদের গুরুত্ব কিছুটা কম পাচ্ছে বলে মনে হতে পারে এবং এই মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। অনুবাদটা যদি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হয়, সে-ক্ষেত্রে এর কাজের পরিধি আরো বাড়বে। এমনও হতে পারে যে, অনুবাদ ইনস্টিটিউট করা যেতে পারে। সেটা স্বতন্ত্রভাবে হতে পারে বা বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানেও হতে পারে। সেটা হলে আরো ভালো হবে।

১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম যে বাংলা বইটি একাডেমি থেকে অনুবাদ হয়। সে বইটা ছিল মনিরউদ্দীন ইউসুফের আল্লামা ইকবালের কাব্যসংগ্রহ। পরবর্তী সময়ে শেক্সপিয়রের বই, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা, আল-বেরুনীর ভারততত্ত্বসহ অনেক বই অনুবাদ হয়েছে। মালয়েশিয়ার একটি উপন্যাস অনুবাদ হয়েছে, জাপানি লেখকের বই, অস্ট্রীয় লেখকের বইও অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদের শুরুর দিকে অনেক ব্যাপক আকারে বই অনুবাদ হয়েছে। মেডিকেল সায়েন্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। সেটা অবশ্য সত্তর এবং আশির দশকের চিত্র। নব্বইয়ের পর এই জায়গাটা কমে গেছে। সে-ক্ষেত্রে আগে বিভিন্ন বিভাগ থেকে অনুবাদের বই বের হত। পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের জায়গাটা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিহাসের কিছু বই অনুবাদ হয়েছে। এখন বছরে ৩-৪টি করে অনূদিত বই প্রকাশিত হচ্ছে।

সম্প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাস্মৃতি 'কারাগারের রোজনামচা' অধ্যাপক ফকরুল আলমের অনুবাদে প্রিজন ডায়েরিজ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' তাঁরই অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে। 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' নীলিমা ইব্রাহিমের এই বইটি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক ফায়েজ হাসনাত, এ ওয়ার হিরোইন আই স্পিক শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। শওকত ওসমানের 'সূর্য দীঘল বাড়ি' অধ্যাপক আবদুস সেলিমের অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মিশরের সাংবাদিক-লেখক মোহসেন আল আরিশি'র আরবি ভাষায় লিখিত বই-এর বাংলা অনুবাদ 'শেখ হাসিনা : যে রূপকথা শুধু রূপকথা নয়' প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি থেকে অনুবাদ করেছেন একাডেমি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম। প্রকাশের অপেক্ষায় আছে ফকরুল আলমের অনুবাদে সৈয়দ শামসুল হকের বঙ্গবন্ধুর ওপর লেখা কিশোরগ্রন্থ। ফ্রানসিস হবসন বারনেটের লেখা কিশোর উপন্যাস সিকরেট গার্ডেন, সালেহা চৌধুরীর অনুবাদে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'দ্য ফোক লিটারেচার অব বেঙ্গল' বইটির বাংলা অনুবাদ। অনুবাদের মান ও দেশের চিত্র বর্তমানে অনুবাদকের সংখ্যাটা কমে গেছে। একটা সময় সরাসরি রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ হয়েছে, জার্মান ভাষা থেকে অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু এখন বহু ভাষা জানেন সে ধরনের মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যদিও দুই-একজন আছেন, যাঁরা ল্যাটিন ভাষা থেকে অনুবাদ করতে পারেন। ইংলিশ ভাষা থেকে তো হরহামেশাই অনুবাদ হচ্ছে। মোটের ওপর আমাদের আরো অনুবাদক প্রয়োজন। একজন অনুবাদের একটি বই প্রস্তুত করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। তারপরও অনুবাদের যে পরিমাণ বই প্রকাশিত হয় প্রতিবছর সংখ্যার বিচারে কম নয়। কিন্তু মানের প্রশ্নে খুব কম বই দাঁড়াবে।

এই সংকটের প্রধান কারণ অনূদিত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ও সম্পাদনা করার মতো কেউ থাকে না বাণিজ্যিক প্রকাশনা সংস্থাগুলোতে। ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যেমন, বাংলা একাডেমি প্রতিটি অনূদিত পাণ্ডুলিপি দু'জন বিশেষজ্ঞ পরীক্ষকের কাছে পাঠান, তাঁদের মতামত অনুযায়ী প্রকাশিত হয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রও বই রিভিউ করিয়ে নেয়। এই প্রক্রিয়াটা প্রতিটি প্রকাশনী সংস্থা যদি ভালোমতো মেনে চলে সেক্ষেত্রে অনূদিত বইয়ের সংখ্যা হয়তো কমবে কিন্তু মান বাড়বে।

তবে এটাও ঠিক যে প্রকাশকেরা ব্যবসায়ী, সাহিত্যসেবক নন। বই বিক্রি না বাড়লে কয়েক স্তরে লগ্নি করে পাঁচশ কপি বই বিক্রি করে লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই, তাই প্রকাশকরা এটা করবেন বলে মনে হয় না। পাশাপাশি যে বইয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাতে তাঁরা লগ্নি করবেন না। এক্ষেত্রে হয় আপনাকে ভালো বইয়ের পাঠক সৃষ্টি করতে হবে অথবা সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে কিছু কাজ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সরকার যদি সেনাবাহিনী খাতে এত এত অর্থ বরাদ্দ করতে পারে, তবে কেন শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়? এটাও তো একটা দেশের জন্য বায়বীয় অস্ত্র নাকি? বোধের উন্নয়নে ব্যয় শরীরী উন্নয়নে ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি দরকারী, এটা কে বোঝাবে!

আমাদের সাহিত্য বিদেশি ভাষায় হয় না বললেই চলে। যা হয় তার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। আমাদের সাহিত্য বিদেশি ভাষায় হওয়াটা খুব জরুরি। শিল্প-সাহিত্য লেনাদেনার বিষয়। আমরা বিশ্ব থেকে নানাভাবে নিচ্ছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফিউশন এমনভাবে ঘটাচ্ছি যে আমাদের নিজেরটাই হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা নিজেদেরটা ছড়িয়ে দিতে পারছি না। বিশ্বের সংস্কৃতি-লড়াইয়ে আমাদের অস্ত্র হতে পারত আমাদের ফোক কালচার, লোকজ ভাবনা ও পরিবেশনা। কিন্তু সেটা হয়নি। রাশিয়া উদ্যোগ নিয়ে যদি তাদের সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করতে পারে, তবে আমরা কেন অন্য ভাষায় পারছি না? ওদের মার্কেট তো আরো প্রশস্ত। তবে এও ঠিক, অনুবাদ হলেই তারা পড়বে কেন, সেই বাজারটাও আমাদের সৃষ্টি করতে হবে।

ঋণস্বীকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অনুবাদ-চর্চা
প্রমথ চৌধুরী : তর্জমা
কবীর চৌধুরী : প্রসঙ্গ অনুবাদ
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ
হায়াৎ মামুদ : বেঈমান তর্জমা
সালেহা চৌধুরী : অনুবাদ নিয়ে কিছু কথা
খালিকুজ্জামান ইলিয়াস : অনুবাদের সৃজনশীলতা
নূরুল হুদা : কবিতার অনুবাদ : মুক্ততা ও মৌলিকতা
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : অনুবাদে সৃজনশীলতার সীমানা
খোন্দকার আশরাফ হোসেন : তর্জমার জমাখরচ
চিন্ময় গুহ : অনুবাদের সমস্যা
আব্দুল্লাহ আল মামুন : বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য : মৌলিকত্ব ও সৃজনশীলতা
অনুবাদ যুগে যুগে : জি এইচ হাবীব
মাসরুর আরেফিন : বোর্হেস ও আক্ষরিক অনুবাদের সৌন্দর্য
ওয়াল্টার বেনজামিন : দ্য টাস্ক অব দ্য ট্রান্সলেটর
Octavio Paz: Translation Literature and Letters

[লেখক: কথাসাহিত্যিক, অনুবাদশিল্পী। কর্মকর্তা, বাংলা একাডেমি।]

অনুবাদ নিয়ে বাদানুবাদ: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

মো. আবু জাফর

অনুবাদ কী, ভালো বা খারাপ অনুবাদ কী, অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা কী, অনুবাদকর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, অনুবাদের ধরন ও মূলের সাথে অনুবাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার, অন্যান্য ধরনের অনুবাদের সাথে সাহিত্যের অনুবাদের পার্থক্য কী, অনুবাদকের যোগ্যতা কেমন হওয়া উচিত, অনুবাদতত্ত্বের সাথে অনুবাদের সম্পর্ক কী, অনুবাদককে অনুবাদের তত্ত্ব জানা আবশ্যক কি না, অনুবাদের সাথে ভাষা-সংস্কৃতির সম্পর্ক কী, অনুবাদে পেশাদারিত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, অনুবাদকের পারিশ্রমিকের সাথে অনুবাদের মানের সম্পর্ক আছে কি না– ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনুবাদ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রসারের কারণে অনুবাদ সংক্রান্ত নানা ধোঁয়াশার জবাব মেলে। বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের সাথে সাথে একদিকে যেমন বিশ্বব্যাপী অনুবাদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে অনুবাদ বিষয়টি একাডেমিক পর্যায়ে একটি স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন বা অধ্যয়নের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী অনুবাদ জগতে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের নানা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টোরাল পর্যায়ে অনুবাদবিদ্যার (যা পাশ্চাত্যে 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' নামে পরিচিত) ওপর ডিগ্রি প্রদান করছে। বিশ্বব্যাপী অনুবাদকদের নানা সংগঠন, গবেষণা, জার্নাল প্রকাশ, নিয়মিত কনফারেন্স আয়োজন ইত্যাদি থেকেও অনুবাদ বিষয়ক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়। আর হালকা হলেও এই হাওয়া বাংলাদেশের পালে লেগেছে যার প্রমাণ বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' কোর্স চালু, অনুবাদ বিষয়ে কনফারেন্স আয়োজন, বই প্রকাশ, গবেষণা ইত্যাদি।

এ-কথা সত্য যে, অনুবাদ সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক ধারণা অনুবাদ অঙ্গনে এখনও প্রচলিত আছে যা অনেক ক্ষেত্রে বেশ রসবোধক এবং অনুবাদকর্মকে যাঁরা খাটো করে দেখতে চান সে সকল সমালোচকের/নিন্দুকের কাছে প্রিয়। প্রথমেই ধরা যাক, সেই ইতালীয় প্রবাদটি 'ত্রাদ্দুই ত্রাদিতোরে' (Traduttore, Traditore) অর্থাৎ 'অনুবাদক হল একজন বিশ্বাসঘাতক'। এ ধারণার পটভূমি হল ইউরোপের রেনেসাঁ যুগে যখন ফরাসি অনুবাদকেরা ইতালীর বিখ্যাত কবি দান্তে'র (১২৬৫-১৩২১) কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন ইতালির অনেক পণ্ডিত এ সকল ফরাসি অনুবাদে দান্তে'র কাব্যিক ভাষা ও বিষয়বস্তুর চরম ব্যত্যয় ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করেন এবং ফরাসি

অনুবাদকদের উদ্দেশ্য করে উল্লেখিত মন্তব্যটি করেন। পরবর্তীতে এ কথাটি প্রবাদপ্রতিম হয়ে আন্তর্জাতিকভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে এসেছে। অনুবাদ সম্পর্কে আর একটি বহুল প্রচলিত ধারণা হল- 'লে বি ইনফিডেল' ("les belles infidèles") বা 'সুন্দরী অবিশ্বস্ত'। সপ্তদশ শতকের একজন ফরাসি দার্শনিক ও লেখক জিলস্ মেনেজ (১৬১৩-১৬৯২) একটা অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখিত মন্তব্যটি করেন। মেনেজ যে অনুবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন সেটি ছিল সুখপাঠ্য এবং সুন্দর কিন্তু তা ছিল মূলের থেকে অনেক দূরে অর্থাৎ সুন্দর কিন্তু অবিশ্বস্ত। কথাটি ইংরেজিতে ব্যাপক খ্যাতি পেল এভাবে– Translation is like a woman. If it is beautiful, it is not faithful. If it is faithful, it is most certainly not beautiful অর্থাৎ অনুবাদ হল নারীর মতো। যদি সুন্দরী হয় তবে বিশ্বস্ত হয় না, আর যদি বিশ্বস্ত হয় তাহলে সুন্দরী হয় না। আবার কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্টের যে উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয় তা হল– "Poetry is what gets lost in translation"। প্রকৃতপক্ষে কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রবার্ট ফ্রস্ট (১৮৭৪-১৯৬৩) উল্লেখিত মন্তব্যটি করেছিলেন। তবে অনুবাদ, বিশেষ করে কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রে উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়। অনুবাদ নিয়ে বাংলা ভাষাতেও একটা কথা প্রচলিত আছে, অনুবাদ সাহিত্য পড়া মানে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজের কবিতার অনুবাদ দিয়ে নোবেল পেলেও তিনি অনুবাদ নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেননি। ১৯১২ সালে *গীতাঞ্জলি: সঙ অফারিংস* প্রকাশিত হওয়ার পর এবং এই কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল পাওয়ার পর উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে নিজ কবিতার অনুবাদ দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে আরও পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, কিন্তু সেসব গ্রন্থের তেমন কোনো সাড়া মেলেনি। এসব কারণে অনুবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বেশ দুঃখবোধও ছিল। কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "কবিতার অনুবাদ করা যায় না, কবিতার অনুবাদ পড়ো না। কবিতা লাজুক বধূর মতো, এক ভাষার অন্তঃপুর থেকে অন্য ভাষার অন্তঃপুরে যাবার সময় সে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।" নিজের কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে আরও তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাছুর মরে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় না, তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরি করা হয়, তারই গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে। তর্জমা সেই রকম মরা বাছুরের মূর্তি যার আহ্বান নেই, ছলনা আছে।"[১]

অনুবাদ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে আরও কিছু বদ্ধমূল ধারণা হল অনুবাদ কখনও মূলের সমমর্যাদায় আসীন হতে পারে না। অনুবাদ একটি অন্ত্যজ শ্রেণির ক্রিয়া। মূল যদি হয় মাস্টার বা তাহলে অনুবাদ হল সারভেন্ট বা ভৃত্য। আবার পুরুষতান্ত্রিক উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মতে মূলের সাথে অনুবাদের সম্পর্ক হলো স্বামী-স্ত্রী যেখানে স্বামী সর্বদা উপরে এবং স্ত্রী হল অধীনস্থ বা আজ্ঞাবহ। আবার অনেকের ধারণা, যাঁরা মৌলিক কোনো গল্প-কবিতা-উপন্যাস লিখতে পারেন না

১উদ্ধৃত কবীর চৌধুরী, "প্রসঙ্গ অনুবাদ", *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ঢাকা: শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৮৭-৮৮

তাঁরা অনুবাদক হন। অনুবাদ সম্পর্কে এসব মন্তব্যের উল্লেখ করে ১৯৩১ সালে হিলেয়ার বেলক এক বক্তৃতায় বলেন, অনুবাদ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা অনুবাদের জগতে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধ্বংসই করেছে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে অনুবাদ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার কারণে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন অনুবাদক এ জগতে পা রাখেননি, আবার অযোগ্যদের পদচারণায় ক্ষতি সাধন হয়েছে। বেলক আরও বলেন, পরিহাসের বিষয় এই যে, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে অনুবাদের ভুমিকা বা প্রয়োজনীয়তা এবং অনুবাদে দুরূহতার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব না দিয়ে অনুবাদকে শুধু খাটো করে দেখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।"[২]

যা হোক, উনিশশত সত্তরের দশক থেকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অনুবাদ জগতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে যদিও সে পরিবর্তনের ছোঁয়া সর্বত্র সমান নয় এবং না হওয়ারই কথা কারণ সব সমাজ ও সংস্কৃতিতে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা যেমন এক নয় তেমনি অনুবাদ সম্পর্কে ধারণাও এক নয়। তবে বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের কোন্ প্রান্তে কী ঘটছে সে সম্পর্কে অবশ্যই জানা দরকার। উল্লেখিত দশকের শেষের দিকে "ট্রান্সলেশন স্টাডিজ" নামে স্বতন্ত্র একটি ডিসিপ্লিনের জন্ম হয়।[৩] পূর্বে অনুবাদ সংক্রান্ত আলোচনা মূলত সাহিত্যের অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং অনুবাদের সমালোচনায় মূল ও অনুবাদের মধ্যে মিল বা গরমিলের বিষয়টিই মুখ্য ছিল। ইসরাইলের তেলআবিব-স্থিত পণ্ডিত ইভান জোহার (১৯৩৯-) অনুবাদ সম্পর্কে 'পলিসিস্টেম' নামে যে তত্ত্ব দিলেন সেখানে অনুবাদের কোয়ালিটি বা গুণাগুণের কোনো বালাই নেই। অনুবাদ আর মূলের মধ্যেও থাকল না তেমন বিভাজন। কাছাকাছি সময়ে জার্মানীর হান্স ভারমিয়ার (১৯৩০-২০১০) 'স্কপোস' নামে যে তত্ত্ব দিলেন সেখানেও মূল ও অনুবাদের পার্থক্য আবছা হয়ে গেল। ফরাসি জন্মোদ্ভূত আমেরিকান পণ্ডিত জর্জ স্টেইনার অনুবাদ সংক্রান্ত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *আফটার ব্যাবেল* (১৯৭৫)-এ তো বলেই বসলেন 'এভরি অ্যাক্ট অব কমিউনিকেশন ইজ ট্রান্সলেশন' অর্থাৎ 'যোগাযোগ বা ভাব প্রকাশের প্রতিটি কর্মই অনুবাদ।' ইভান জোহারের (১৯৩৯-) 'পলিসিস্টেম' তত্ত্ব অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা সমাজে সাহিত্যের অনুবাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করা যায়। ইভান জোহার অনুবাদকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে অনুবাদের সাথে সংস্কৃতি, স্থান, কাল, পাত্রের সংযোগের ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে একটি দেশে বা সমাজে জাতীয় সাহিত্যের যে ধারা বিরাজ করে তারই মধ্যে অনুবাদ একটা স্থান দখল করে এবং সে স্থান হতে পারে একেবারে প্রধান আবার গৌণ। বেশ কয়েকটি দেশ ও সংস্কৃতিতে অনুবাদের তথ্য উপস্থাপন করে জোহার দেখালেন যে কোনো দেশে বা সমাজে নিজ/জাতীয় ভাষার সাহিত্য যখন শিশু পর্যায় বা গঠন পর্যায়ে থাকে সেখানে অন্য ভাষার সাহিত্য থেকে অনুবাদের প্রবণতা বেশি থাকে এবং অনুবাদ সাহিত্যই সেখানে সেন্ট্রাল বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে থাকে। জাতীয় সাহিত্যাঙ্গনে একটা গ্যাপ বা শূন্যতা বিরাজ করলেও তা অনুবাদ দিয়ে পূর্ণ করার প্রবণতা থাকে। বিপরীতক্রমে কোনো দেশে যখন

২হিলেয়ার বেলক, *অন ট্রানস্লেশন*, অক্সফোর্ড: ক্লারেনডন প্রেস, ১৯৩১

৩ ১৯৭২ সালের কোপেনহেগেনে অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুস্টিক বিভাগ চালু হওয়া শুরু হয়।

দেশীয় বা জাতীয় পর্যায়ের সাহিত্য খুব সমৃদ্ধ হয় সেখানে অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব কম থাকে এবং অনুবাদ কম হয়। সেক্ষেত্রে দেশীয় সাহিত্য থাকে কেন্দ্রে আর অনুবাদ সাহিত্য থাকে পেরিফেরি বা প্রান্তে। ইভান জোহারের এ তত্ত্বটি বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলা ভাষার আদি ও মধ্য যুগে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য যখন একটা প্রাথমিক স্তরে ছিল তখন অনুবাদ সাহিত্যের আধিক্য দেখা যায় এবং এ অনুবাদ সাহিত্যগুলো বাংলা সাহিত্যের বলয়ের মধ্যে কেন্দ্রে অবস্থান করত। কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*, মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* (যা ভগবত অবলম্বনে রচিত), যশোরাজ খানের *কৃষ্ণমঙ্গল*, দ্বিজ মাধবের ভাগবত অবলম্বনে রচিত *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল*; শাহ মোহাম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জোলেখা* (ফারসী সাহিত্য থেকে নেওয়া); দৌলত কাজীর *সতী ময়না* (পশ্চিমা ভোজপুরি ভাষায় প্রচলিত একটা কাহিনি।); আলাওলে'র *পদ্মাবতী* (অযোধ্যার কবি মালিক মহম্মদ জায়সীর পদুমাবতী অবলম্বনে)। এ কাব্যগুলো অন্য ভাষা ও সাহিত্য থেকে আহরিত হলেও বাংলা ভাষা সাহিত্যে তা মৌলিকত্ব লাভ করে। কিন্তু আধুনিক যুগে যখন বাংলা সাহিত্য ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে তখন অনুবাদ সাহিত্যের পরিমাণ কমে যায় এবং জাতীয় সাহিত্যের বলয়ে অনুবাদ সাহিত্য প্রান্তিক অবস্থানে চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শেক্সপিয়র, মিল্টন বা টলস্টয়ের বাংলা অনুবাদ যতই ভালো হোক-না কেন বাংলাদেশে এ অনুবাদ গ্রন্থগুলোর অবস্থান মাইকেল, নজরুল বা শরৎ-সাহিত্যের ওপরে নয়। এছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনেক সমৃদ্ধ অবস্থানে থাকার কারণে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর বাংলায় যত সাহিত্যের বই প্রকাশিত হয় তার শতকরা ২ ভাগেরও কম প্রকাশিত হয় বাংলায় রচিত বিদেশি অনুবাদ সাহিত্য। হান্‌স ভারমিয়ারের 'স্কপোস' তত্ত্বটিও আমরা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের বেলায় মিলিয়ে দেখতে পারি। 'স্কপোস' হল একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বের আলোকে বলা যায় একটি ভাষা থেকে অন্য একটি ভাষায় কোনো কিছু অনুবাদ কিভাবে করতে হবে তা নির্ভর করবে ওই সাহিত্যকর্ম অনুবাদের উদ্দেশ্য বা টার্গেট কী তার ওপর। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অনুবাদের ধরন নির্ধারণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো অনুবাদের উদ্দেশ্য যদি হয় শুধু তথ্যের উপস্থাপন তাহলে অনুবাদ করতে হবে ঠিক সেভাবে যাতে তথ্য ঠিক থাকে। আবার কোনো অনুবাদের উদ্দেশ্য যদি হয় সাহিত্যের রসাস্বাদন তাহলে অনুবাদ হবে নান্দনিকতার বিষয়টি মাথায় রেখে এবং সেক্ষেত্রে তথ্যের উপস্থাপনা প্রধান নয়। কাজেই অনুবাদে বিশ্বস্ততা-অবিশ্বস্ততার বিষয়টি আর মুখ্য থাকল না। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন তাঁর কবিতার অনুবাদ করেছিলেন সেগুলো তিনি করেছিলেন ইংল্যান্ডের ইংরেজ পাঠকদের কথা মাথায় রেখে। তিনি কবিতা নির্বাচন থেকে শুরু করে তার বাংলা গীতি কবিতার অবয়ব ভেঙে তদানীন্তন ইংরেজি গদ্য কবিতার ধাঁচে ইংরেজ পাঠকরা যাতে সন্তুষ্ট হয় সেভাবেই সাজিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ মূলের থেকে অনেক দূরে কিন্তু অনুবাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বিষয়টি আন্দ্রে লেফেভিয়ারের (১৯৪৫-১৯৯৬) তত্ত্ব দিয়ে আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা যায়। লেফেভিয়ার বললেন, অনুবাদ হল এক ধরনের পুনর্লিখন। তিনি আরও বললেন যে এই পুনর্লিখন যে ভাষা ও সাহিত্যে করা

হচ্ছে তার ইডিওলোজি বা নর্ম এবং সে ভাষায় লেখার যে কৌশল (পোয়েটিক্স) বিরাজ করছে সেটি দ্বারা প্রভাবিত। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি: সঙ অফারিংস*-এর ক্ষেত্রে পুরোপুরি মিলে যায় কেননা রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে তাঁর গীতিকবিতার আদল ভেঙে সমসাময়িক ইংরেজি গদ্য কবিতার আদলে করলেন অর্থাৎ ইংরেজি পোয়েটিক্স অনুসরণ করলেন অন্যদিকে মূল বাংলা কবিতার অনেক কিছুই পরিবর্তন করে ইংরেজি ধাঁচে সমৃদ্ধ করলেন যাতে করে ইংল্যান্ডের পাঠকেরা (যারা ছিল তৎকালীন ভারতের ঔপনিবেশিক গুরু) খুশি হয় অর্থাৎ ইংরেজ মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত হলেন। যাহোক, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা, অনুবাদ চর্চা বা অনুবাদের গবেষণা সকল দেশ বা সংস্কৃতিতে সমান নয়। এক্ষেত্রে বলা যায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে অনুবাদ চর্চা, অনুবাদের প্রশিক্ষণ ও অনুবাদ নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণার যে উদ্দীপনা দেখা যায় বাংলাদেশে সেরকম নয়। ভারত বহুভাষিক দেশ হওয়ার কারণে এবং ইংরেজি একটা দ্বিতীয় ভাষা হওয়ার কারণে সেখানে আভ্যন্তরীণভাবেই যতটা ইংরেজি অনুবাদের চাহিদা অনুভূত হয় বাংলাদেশে ততটা হয় না কারণ সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশে মূলত একটি ভাষা বাংলাই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। ভারতের বিভিন্ন ভাষার যেমন বাংলা, হিন্দি বা গুজরাটি ভাষার সাহিত্য ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ভারত থেকে প্রকাশিত হলে আভ্যন্তরীণ বাজারে যতটা বাণিজ্যিকভাবে সফল হতে পারে বাংলাদেশে সেটি হয় না। সেকারণে দেখা যায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা একাডেমি বা দু-একটি ব্যাক্তিমালিকানাধীন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেগুলোর বিক্রয় হতাশাব্যঞ্জক, আর কেনই বা নয় একমাত্র একাডেমিক কোনো কারণ ছাড়া বাংলাভাষী পাঠক বাংলা সাহিত্য কেন ইংরেজিতে পড়তে যাবে। সরকারিভাবে জাতীয় সাহিত্যকে বাংলা ভাষার গণ্ডি অতিক্রম করিয়ে যদি বিশ্বভুবনে পৌঁছাতে হয় তাহলে অনুবাদের স্কপোস থিয়োরি কাজে লাগাতে হবে। বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে বাংলা একাডেমির গুদামে পড়ে থাকলে সে অনুবাদের প্রচার-প্রসার কিভাবে হবে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশে অনুবাদের তেমন চাহিদা নেই। এখানে সাহিত্যের অনুবাদের পাশাপাশি রয়েছে অন্যান্য ধরনের অনুবাদের চাহিদা। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এখন অনুবাদ একটি শিল্প এবং পেশাগত ক্ষেত্র। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখন অনুবাদকেরা তাঁদের নিজেদের পেশাগত উন্নয়ন ও তাঁদের অধিকার আদায় বা সংরক্ষণের জন্য পেশাগত সংগঠন তৈরি করেছেন এবং করছেন। বাংলাদেশে এখনও অনুবাদকর্মকে তেমন মূলায়ন করা হয় না। এখানে অনুবাদকর্মের পারিশ্রমিক অত্যন্ত কম। ফলে যোগ্যতাসম্পন্ন অনুবাদক এ কর্মে উৎসাহ বোধ করেন না। যাঁরা একান্ত ভালোবাসার খাতিরে এ কর্ম করে থাকেন তাঁদের বিষয় ভিন্ন। বাংলাদেশে অনুবাদকর্মকে এখনও সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অনুবাদের সমালোচনায় সেই গতানুপতিক বিশ্বস্ত-অবিশ্বস্ত, আক্ষরিক-স্বাধীন, ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই শব্দগুলোই ব্যবহৃত হয়। বর্তমান বিশ্বে ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ার কারণে ইংরেজি ভাষার সাথে অন্য ভাষার অনুবাদ সমস্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হলেও বাংলার সাথে খুবই

নগণ্য। পরিশেষে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে দরকার– অনুবাদকে পেশাদারিত্বের পর্যায়ে উন্নিত করা, অনুবাদকদের অধিকার আদায়ের জন্য পেশাগত সংগঠন তৈরি করা, অন্যান্য পেশার মতো অনুবাদকদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা, অনুবাদকদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত হওয়া, নিয়মিত সম্মেলন বা কনফারেন্সের আয়োজন করা এবং অনুবাদকর্ম ও অনুবাদ তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

তথ্যসূত্রঃ

১. উদ্ধৃত কবীর চৌধুরী, "প্রসঙ্গ অনুবাদ", *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ঢাকা: শিল্পতরু প্রকাশনী,১৯৯২, পৃ. ৮৭-৮৮

২. হিলেয়ার বেলক, *অন ট্রান্সলেশন*, অক্সফোর্ড: ক্লারেনডন প্রেস, ১৯৩১

৩. ১৯৭২ সালের কোপেনহেগেনে অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুস্টিক বিষয়ে ৩য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের ট্রান্সলেশন সেকশনে নেদারল্যান্ডের জেম্‌স হোম্‌স একাডেমিক পর্যায়ে ট্রান্সলেশন অধ্যয়নের একটা রূপরেখা উপস্থাপন করেন যা ব্যাপকভাবে সাড়া জনায় এবং সত্তরের দশকের শেষদিকে 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' নামে স্বতন্ত্র কোর্স ও বিভাগ চালু হওয়া শুরু হয়।

[লেখক: অনুবাদ শিল্পী। অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।]

অনুবাদের চারটি দিক

খন্দকার স্বনন শাহরিয়ার

বাংলায় এককালে অনুবাদ সাহিত্যের আকাল ছিল। সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো বহুভাষাবিদ পণ্ডিত তাঁর 'অনুবাদ সাহিত্য' নামের প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তর দুঃখ করে গিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'অনুবাদ সাহিত্যের বেলায় সে (বাংলা সাহিত্য) যেন এঁদো কুয়োর ভেতর খাবি খায়। সৈয়দ মুজতবা আলী নিজেও অনুবাদ করেছেন, চেনা লেখকদের অনুবাদ করতে বহুবার অনুরোধ করেছেন। উপন্যাস-গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ সব রকমের অনুবাদের যে সমালোচনা রচনা করে গিয়েছেন, সে রচনাও আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য। সুতরাং বাংলা অনুবাদ সাহিত্য বিষয়ে তাঁর মন্তব্যের গুরুত্ব আছে। তবে সৈয়দ মুজতবা আলী গত হয়েছেন ১৯৭৪ সালে। তার পরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়েছে। এই সময়ে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের কিছু উন্নতি কি হয়নি?

আমার বিশ্বাস হয়েছে। বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গত চার দশকে ব্যাপকভাবে অনুবাদের চর্চা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে গত চার বছর বইমেলায় নানা বিষয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশি ভাষার বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে, মূল লেখক-প্রকাশকের অনুমতিক্রমে বা অনুমতি ছাড়াই। মূল লেখক-প্রকাশকের অনুমতি ছাড়াই তাঁদের গ্রন্থস্বত্ব বজায় থাকাকালে অনূদিত বই প্রকাশ করা উচিত হচ্ছে কি-না, সে বিষয়ে এক বিশাল নৈতিক বিতর্ক হতে পারে। তবে আমার এই প্রবন্ধ সেই নৈতিক বিতর্ক নিয়ে নয়। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, অনুবাদের মান। দুই বাংলার অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ অনুবাদকরা অনুবাদের মান বজায় রাখার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করেছেন, আশা রাখি আরো করবেন। তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। নতুন যাঁরা অনুবাদের কাজে যোগ দিচ্ছেন, তাঁরা অগ্রজদের শ্রম এবং নিষ্ঠার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবেন, এটাই আমাদের আশা।

আমি খুব আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করেছি, সাম্প্রতিককালে যাঁরা বাংলায় বিশ্বসাহিত্যের বই অনুবাদ করার কাজে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই তরুণ। দেশে অনুবাদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো প্রশিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং, অনুমান করতে পারি, এঁদের বেশিরভাগ-ই একান্ত নিজের চেষ্টায় অনুবাদ শিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, এবং সম্ভবত অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে প্রকাশকদের নিজের অনুবাদের বই ছাপাতে রাজি করিয়েছেন। বিনা প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এঁদের অনুবাদের সমালোচনা এবং ছিদ্রান্বেষণ অনেকেই করেন, করছেন। তবে তাতে

এঁদের কোনো উপকার হবে না। যেটা দরকার, সেটা হল অনুবাদ বিষয়ে চর্চা, আলোচনা, পারস্পরিক সহযোগিতা। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, অনুবাদের চারটি দিকের প্রতি তরুণ অনুবাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই চারটি দিকে লক্ষ রাখলে অনুবাদের মান বজায় রাখা সম্ভব, অনুবাদকে পাঠকপ্রিয় করে তোলা সম্ভব এবং অনুবাদের শিল্পমূল্য তৈরি করা সম্ভব। অনুবাদের সংজ্ঞা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে নানা মত। তবে মোটের ওপর বিনা বিতর্কে এ কথা বলা সম্ভব, অনুবাদ মানে হল এক ভাষা থেকে নির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য বা রচনার 'অর্থ' অন্য ভাষায় স্থানান্তর। স্থানান্তরের সময় 'অর্থ'কে রক্ষা করাই অনুবাদকের মূল লক্ষ্য। আর অর্থকে রক্ষা করতে গিয়ে যে চারটি দিকে লক্ষ রাখতে হয়, সেগুলো হল,

১। মূল ভাষায় বক্তব্য বা রচনার অর্থ নির্ভুলভাবে বোঝা

২। মূল ভাষার ছন্দ ও ধ্বনিমাধুর্যকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে অর্থকে অনুবাদের ভাষায় নিয়ে যাওয়া

৩। বক্তব্য বা রচনার কাঠামো নষ্ট না করা

৪। ভাষাভঙ্গির ক্ষেত্রে মূল বক্তব্য বা রচনার অনুগত থাকা

এক এক করে আলোচনা করা যাক।

মূল ভাষায় বক্তব্য বা রচনার অর্থ নির্ভুলভাবে বোঝা মানসম্মত অনুবাদের প্রাথমিক শর্ত। বাংলায় নব্বই শতাংশ বা তার বেশি বইয়ের অনুবাদ হয় ইংরেজি থেকে। ইংরেজিতে অনুবাদের বিষয়বস্তু পড়ে ঠিকমতো বোঝা তাই তরুণ বাঙালি অনুবাদকের প্রথম কাজ। আজকাল বিশ্বময় বাঙালি ছড়িয়ে পড়লেও ফরাসি, স্প্যানিশ, ম্যান্ডারিন, আরবি, জার্মান, বা রুশ ভাষায় মূল বই পড়ে অনুবাদ করার লোকের সংকট এখনও ঘোচেনি। সে অভাব নিয়ে আরেক প্রবন্ধে আলোচনা করা যাবে। ইংরেজি ভাষা যেহেতু এখন পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্যে বাঙালির বৃহত্তম জানালা, ইংরেজি থেকে অনুবাদ প্রসঙ্গেই এই আলোচনা সীমিত রাখছি।

শিক্ষিত বাঙালিকে ইংরেজিচর্চা কিছুদূর করতেই হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ইংরেজি চর্চার বড় সীমাবদ্ধতা এই যে, যাঁরা বাংলা-মাধ্যমে পড়াশোনা করেন, তাঁদের অনেককেই ইংরেজিতে প্রাথমিক পর্যায়ের দক্ষতা অর্জন করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর যাঁরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করেন, তাঁদের একটা বিপুল অংশ আবার বাংলা ভাষায় লিখন-পঠনের দক্ষতা অর্জন করে উঠতে পারেন না। সুতরাং আমরা একটা সংকটের মধ্যে পড়েছি। ইংরেজি আর বাংলায় সমান দক্ষ, এ রকম অনুবাদকের সংখ্যা, অন্তত বাংলাদেশে নগণ্য। তরুণ অনুবাদকদের অনেকেই ইংরেজি ভাষায় অপ্রতুল দখল নিয়েই বড় অনুবাদ কাজে নেমে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন।

এই তরুণ অনুবাদকদের অনেকেই ইংরেজি ভাষায় নিজেদের চর্চার ঘাটতি মেটাতে অভিধানের সাহায্য নিয়েছেন। অভিধানের সাহায্য অভিজ্ঞ, দক্ষ অনুবাদককেও নিতে হয়। কিন্তু সমস্যা হয় তখন, যখন অনুবাদক সর্বাংশে অভিধানের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে বাংলায় অনুবাদ করা কিছু বিদেশি উপন্যাস পড়তে গিয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ করেছি, অনুবাদক ইংরেজিতে মূল বিষয়

পড়ার সময় বাগধারা বা বাক্যবন্ধ বুঝতে পারেননি। অভিধানের সাহায্য নিয়ে তাঁরা যখন শব্দ ধরে ধরে সেই বাগধারা বা বাক্যবন্ধের অনুবাদ করতে গিয়েছেন, তখন মূলের অর্থ বিকৃত হয়ে গিয়েছে। এক অনুবাদক বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলা 'টেল মি অ্যাবাউট ইট' বাক্যবন্ধের অনুবাদ করেছেন 'আমাকে এর সম্পর্কে বল,' যেখানে আসল মানে হবে 'সে কথা জানতে কি আর আমার বাকি আছে?' আরেক অনুবাদক 'আ পেনি ফর ইওর থট' অনুবাদ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'আপনার চিন্তার জন্য এক মুদ্রা নিন।' 'আ পেনি ফর ইওর থট'-এর অনুবাদ হবে 'একটু বলবেন, কী নিয়ে এত চিন্তা করছেন?' শব্দের অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রায়-ই অযথার্থ ব্যবহার চোখে পড়ে। বিশেষ করে যেসব ইংরেজি শব্দের একাধিক অর্থ আছে, সে সব নিয়ে নবীন অনুবাদকেরা প্রায়ই ঝামেলায় পড়ে যান। 'বার্ক' শব্দের মানে শুধু কুকুরের ঘেউ ঘেউ নয়, গাছের বাকল-ও হতে পারে। 'পুল' দিয়ে শুধু সাঁতারের পুলকেই বোঝায় না, বিলিয়ার্ড-জাতীয় খেলাকেও বোঝায়। 'ড্রাফট' মানে খসড়া-ও হতে পারে, দরজার তলা দিয়ে ঢুকে পড়া দমকা বাতাস-ও হতে পারে। 'টুয়েন্টি ডলার বিল' মানে বিশ ডলারের বিল নয়, বিশ ডলারের নোট। এই ধরনের বেশ কিছু অনুবাদের ভুল ইদানিং আমার নজরে এসেছে। অনুবাদ করার আগে তাই ইংরেজি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেওয়া জরুরি। অভিধানের ভরসায় অনুবাদে নামলে ভুল-ভ্রান্তির সংখ্যা বাড়বে, এবং অনুবাদের আসল যে উদ্দেশ্য, 'অর্থের স্থানান্তর,' তা-ও সিদ্ধ হবে না।

তরুণ অনুবাদকদের পক্ষে অনুবাদের আগে ইংরেজিতে পড়ার অভ্যাস তৈরি করে নেওয়া ভালো। বিদেশি ভাষায় বেশি বই পড়লে ভাষার সঙ্গে পরিচিতি ও অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়, তখন অর্থ বোঝার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। ইংরেজি সিনেমা এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখা আরেকটি ভালো উপায়, কারণ এতে কথ্য ইংরেজি এবং বাগবন্ধের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আমাদের দেশে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনার বিষয়টি প্রায়ই অবহেলিত থেকে যায়, সুতরাং তরুণ অনুবাদকদের নিজের অনুবাদ নির্ভুল রাখার দায়িত্ব নিজেদের-ই নিতে হবে। ইংরেজি ভাষার চর্চা অনুবাদ নির্ভুল রাখার প্রথম শর্ত। অনুবাদের বিষয়বস্তুর অর্থ অনুবাদক নিজেই যাতে আগে পুরোপুরি বোঝেন, তার জন্যেই এটা দরকার। প্রথম কাজটি কঠিন, তাতে সন্দেহ নেই। তবে দ্বিতীয় কাজটি কঠিনতর। সেই কাজটা হল বিদেশি ভাষায় রচিত বিষয়বস্তুর ছন্দ ও ধ্বনিমাধুর্যকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে বাংলা ভাষায় নিয়ে আসা। এই কাজটি করতে হলে অনুবাদকের নিজের ভাষায় যথেষ্ট দখল থাকা চাই, জানা চাই বহুসংখ্যক প্রতিশব্দ। নিজের ভাষায় নিয়মিত সুলিখিত বই পড়ার অভ্যাস না থাকলে সত্যিকারভাবে ছন্দময়, সরস অনুবাদ সম্ভব নয়।

বক্তব্য বা রচনার কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় স্থানান্তরের সময় গদ্য বা কবিতার কাঠামোতে খানিকটা পরিবর্তন হবেই, একে সম্পূর্ণ এড়ানো কঠিন। তবু যতটা পারা যায়, রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,/জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর/আপন প্রাঙ্গনতলে দিবসশর্বরী/বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।" তার ইংরেজি অনুবাদে পাই, "হোয়্যার মাইন্ড ইজ

উইদাউট ফিয়ার/ অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই/ হোয়্যার নলেজ ইজ ফ্রি/ হোয়্যার দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ নট বিন ব্রোকেন আপ ইনটু ফ্রাগমেন্টস বাই ন্যারো ডোমেস্টিক ওয়ালস।" বাংলায় কবিতার যে গুরু-গম্ভীর সুর আর তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ঋজু কাঠামো আছে, ইংরেজি অনুবাদেও তা পুরোপুরিই পাওয়া যায়। উমর খৈয়ামের কবিতা বাংলাতে অনেকেই অনুবাদ করেছেন, কিন্তু কবি কাজী নজরুল ইসলাম অনুবাদ করেছেন কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে (প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ চরণে অন্ত্যমিল আছে, তৃতীয় চরণে নেই)। সে কারণে সৈয়দ মুজতবা আলী নজরুলের অনুবাদের উচ্চ-প্রশংসা করে বলেছেন, খৈয়ামের অনুবাদের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অনুবাদ সকল কাজের কাজী। মূল লেখক লেখায় যে কাঠামো নির্বাচন করেছেন (যেমন দীর্ঘ বাক্য, জটিল বাক্য, অন্ত্যমিল, এক-শব্দের বাক্য), সেগুলো সাধ্যমতো অনুবাদে অবিকল রাখুন।

ভাষা-ভঙ্গির ক্ষেত্রেও এক-ই কথা প্রযোজ্য। জেমস জয়েসের গল্প অনুবাদ করার সময় বাক্য ইচ্ছামতো ভেঙে ছোট করে নিলে বোধগম্যতা হয়তো কিছু বাড়ে, কিন্তু জয়েসের শক্তিমত্তার কিছুই আর পাঠক অনুভব করতে পারেন না।

আবার হুমায়ূন আহমেদের গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় অনুবাদক যদি দীর্ঘ বা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেন, তবে হুমায়ূনের অনন্য 'ক্যাজুয়াল' ভাষা-ভঙ্গির সঙ্গে আর পরিচয় ঘটে না। গোগলের ঘুরিয়ে বলা আর চেখভের সরাসরি বলার ভঙ্গি অনুবাদেও একই রকম থাকা উচিত। জর্জ আর আর মার্টিনের কাব্যময় গদ্যভাষা আর হাইনরিশ হাইনের গদ্যময় কাব্য অনুবাদেও তার আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখুক।

তরুণ অনুবাদকদের কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, তবে কি অনুবাদকের ব্যক্তিত্ব বা রুচি-পছন্দের কোনো ছাপ অনুবাদে পড়বে না? এর উত্তর, অবশ্যই পড়বে। তবে তা পড়ুক অবচেতনভাবে, সচেতনভাবে নয়। অনুবাদকের সচেতন চেষ্টা হোক মূলের সঙ্গে পাঠকের পরিচয়কে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ করে তোলার। তাঁর চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতি, বাগভঙ্গির যে টুকু ছাপ চলে আসবে, তা দিয়েই পাঠক অনুবাদককে বিচার করে নেবেন। ফতেহ লোহানী, ননী ভৌমিক, দ্বিজেন শর্মা, কবির চৌধুরী– এঁরা সকলেই মূল থেকে বিচ্যুত না হয়ে অনুবাদ করেছেন, কিন্তু তার পরেও অনুবাদ পড়লে তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

তরুণ অনুবাদকদের শুভকামনা জানাই। আশা করি, তাঁরা অনুবাদের আগ্রহ ও চর্চা বজায় রাখবেন, উত্তরোত্তর নিজের অনুবাদের দক্ষতা বাড়াবেন। মূলের সবটুকুই কোন অনুবাদে আসে না, সে প্রত্যাশাই অন্যায়। কিন্তু মূল ভাষার পাত্র থেকে অন্য ভাষার পাত্রে স্থানান্তরের সময় যতটুকু মাধুর্য, যতটুকু সম্পদ অনুবাদক রক্ষা করতে পারেন, সেটুকুই তাঁর দক্ষতার পরিচায়ক। আর সুদক্ষ অনুবাদক ছাড়া বিশ্বের সাহিত্যকে সাধারণ বাঙালির এবং বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের সাধারণ পাঠকের দরবারে নিয়ে যাবার কোনো বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

১২ জুন ২০১৯

[লেখক: কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদ শিল্পী।]

অনুবাদে কী পাওয়া যায়?

জা ভে দ হু সে ন

ভাষা হচ্ছে চেতনার শরীর।

– জার্মান ভাবাদর্শ, কার্ল মার্ক্স

ভাষার মধ্য দিয়ে আমরা স্থান ও কাল পার হয়ে ভাবনা পৌঁছে দিতে পারি। মনের মধ্যে যে ভাবনা ছিল না তা অন্যের কাছ হতে আমার মনে আসতে পারে। পৃথিবীতে প্রায় ৭০০০ ভাষা আছে। এরা একে অপর হতে মৌলিকভাবে ভিন্ন। এদের স্বর, শব্দ, গঠন একে অপর হতে আলাদা। ভাষা আমাদের ভাবনার ধরন তৈরি করে। ভাবনার ধরন ভাষাকে নিজস্ব গঠন দেয়। আর ভাবনা মানেই আমাদের বেঁচে থাকার ইতিহাস। তাই ভাষা মানে ওই ভাষায় কথা বলা মানুষদের জগতের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনের ঘনীভূত রূপ।

শার্লেমন বলতেন যে, আরেকটা ভাষা জানা মানে আরেকটা প্রাণ পাওয়া। জীবন ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হওয়ার প্রক্রিয়া আমাদের অচেতনে হতে থাকে। ফলে আমাদের জীবনের বোধ আমরা জমা করে রাখি ভাষার মধ্যে। আর নির্দিষ্ট কোনো ভাষায় কথা বলা মানুষ সেই ভাষা হতে নিজের বহমান জীবনের বোধকে ধারণ আর

প্রকাশ করে। একসময় মনে হয় যেন ভাষাই বাস্তবকে তৈরি করে। আবার ভিন্ন তর্কও আছে। শেক্সপিয়র এমন বলেছেন –

নামে কী করে
গোলাপ যে নামে ডাকো, সমান গন্ধ ভিতরে।

আরেকটু এগিয়ে দেখা যাক। সূর্যকে জার্মানরা বিবেচনা করে নারী আর স্প্যানিশরা পুরুষ হিসেবে। চাঁদের ক্ষেত্রে ঠিক উলটো। এই যে সূর্যকে কেউ পুরুষদের মতো, অন্য ভাষায় কেউ নারীর মতো করে ভাবছে, এতে কি কোনো ফারাক আসে? যদি এই দুই ভাষার মানুষদের একটা ব্রিজ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়– এটা কেমন? জার্মানরা বলবে– ব্রিজটা সুন্দর। মানে নারীবাচক কোনো উপমা। স্প্যানিশ বলবে– ব্রিজটা শক্তিশালী, শক্তপোক্ত। মানে পুরুষবাচক কোনো অভিধা। লক্ষ করবেন, বহাল দাপুটে বাংলা কাব্যের ধরন, উপমা, উৎপ্রেক্ষা সংস্কৃত কাব্য হতে এসেছে। সংস্কৃতে চাঁদ পুরুষ। কিন্তু বাংলা কাব্যে চাঁদ ব্যতিক্রমহীনভাবেই নারী।

কোনো ঘটনার বর্ণনাও ভাষার ভিত্তিতে ভিন্ন হয়। ইংরেজরা বলবে– I broke my arm! কিন্তু অন্য ভাষার কেউ পাগল না হলে নিজের হাত নিজে ভাঙার কথা ভাবতে পারবে না। ধরুন আপনি একটা বাসন ভেঙে ফেললেন। ইংরেজরা বলবে - সে বাসনটা ভেঙে ফেলেছে। একজন স্প্যানিশ বলবে – বাসনটা ভেঙে গেছে। ইংরেজ মনে রাখবে, বলবে যে, কাজটা কে করেছে। স্প্যানিশ বলবে শুধু কী হয়েছে। কে করেছে এটা তার কাছে গৌণ। দুইজন মানুষ একই ঘটনা দেখে ভিন্ন ব্যাপার মনে রাখবে, বলবেও ভিন্ন কথা। এর সাথে অপরাধ, শাস্তি, আইন-কানুন– এইসব ব্যাপার জড়িত। দুই ভাষা যেন দুই জগৎ!

ট্রাজেডি হচ্ছে– আজ আমরা জগৎ সম্পর্কে যা জানি, তার প্রায় সবই জানি ইংরেজি ভাষার জগৎ দিয়ে। জগতের প্রায় সব মানুষের জানা, তার ভাবনার জগৎ এখানে গরহাজির। ফলে আমরা যা জানি তা ভয়ানক রকম সংকীর্ণ, খুবই পক্ষপাতদুষ্ট।

দুই

অনুবাদ ভাষা দিয়ে হয় না। ভাষা অনুবাদের প্রকাশক মাত্র। অনুবাদ করে আমাদের চেতনা। আমাদের চেতনা হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনের ইতিহাসের ঘনীভূত ফল। সেই ইতিহাস হচ্ছে আমাদের রাজনীতির ইতিহাস। প্রতি কালে শাসকদের চেতনাই ছিল শাসক-চেতনা। শাসিতরা যতক্ষণ শাসিত থাকে, ততক্ষণ শাসকদের চিন্তাই শাসিতদের চিন্তা হয়ে বিরাজ করে। সেই চিন্তাকে অনুবাদ করে শিক্ষাব্যবস্থা, আইন, প্রচারমাধ্যম, সংবিধান। সুতরাং, শাসিতদের মুক্ত হওয়া মানে অন্যের অনুবাদকে খারিজ করে নিজের মতো করে ভাষা তৈরি করে নিজের মতো করে চিন্তার অনুবাদ। সকল অনুবাদই আসলে চিন্তার অনুবাদ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই চিন্তা কার?

তিন

আমাদের জগৎও মূল আর অনুবাদ হয়ে বিরাজ করে। দুর্বলরা বাস করে শক্তিশালীদের নিজ মূল জগতের অনুবাদ করা জগতে। যেমন এখনকার বাকি জগৎ হচ্ছে পশ্চিমের মূল জগতের অনুবাদ। ভারতবর্ষ হচ্ছে ইংল্যান্ডের অনুবাদ করা জগৎ। আর এই অনুবাদ খুবই বাজে অনুবাদ।

চার

ভাষা আমার চেতনাকে আকার দেয়। কিন্তু তাকে পাই জন্ম মাত্র। তাকে পাই বহাল, প্রশ্নাতীতভাবে। এর মাধ্যমেই যেহেতু আমার চেতনা প্রকাশ পায়, তাই তাকে প্রশ্ন করা তার মাঝেই থেকে সম্ভব নয়। এই ভাষাকে, মানে আমার জন্মমাত্র পাওয়া অচেতন চেতনাকে প্রশ্ন করা যায়, যাচাই করা যায় আরেক চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে। মানে আরেক ভাষার সঙ্গে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। অনুবাদ হচ্ছে সেই বোঝাপড়া।

পাঁচ

অনুবাদ হচ্ছে টেক্সটের পরকাল। নিজ ভাষাতে সে তার জীবন কাটিয়ে নিয়েছে। সেই আমলনামার ওপর ভর করে এখন পরের কালে আর পরের ভাষায় তার জীবনের হিসাব-নিকাশ।

অনুবাদ কি কেবল মূল টেক্সটের বার্তাই বহন করে? তা নয়। লক্ষণীয়, সেই টেক্সটেরই অনুবাদ হয় যা কোনো না কোনো কারণে একটা পরীক্ষা পার হয়ে এসেছে। যে নিজেকে শুধু ভাষা বা ফর্মের কারিগরিতে গুরুত্ব দাবি করে তেমন টেক্সট অনুবাদ হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। অনুবাদ হয় সেই টেক্সটের যে নিজের সঙ্গে একটা ইতিহাস নিয়ে আসার সামর্থ্য রাখে। সময়ের সঙ্গে সে মূল লেখায় যত নতুন ভিন্ন অর্থ যোগ হয়েছে, অনুবাদে সেই সেই সবের নতুন প্রেক্ষিত যোগ হয়। কারণ সেই আদি বৃক্ষ পায় নতুন মাটি, নতুন জল-হাওয়া। সেই গাছের ফলের স্বাদ যাঁরা নেবেন তাঁরাও ভিন্ন স্বাদে অভ্যস্ত।

ছয়

অনুবাদের মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। মূল ভাষা আর অনুবাদের যে ভাষা তাতে অনেকগুলো তফাত থাকে। এখানে যা আছে, ওখানে তা নেই। দু'দিকেই কথাটা সত্যি। তবু এখানে যোগাযোগ হয়। এই যোগাযোগে একটা পক্ষ দাপটের ভূমিকা নেয়। কে সেই পক্ষ তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ফারসি থেকে মওলানা রুমির কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদের সময় কোলম্যান যে স্বাধীনতা নেন, তার ফলে কোনো ফারসিভাষী ইংরেজির মওলানাকে চিনতেই পারবেন না। কিন্তু ইংরেজি ভাষার যে পাঠকবাজার তার কাছে মওলানা অসহায়। ফলে ইউরোপের চোখে ফারসি না-জানা পাঠককে মওলানা রুমিকে চিনতে হয়।

সাত

আগে যেমন বলা হয়েছে, অনুবাদ কেবল বার্তা বহন করে না। প্রতিটি অনুবাদকর্ম দুটো ভাষার মাঝে একটা সংলাপ। তার মানেই দুটো সংস্কৃতির মাঝে সংলাপ। প্রতিটি অনুবাদকর্ম যে ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে সেই ভাষার সম্ভাবনা আর তার বহাল সীমাবদ্ধতা ধরিয়ে দিতে পারে। তবে ভাষারা একে অপরের কাছে আগন্তুক নয়। ইতিহাসের মাঝে তাদের কিছু সংযোগ থাকতে পারে। এর বাইরেও, মূল লেখায় যা বলা হয়েছে তার অনুভবের সঙ্গে অনুবাদ করা ভাষার অনুভবের একটা আত্মীয়তা আছে নিশ্চয়ই। নইলে তা অনুবাদ করার কথা অনুবাদক ভাববেন না। একদিকে অনুবাদক চান যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে মূল কাজের ফর্ম ও অর্থ নিজ ভাষায় তুলে ধরতে। আবার তা করতে হয় নিজ ভাষার বহাল সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে তাকে অতিক্রম করতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে। এই সীমাবদ্ধতা একই সঙ্গে সম্ভাবনাও বটে। কারণ যত নিখুঁতই হোক-না কেন, অনুবাদ কখনই মূলের কপি হতে পারবে না। কারণ দুটো আলাদা ভাষা দুটো ভিন্ন সংস্কৃতি, জীবনবীক্ষা আর ইতিহাস। ফলে অনুবাদ দুটো ইতিহাস আর জীবনকে একে অপরের সঙ্গে সংলাপে নামায়। অন্য কারো কাছে এমন কিছু আছে যা আমাদের কাছে নেই। সেই না-থাকা জিনিস আমাদের অভাব বোধ হচ্ছে। এই বোধের জায়গা থেকেই অনুবাদ শুরু হয়। এ শুধু শুরু। এর প্রভাব আরো গুরুতর।

আট

এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের সময় কী করি আর কী করা উচিত? যেমন, যখন ফারসি থেকে বাংলা করছি তখন কি ফারসিকে বাংলায় রূপান্তরিত করব, না কি বাংলাকে ফারসিতে নিয়ে যাব? প্রায় সকল ক্ষেত্রেই, আমরা ফারসিকে বাংলা করতে চাই। করা উচিত বাংলাকে ফারসি। অর্থাৎ নিজের ভাষাকে অন্য ভাষায় নিয়ে যাওয়াতেই অনুবাদের লক্ষ্য পূরণ হতে পারে। নিজের ঘাটতিগুলো পূরণ করা মানে নতুন ভাবনা, নতুন দৃষ্টিকে নিজের মাঝে হজম করা যেতে পারে। নইলে নিজের যা আছে তার মাঝেই অন্য ভাষার সম্পদকে আঁটিয়ে রাখতে গিয়ে নতুন কিছু আর পাওয়া হবে না। এই ব্যাপারটা আরেক ইঙ্গিত দেয়। অনুবাদ করতে গিয়ে মূল টেক্সটের ভাষাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই। কিন্তু আসল অনুবাদ হচ্ছে সেই যা মূল টেক্সটকে নিজ ভাষায় আনার চাইতে নিজ ভাষাকে মূল টেক্সটের ভাষায় নিয়ে যাবে। নইলে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে কিছুই পাওয়া হবে না। আর তা যদি না হয় তবে নিজ ভাষা, মানে নিজ ভাবনার জগৎ যেমন ছিল তেমনই থেকে যাবে।

নয়

দুটো শব্দ দুই ভাষায় একই অর্থ বা জিনিস বোঝালেও তার দ্যোতনা বা ভাব ভিন্ন হতে পারে। যেমন প্রতিরোধ শব্দটা। একজন ফরাসির কাছে তা গৌরবের অনুভব, তার মনে পড়বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের জাতীয় সংগ্রামের কথা। আর একজন ইংরেজের কাছে তা তার জাতির বিরুদ্ধে ফরাসিদের বিরোধিতার ইতিহাস মনে করিয়ে দেবে।

দশ

অনুবাদকের কাজ খুব উৎসাহব্যঞ্জক কিছু নয়। অনুবাদ খুব ভালো হলে কৃতিত্ব পুরোটাই মূল লেখকের ভাগে যাবে। আর তা না হলে পুরো বদনাম অনুবাদকের প্রাপ্য। আর মূল লেখার মৌলিকত্ব কখনোই অনুবাদে তুলে আনা যৌক্তিকভাবেই সম্ভব নয়। কারণ ভাষার শরীর যে শব্দ দিয়ে তৈরি হয়, সেই শব্দের ইতিহাস আর অভিপ্রায় ভাষাভেদে আলাদা। তা না হলে ভিন্ন ভাষাই তৈরি হত না। তবে অনুবাদকে যদি নিছক দুটো ভাষার মাঝে কারবার বলে না ধরি, যদি তাকে তৃতীয় কিছুর সাপেক্ষে বিচার করি, তবে অনুবাদে হারানোর বদলে নতুন কিছু পাবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

এগারো

মূল টেক্সটে যা বলা হয়েছে নিজ ভাষায় তার সমান্তরাল ভাবনাগুলো জোড়া লাগানোতেই অনুবাদকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। ভাবনাগুলোকে জোড়া দিয়ে অর্থবোধক এক জায়গায় তো মূল লেখক একবার করেই রেখেছেন। অনুবাদকের কাজ হচ্ছে মূল লেখকের অভিপ্রায়কে নিজ ভাষায় খুঁজে বের করা। মূল টেক্সটের শব্দের কাছাকাছি শব্দ নিজ ভাষায় খুঁজে বের করে তা জোড়া লাগানো অনুবাদকের কাজ নয়। বহু ক্লেশে তাঁকে বরং মূলের বৈশিষ্ট্যের ধরনকে নিজ অনুবাদে তুলে ধরতে হবে। এর মানে মূল আর অনুবাদ– দুটোকেই দুই ভাষা অতিক্রম করে আরো বড় কোনো ভাষার সাপেক্ষে মৌলিক করে তোলা। সেই ভাষা কোনো শব্দ দিয়ে তৈরি নয়। সেই ভাষা বহু বৈচিত্র্যের মাঝে মানুষের একত্বের ভাষা। শব্দহীন এই ভাষা শব্দময় ভাষার মাঝেই লুকিয়ে আছে। অনুবাদকের কাজ একে খুঁজে বের করা।

[লেখক: অনুবাদ শিল্পী ।]

অনুবাদের সমস্যা: এক ও অনুবাদের সমস্যা: দুই

জি ল্লু র র হ মা ন সি দ্দি কী

অনুবাদের সমস্যা: এক

অনুবাদ শুধু এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় নয়, এক যুগ থেকে অন্য যুগেও। ভাষার ভিন্নতার সঙ্গে কালের ভিন্নতা যুক্ত হয়ে অনুবাদকে একটি জটিল কর্মে পরিণত করেছে। অনুবাদের লক্ষ্য মূলের বক্তব্য শুধু নয়, মূলের রস পরিবেশন করা। এজন্য প্রয়োজন মূল রচনার শিল্পসত্তায় নিমজ্জন। কাজটি সহজ নয়, কারণ প্রতিটি ভাষার স্বভাব বলে একটা জিনিস আছে। এই স্বভাব গড়ে উঠেছে যাদের ভাষা সেই জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি, তার কর্মজীবন, তার ধর্মজীবন, তার অভিজ্ঞতা সবকিছুর সমন্বয়ে। শব্দসম্পদ, বাক্যগঠন রীতি, ব্যাকরণ পদ্ধতি– সবকিছুর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে একটা ভাষার স্বভাব। অনুবাদক যত বেশি তাঁর অনুবাদ্য রচনার ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবেন তাঁর কাজের দুরূহতা ততো বেশি প্রকট হবে তাঁর নিজের কাছে।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। উপরের বক্তব্য এই ধারণার উপর দাঁড়িয়ে, যে অনুবাদকর্ম প্রধানত একটি অপর ভাষা থেকে অনুবাদকের নিজের ভাষায় হয়ে থাকে। বাস্তবেও তাই দেখা যায়। তবে মনে রাখা দরকার যে সব ক্ষেত্রেই তা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীতও হতে পারে : অনুবাদক তাঁর আপন ভাষা থেকে অপর ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ, যার একটা বড় অংশ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিজের করা। বাকিটা ইংরেজিনবিশ বাঙালিদের করা।

কথা উঠতে পারে, এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটা ভালো এবং কেন ভালো। এমনও দেখা গেছে অনুবাদক মূল ভাষার সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন, সাহায্য নিয়েছেন একটি তৃতীয় ভাষার অনুবাদের এবং মূল ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি আছে এমন কোনো ব্যক্তির, যিনি তাঁর কোনো কোনো প্রাসঙ্গিক কৌতূহল মেটাতে পারেন। বুদ্ধদেব বসু কালিদাসের মেঘদূত কাব্য মূল সংস্কৃত থেকেই তর্জমা করেছিলেন কিন্তু শার্ল বোদলেয়ারের ফরাসি পাঠ বা হোল্ডারলিনের বা রিলকের জার্মান পাঠ তাঁর পুরোপুরি আয়ত্তে ছিল না। ফিটজেরাল্ড-এর ফার্সি জ্ঞান কতটা মজবুত ছিল বলা

যায় না। নর্থ তাঁর প্লুটার্ক মূল গ্রিক থেকে করেননি, ফরাসি অনুবাদের সাহায্যেই করেছিলেন। বাংলায় যাঁরা ইকবালের কাব্য তর্জমা করেছেন, তাঁরা অনেকেই– ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান– মূল ফার্সির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন না। তাঁদের মুখ্য অবলম্বন ছিল নিকোলসনের ইংরেজি ভাষান্তর। প্রফেসর এ. জি. স্টক লালনের ইংরেজি তর্জমা করেছিলেন প্রায় এক বর্ণ বাংলা না জেনেই। একজন ইংরেজিনবিশ বাঙালি তাঁকে লালনের আক্ষরিক এবং পঙ্‌ক্তি-বিন্যস্ত (Linear) সাদামাটা ইংরেজি অনুবাদ করে দিতেন তিনি সেটাকে ইংরেজি পদ্যে সাজিয়ে নিতেন, এই দুটি স্তরের মধ্যখানে যে অনুল্লিখিত স্তরগুলো অব্যশই ছিল, সেটা অনুমানের বিষয়।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে আন্দাজ পাওয়া যাবে অনুবাদকর্ম কত বিভিন্ন উপায়ে হওয়া সম্ভব। তবে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় : এ যাবৎ যত সার্থক অনুবাদ হয়েছে তার অধিকাংশ অপর ভাষা থেকে মাতৃভাষায়। এর কারণও স্পষ্ট। অনুবাদক একজন ভাব-পণ্যের মালগাড়ি নন। তিনি একজন লেখক, একজন স্রষ্টা; যা মাতৃভাষাতেই হওয়া যায়। অপর ভাষায় সফল সাহিত্য সৃষ্টি যেমন বিরল ঘটনা, সার্থক অনুবাদও প্রায় ততোটাই বিরল ঘটনা।

পরবর্তী সিদ্ধান্ত : অনুবাদক তাঁর স্বভাষায় যে দক্ষতা অর্জন করেছেন ঠিক ততোটা না হলেও প্রায় সমপরিমাণ দক্ষতা তাঁর অনুবাদ্য ভাষাতেও থাকতে হবে। এই শর্ত পূরণ অনেকেই করতে পারেন এবং করেন বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিপুল পরিমাণ অনুবাদ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ভাষা চর্চায় একটি দেশের অবস্থান কী তার ওপরই নির্ভর করে অনুবাদ পরিস্থিতি। অনুবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা জ্ঞান অল্পসংখ্যক ইংরেজের বা ফরাসির বা জার্মানেরই আছে এবং যাঁদের আছে তাঁদের মধ্যে আরও অল্পসংখ্যক অনুবাদে আগ্রহী। স্বভাবতই বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ এ যাবৎ যা হয়েছে তা মুখ্যত বাঙালিই করেছে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতাসম্পন্ন বাঙালির সংখ্যা অনেক বেশি। স্বাভাবিক নিয়মেই ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ সম্পূর্ণটাই বাঙালির কাজ। এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম : অপর ভাষা থেকে মাতৃভাষার অনুবাদ।

বাংলা সাহিত্যে এই স্বাভাবিক নিয়ম কার্যকর হতে পারেনি, ভাষা চর্চায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি বলে। প্রায় সহস্র বছরের আরবি, ফার্সি চর্চাও আমাদের ভাষায় ওই দুটি সমৃদ্ধ সাহিত্যের খণ্ডাংশও আনতে পারেনি। অতি অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই দুটি ভাষার সাহিত্য যে পরিমাণে মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছেন, পঁচিশ প্রজন্মেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেন তার সিকি পরিমাণও করতে পারেননি এই অপ্রতিরোধ্য হেঁয়ালির উত্তর খুঁজে দেখতে হবে। আমার আপাত সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের ভাষাশিক্ষার কোথাও গোড়ায় গলদ ছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে, যদি আমরা বিগত দেড়শ' বছরের ইংরেজিচর্চার দিকে দৃষ্টি ফেরাই। আমাদের ইংরেজি ভাষাশিক্ষায় শত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই শিক্ষার ফলে শুধু ইংরেজি সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্য আমাদের নাগালে এসে গেছে। ইংরেজি থেকে যে পরিমাণ অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল ও সম্ভব ছিল দশমাংশও হয়নি। কিন্তু আরবি-ফার্সির তুলনায় বেশি হয়েছে। আরো বড়ো কথা ইংরেজি সাহিত্যের সুবাদে পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, বাংলা সাহিত্যকে গভীরভাবে

প্রভাবিত করেছে; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের শক্তি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে মূলত আমাদের অভ্যাসগত অনুবাদ-বিমুখতায় কারণে অনুবাদ চিন্তা এদেশে অতীতে হয়নি, বর্তমানে কেবল শুরু হয়েছে। অনুবাদের অভিজ্ঞতা থেকেই অনুবাদ-চিন্তার জন্ম। অনুবাদ সংক্রান্ত যে সকল সমস্যার উল্লেখ এসেছে ও আসবে, তার প্রায় সবটাই পশ্চিমের

চিন্তা, ওদেরই অভিজ্ঞতার ফসল।

ইতিপূর্বে ক্লাসিক ও অনুবাদ প্রসঙ্গে আমরা অনুবাদ সংক্রান্ত কিছু মৌলিক সমস্যার কথা বলেছি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যে যেগুলো চিরায়ত সাহিত্যের স্বীকৃতি লাভ করেছে, তাদের একটি বড় অংশ পদ্যে রচিত। কবিতা অনুবাদের কিছু বিশেষ সমস্যা আছে, যা যথাযথ স্থানে আলোচিত হবে। তবে সাধারণ সমস্যা আছে যা অনুবাদকের জন্য শুরুতেই দাবি রাখে, সে হল অনুবাদে গদ্য বা পদ্যের ব্যবহার নিয়ে। মূল রচনা যদি পদ্যে হয় তাহলে অনুবাদে কি পদ্য ভাষা অবশ্য ব্যবহার্য?

রেনেসাঁস-পর্বে উত্তরটা হবে হ্যাঁ-বাচক। তবে অষ্টাদশ শতক থেকে এ পর্যন্ত, অর্থাৎ বিগত তিনশ' বছর উত্তরটা দ্বিধাগ্রস্ত। শেক্সপিয়র-এর সময়ে হোমার-এর বা ওভিদ-এর গদ্যানুবাদ প্রায় অবিশ্বাস্য। গদ্যের জন্য গদ্য, এবং পদ্যের জন্য পদ্য– এই নীতির ওপরই সে যুগের কৃতী অনুবাদকমণ্ডলী তাঁদের বিখ্যাত কাজগুলো করেছেন। তখনও ভাষাচর্চায় পাণ্ডিত্য ও নির্ভুলতার ওপর জোর পড়েনি। অনেকের ধারণা এলিজাবেথের যুগের অনুবাদ যে অতটা গৌরবের ভাগী, তার একটা কারণ– পাণ্ডিত্যের অত্যাচার থেকে অনুবাদকরা মুক্ত ছিলেন। পরবর্তী শতকের পাণ্ডিত্য তাঁদের অনুবাদকর্মে একদিকে যেমন নির্ভরযোগ্যতা দিয়েছে, অন্যদিকে আবার পূর্ব শতকের স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্যহানির কারণ হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হবস্-এর অডিসি উল্লেখযোগ্য। হবস্ তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দার্শনিক মেজাজে অর্থাৎ সত্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ না ঘটিয়ে মূলের প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বস্ততা সহযোগে যে অনুবাদ করেছিলেন,বলড (bald) বা কাঠখোট্টা, এই একটি শুষ্ক বিশেষণে ড্রাইডেন তা খারিজ করে দিয়েছেন। সতের শতকেই সপ্রাণ সৃষ্টির যুগ থেকে সাহিত্য সতর্ক বিবেচনার নিয়ন্ত্রিত পদচারণায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ড্রাইডেন এই যুগের প্রতিভূ। তিনি শুধুই একজন কবি ও নাট্যকার নন, তিনি একজন সন্ধিকালের সাহিত্যপুরুষ- Man of letters। শুধু স্রষ্টা নন– ভাবুক, সমালোচক, বিচারক, মন্ত্রদাতা। তাঁর সাহিত্যকর্মের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে তাঁর অনুবাদকর্ম। তাঁর কালে চসারের ভাষা সাধারণের পক্ষে অগম্য হয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেও মধ্য ইংরেজির উচ্চারণ রহস্য বুঝতে পারেননি। চসারের পঙ্‌ক্তিতে তিনি যে ত্রুটি লক্ষ করেছেন সে তাঁর অজ্ঞতাপ্রসূত, চসারের ত্রুটি নয়, পরবর্তীকালের আবিষ্কারে এটা ধরা পড়েছে। তবে অনুবাদের আদর্শ প্রসঙ্গে তিনি অন্যত্র কিছু কাজের কথা বলেছেন। চ্যাপম্যানের নীতি, ভাবানুবাদের নীতি, তিনি সমর্থন করেন। যেহেতু আক্ষরিক অনুবাদে অনুবাদকের হাত-পা বাঁধা অবস্থা একমাত্র আড়ষ্টতারই জন্ম দিতে পারে। তবে তিনি অন্যদিকে চ্যাপম্যানের নিয়মনিষ্ঠাকে

আক্রমণ করেছেন; তাঁর বিকট দীর্ঘ পংক্তি (his monstrous lenth of line) কে, তাঁর কর্কশ ছন্দ, তাঁর অস্বাভাবিক ইংরেজিকে হজম করতে পারেননি। তিনি একটি গভীর সত্যের দিকে ইংঙ্গিত করেছেন, তাঁর ওভিদ অনুবাদের লক্ষ্য বিষয়ে বলতে গিয়ে। "আমি চেষ্টা করেছি ওভিদকে তার স্বভাবগত মিষ্টতা, সহজতা এবং মসৃণতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং আমার পদ্যে এমন একটা ছন্দ প্রবাহ (cadence) দিতে এবং সেই জিনিস যাকে আমরা run of verse (কবিতার গতিধর্ম) বলে থাকি, যা আমরা মূল রচনায় লক্ষ করি এবং লাতিন থেকে ইংরেজিতে যতটা সম্ভব।"

মূল রচনার স্বভাব বুঝে অনুবাদকের কাজ হবে সেটা যথাসম্ভব রক্ষা করা। সহজতা দাবি করে সহজতা, যেটা হোমার প্রসঙ্গে আরন্‌লডের কথা, দৃঢ়তা ও ঘনবদ্ধতা দাবি করে ওই দুটি গুণ, যদি মসৃণতা মূলের একটি গুণ হয়ে থাকে, তবে মসৃণতাই অভীষ্ট হবে একজন অনুবাদকের। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অনুবাদের ভাষার ওপর বা সেই ভাষায় ছন্দ-রীতির ওপর অত্যাচার চলবে না। মূল রচনা যেমন তার ভাষার প্রতি বিশ্বস্ত, অনুবাদেও তেমনি অনুবাদের ভাষার প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে, বিসদৃশ কোনো কিছু করা চলবে না।

পদ্যের অনুবাদ গদ্যে হবে কিনা এ বিষয়ে ড্রাইডেন কিছু বলেননি। পদ্য রচনার গদ্যানুবাদ শুরু হয়েছে আরও পরবর্তী সময়ে। পদ্যকে পদ্যে রূপান্তরিত করার সমস্যা কবিরাই ভালো বুঝতে পারেন। তাই দেখা যায় ইয়েটস-এর সফোক্লিস (রাজা ইডিপাস) এবং রবার্ট গ্রেভস-এর হোমার (অ্যাকিলিসের রোষ, ইলিয়াডের নামান্তর) পদ্যের ত্রিসীমানায় নেই, পুরোটাই গদ্যে করেছেন বিংশ শতকের এই দু'জন কবি। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। ইয়েটস নিজে বিশটির ওপর কাব্যনাট্যই লেখেননি, কাব্যনাট্যের সমর্থনে তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন বিভিন্ন জায়গায়। এবং মঞ্চে কাব্য নাটকের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান তর্কাতীত। কাব্যসংলাপ গঠনের কলা-কৌশল তিনি জানতেন, কিন্তু সফোক্লিসের অনুবাদে তিনি কোনো ঝক্কি নিতে চাননি।

অপরপক্ষে গ্রেভস শুধু একজন সার্থক কবি নন, তিনি একজন সিদ্ধহস্ত অনুবাদকও। কিন্তু হোমার অনুবাদে তিনি এবং আমরা ধরে নেব সচেতনভাবেই গদ্য-পথের পথিক।

অগ্রজ অনেক কবির পদস্খলন দেখেই তাঁদের এই সাবধানতা কি না কে জানে। তবে এই সতর্ক ও বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। গীতাঞ্জলি'র গদ্যানুবাদই তার প্রমাণ।

গদ্য-পদ্যের প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে বৃহত্তর ভাষার প্রশ্নের সঙ্গে অর্থাৎ কোন্ ভাষা থেকে কোন্ ভাষায়, তার সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বি.বি.সি অধ্যাপক নেভিল কগহিল-এর কণ্ঠে তাঁরই অনুবাদে চসারের ক্যানটারবেরি টেইলস সম্প্রচার করেছিল। উদ্দেশ্য ইংরেজের ঐতিহ্য-চেতনাকে জাগ্রত করা। যদিও ফরমায়েশি কাজ, তবু কগহিল আশ্চর্য নিপুণতায় এই বিপুলাকার কাব্যকে বর্তমানের ইংরেজি পদ্যেই শুধু ভাষান্তরিত করলেন না, চসারের যাবতীয় রসিকতা, গল্পের কথকতা এমনকি স্থূলতা পর্যন্ত তুলে আনলেন তাঁর তর্জমায়। পদ্য থেকে পদ্য– এই নির্বাচন তাঁর ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়েছিল, কারণ মূলত মধ্য- ইংরেজি এবং আধুনিক ইংরেজি একই ভাষার দুই পর্যায়।

সফোক্লিসের গ্রিক ভাষার সঙ্গে ইয়েটস-এর ইংরেজি এই নিকট-সম্পর্কের দাবি করতে পারে না। কগহিল-এর ইংরেজি পুরোপুরি একালের হলেও তিনি চসারের ব্যবহৃত অন্ত্যমিল অর্ধেকেরও বেশি ব্যবহার করতে পেরেছেন। ইংরেজি থেকে জার্মান, জার্মান থেকে ইংরেজিতে, বা ফরাসি থেকে স্প্যানিশ ও স্প্যানিশ থেকে ফরাসিতে বা হিন্দি থেকে বাংলা ও বাংলা থেকে হিন্দিতে, কগ্‌হিলের সমপরিমাণে না হলেও বেশ কিছুটা স্বচ্ছন্দ অনুবাদের সুযোগ আছে এই ভাষাগত নৈকট্যের সুবাদে। এই সুযোগ যে ক্ষেত্রে নেই, সেখানে পদ্য থেকে পদ্য-নীতি অবশ্য পালনীয় নয়।

যাঁরা গদ্য থেকে গদ্যে অনুবাদ করেছেন বিশেষত উপন্যাস, তাঁরাও কাজটিকে সহজ বলে মনে করেন না। গদ্য সম্পর্কে ড্রাইডেনের উক্তি স্মরণযোগ্য– the other harmony of prose গদ্যের আলাদা ছন্দ, আলাদা সুর সঙ্গতির কথা। একজন অনুবাদক বলেছেন, তিনি যে বই অনুবাদ করবেন, তার গদ্যের ছন্দস্পন্দ, তার চেতনায় প্রবিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অনুবাদে হাত দেন না। তাঁকে কিছুদিন ধ্যানস্থ হয়ে থাকতে হয়, লেখকের গদ্যের মেজাজ তাঁর রক্তের প্রবাহে অনুভব করার জন্য। ফরাসি ঔপন্যাসিক প্রুস্তও বলেছেন এই 'অন্তর্লীন ছন্দের' বা ঢেউয়ের কথা, যা একজন লেখককে অন্যদের থেকে আলাদা করে। শব্দের বিপরীতে শব্দ খুঁজে পাওয়া বড় কথা নয়, যদিও এ-ও বলা হয়েছে যে, কোনো ভাষার একটি শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। যা পাওয়া যায়, তা বড়জোর নিকটবর্তী একটা শব্দ। সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা এই যে, অনেক সময়ই অভিধান এই ধারণাকেই সমর্থন করে। একটি শব্দের বিপরীত পাঁচটি শব্দ অভিধানে পাওয়া গেল, অথচ একটিও যথার্থ নয়– অনুবাদক মাত্রই এই অভিজ্ঞতার শরিক। যে কোনো ভাষার শব্দকোষ একটি জাতির মানসের ও তার সংস্কৃতির সৃষ্টি। সকল ভাষায় সকল ধারণা বা ভাব মেলে না। যখন একটি শব্দের সমদ্যোতনা-যুক্ত শব্দ অন্য ভাষায় অনুপস্থিত, তখন এই সমস্যা দেখা দেয়। সংস্কৃতির তারতম্যই এর জন্য দায়ী। চীনা ভাষায় গড বা ঈশ্বর-এর কোনো প্রতিশব্দ নেই। পাপ, পুণ্য বোঝায় এমন শব্দ আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের ভাষায় ছিল না বলে খ্রিস্টান প্রচারকেরা মুশকিলে পড়েছিলেন। পাপের ধারণার সঙ্গে যার পরিচয় নেই তাকে জন্মপাপী বলা, ও তাকে সকল পাপের ত্রাণকর্তার শরণাপন্ন হতে বলা যায় কেমন করে?

উপন্যাসের অনুবাদে অনেকেই এই সংস্কৃতির ও সমাজের পার্থক্যজনিত অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষত সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায়, উপন্যাসের সংলাপে অনেক গ্রাম্যতা, গালিগালাজ, স্থূলতা আছে যা অপর ভাষায় আনা দুঃসাধ্য। শেক্সপিয়র নাটকের কমিক দৃশ্যে নিচুতলার জীবনের যে বর্ণাঢ্য, সংকেতময় প্রায়শই অশ্লীলতা-দুষ্ট শব্দসম্ভার, ভিন্ন ভাষায় সেগুলোই অনুবাদকের শিরঃপীড়ার কারণ। ধর্মীয় অনুষঙ্গযুক্ত, সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, দেশজ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দসমষ্টি একটি বিশেষ ভাষার আপন সম্পদ। এ সকল শব্দ নিয়ে অনুবাদকের সমস্যা গদ্যে ও পদ্যে যেমন, তেমনি প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত যত সাহিত্য রচিত হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই বর্তমান। ভিন্ন ভাষার ভিন্ন প্রকৃতি সৃষ্টি করে গভীরতর সমস্যা। বিশেষ লেখকের বিশিষ্ট ভঙ্গি জন্ম দেয় সূক্ষ্মতম, গভীরতম সমস্যার। গদ্য থেকে হলেও,

সমকালের ভিন্ন সাহিত্য হলেও, অনুবাদককে এই সমস্যার সমাধান বের করতে হয়। সমকালীন একজন সার্থক অনুবাদক গ্রেগরি রাবাসা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন কানের ওপর, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপর। তাঁর ধারণায় সকল সার্থক রচনার মূলে আছে কান। তিনি মূলত স্প্যানিশ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এবং সার্থক অনুবাদকের খ্যাতি অর্জন করেছেন। ছন্দস্পন্দের যথাযথ পুনর্গঠন তাঁর বিবেচনায় বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এই চিন্তারই সম্প্রসারণ দেখতে পাওয়া যায় যখন কেউ বলেন, অনুবাদকের কাজ হল এক সংস্কৃতির বিশিষ্টতাকে অন্য সংস্কৃতির মধ্যে পরিবহন। অর্থাৎ একই সঙ্গে যুগপৎভাবে, অনুবাদকে হতে হবে স্বনিষ্ঠ ও তন্নিষ্ঠ।

সার্থক অনুবাদ কী? অনুবাদের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে, বা অনুসৃত হয়েছে, তার মধ্যেই দেখা যাবে উত্তরের বিভিন্নতা। মূলের ভাব-ভাষা ভঙ্গির প্রতি অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টায় বিপদ আছে। অনেকেই এই অসম্ভব চেষ্টা থেকে দূরে থাকার পক্ষপাতী। আধুনিকীকরণের পক্ষে একটা মতবাদ চালু আছে, যেহেতু অনুবাদকের দায়িত্ব তার বর্তমান পাঠকের প্রতি, মৃত লেখকের প্রতি নয়। বাইবেল ও অন্যান্য এলিজাবেথীয় অনুবাদ ওই সময়ের সাহিত্যের ভাষা ও ভঙ্গির সঙ্গে মিল রেখেই হয়েছিল। এলিজাবেথান অনুবাদক মনে-প্রাণে এলিজাবেথান ছিলেন, তাঁদের অনুবাদ-সাফল্যের কারণ হিসেবে এটা বলা হয়েছে।

সার্থক অনুবাদ একই সঙ্গে মূলের চরিত্র রক্ষা করে, এবং নিজের সাহিত্যে আপন স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে দেখা দেয়, ওই সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে যায়, ওই সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে। এই অর্জনের পথে অনুবাদক নিজেও একজন সাহিত্যিকের মর্যাদা পান। যাদের ধারণা অনুবাদ সৃষ্টি নয়, তাঁরা গড়পড়তা অনুবাদের কথা ভেবেই এটা বলেন কিন্তু অনুবাদের চরম উৎকর্ষের কথা মনে রাখলে অনুবাদ-কর্ম ও সৃষ্টিধর্মী-কর্মের মধ্যে তফাৎ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

সবশেষে একটা কথা মনে রাখা দরকার, চূড়ান্ত অনুবাদ বলে কিছু নেই। এমন অনুবাদক নেই যিনি ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে। দুটি একটি ভুল বা বিচ্যুতি সার্থকতম অনুবাদকেরও হতে পারে। আজকাল এই জন্যই অনুবাদকের সঙ্গে অনেক লেখক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বিশ্বাসী। যাঁরা অতিমাত্রায় সতর্ক তাঁরা এই সহযোগিতার শর্ত ছাড়া অনুবাদের অনুমতি দিতে রাজি নন। লেখকের সঙ্গে অনুবাদকের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা একটি আদর্শ প্রস্তাব। এটা লেখকের আদর্শকে তৃপ্ত করার জন্য নয়, বরং তাঁকে ভিত্তিহীন অহংকারের আবেশ-মুক্ত করার উপকারী। কথাটা আমার নয়, একজন লেখকের, যিনি এই নীতিতে বিশ্বাসী এবং নিজেও এই নীতির অনুসারী।

অনুবাদের সমস্যাঃ দুই

যে কোনো রুশকে জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদের প্রধান কবি, জবাব একটাই পাবেন– পুশকিন। পুশকিনের ভাষা যদি আপনার জানা না থাকে, তাহলে আপনিও আমার মতো, কারও সুপারিশ মাফিক একটি তর্জমা সংগ্রহ করে পড়বেন এবং নিশ্চিতভাবেই হতাশ হবেন। মনে হবে সস্তা সেন্টিমেন্টাল রোমান্টিক। দোষ পুশকিনের নয়। ইংরেজি অনুবাদে টেগোর পড়ে একজন উৎসাহী

ইংরেজ পাঠকও এভাবেই হতাশ হয়ে থাকেন।

ত্রাদুত্তোরে ত্রাদিতোরে-ট্র্যানস্লেটর ট্রেইটর– অনুবাদক বিশ্বাসঘাতক– এই বিখ্যাত উক্তির মধ্যে নিহিত আছে আমাদের আশাভঙ্গের রহস্য।

কবিতার অনুবাদ যে সবচেয়ে জটিল, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কোনো কবিতার কোনো অনুবাদ কোনোদিন সকলের মনঃপূত হয়নি। তবু কবিতার অনুবাদ, অনুবাদের ইতিহাসে একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে। অনুবাদ দুঃসাধ্য বলেই অনুবাদক নিরস্ত হননি।

ইতিপূর্বে আমরা নেভিল কগ্‌হিল-কৃত ক্যানটারবেরি টেইলস-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে সম্ভবত এই ধারণা দিয়েছি যে, কগ্‌হিল চসার-এর গুণাবলি তাঁর তর্জমায় ধরতে পেরেছেন। কথাটা এইভাবে বলা যায়– যাঁরা মূল-ভাষায়, মধ্য-ইংরেজিতে, চসার-এর কাব্য পড়তে পারেন, তারাও কগ্‌হিলের অনুবাদে সেটা তৎক্ষণাৎ চসেরীয় কাব্য বলে চিনতে পারবেন। চসারের ঠাঁট ও মেজাজ যথার্থই ধরতে পেরেছেন কগ্‌হিল।

এটা একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা, তবে একমাত্র নয়। সার্থক অনুবাদের পরিচয় যদি এই হয় যে, আপনি একই সঙ্গে মূল রচনার প্রকৃতি অনুধাবন করতে পেরেছেন, এবং অনুবাদটিও একটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ জিনিস বলে চিনতে পারছেন, তাহলে গ্রহণযোগ্য, এমনকি তৃপ্তিকর অনুবাদ আরও আছে, প্রতি সাহিত্যেই আছে। এবং আছে বলেই অনুবাদকর্ম চলছে।

কবিতার আকর্ষণ শুধু কবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এক ব্যাপক কাব্যানুরাগী পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত। অনেক সময় দেখা যায় অনুবাদে কবিদের চেয়ে এই বৃহত্তর গোষ্ঠীর আগ্রহই সমধিক। এঁদের অনুবাদ সংবাদপত্রের সাহিত্য পৃষ্ঠায় ছাপা হয়, এমনকি ছাপার বই হয়েও প্রকাশিত হয়। এই ধরনের অনুবাদে কবিতার বার্তা পাওয়া যায়, রস পাওয়া যায় না। কবিতার মধ্যে যেটুকু বার্তা, তারও একটা নিজস্ব মূল্য আছে। যেহেতু এই বার্তা কবির, তাই তা কখনো সাদামাটা গদ্য উক্তি নয়। মালার্মে-এর কোনো কবিতা যদি টানা গদ্যেও অনুবাদ করা যায়– পেঙ্গুইন মডার্ন পোয়েটস-এ সকল অনুবাদ টানা গদ্যেই করা হয়েছে– তাহলেও তার মধ্যে মার্লামের কবিতা-মানস কিছুটা ধরা পড়বে সন্দেহ নেই।

কবিতা সম্বন্ধে পাঠকের চাহিদা যদি বার্তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে যোগ্য ব্যক্তির হাতে গদ্য ভাষান্তর, বা মূলের প্রতি বিশ্বস্ত, নিরলংকার, সংযত পদ্যানুবাদও এই চাহিদা পূরণ করতে পারে।

কবিতার বার্তা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ, ইঙ্গিতময়। যখন প্রত্যক্ষ, তখন অনুবাদের কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ। যখন পরোক্ষ, যখন কবিতার কোনো বার্তাই ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসে না, যখন কবিতা কিছু বলে না, এক শুদ্ধ সত্তায় ধরা দেয়, তখনই অনুবাদ একটি অসম্ভব প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়।

এমন ধারণাও আছে, যে প্রশ্নটা শুধু কবিতার শুদ্ধতাকে নিয়ে নয়, প্রশ্নটা সাধারণভাবে কোনো কোনো ভাষার চরিত্রকে নিয়েও। একজন রুশ অনুবাদক বলেন, রুশ ভাষার প্রকৃতিই এমন যে অন্য ভাষায় রুশ কবিতা চরিত্রভ্রষ্ট হতে বাধ্য। এর অনুবাদ অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য। এবং

বিশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন: It is earthy, permeated with sound common sense and has a curious matter of fact quality. It is plastic. adaptable, comprehensive. Russian poets don't use literary or poetical expressions but the poetry conveys poignant feelings and consummate poetic art.

ঢালাওভাবে রুশ কবিতার এই সকল বৈশিষ্ট্য– সাধারণ নিত্যব্যবহার্য সাদামাটা গদ্য ভাষায়, প্রথাগত অলঙ্কার বা কাব্যভাষার সাহায্য ছাড়াই, একইসঙ্গে হার্দ ও সূক্ষ্ম-শরীর কাব্য রচনার ক্ষমতা– কোনো কবির বা কবিগোষ্ঠীর বা কোনো কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না করে একটি ভাষার বৈশিষ্ট্য বলে দাবি করা হয়েছে। ভাষা কিভাবে কবিতার ঐতিহ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এইভাবে করে, তা অন্যের পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত। তবে দাবিটা যেহেতু একজন রুশির যিনি তাঁর ভাষার চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাই আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করব। এবং কেন পুশকিনের অনুবাদ সকলকেই নিরাশ করে বুঝতে পারব। একা পুশকিন নন, তাঁর ভাষার সকল কবিই অনুবাদের অতীত।

পুশকিনের ইফগিয়েনি অনিয়েগিন, ন্যাবকভের অনুবাদে চমৎকার উৎরে গেছে বলে শোনা যায়। এ সম্পর্কে Helen Muchnic বলেছেন– ইনিও জন্মসূত্রে রুশি– "ন্যাবকভ পুশকিনকে খুন করেছেন, এক অবিশ্বাস্য সাহিত্যিক অপরাধ করেছেন"। এই অনুবাদকের ধারণা মতে রুশ ভাষার গঠনে, কিংবা এর ছন্দ-প্রকরণে এমন কিছু নেই যে জন্য রুশ কবিতার অন্য ভাষায় অনুবাদ অসাধ্য হবে। তবু কার্যত তাই দেখা যায়, এবং বিশেষ করে পুশকিনকে অন্য ভাষায় আনা 'অতিশয় দুঃসাধ্য' হয়ে পড়ে! রুশ কবিতার ভূমিলগ্নতা (earthiness), প্রত্যক্ষতা ও সরলতাই এজন্য দায়ী বলে তাঁর বিশ্বাস। এবং তাঁর সিদ্ধান্ত "পুশকিনকে রুশিদের একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি হয়েই থাকতে হবে, এই তাঁর নিয়তি"।

শেক্সপিয়রের সার্থক অনুবাদ জার্মান, পোলিশ ও রুশ ভাষায় সম্ভবত আরও কোনো কোনো ভাষায় হয়েছে বলে শোনা যায়। কিন্তু সম-সৌভাগ্য-বঞ্চিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও আমাদের বক্তব্যও প্রায় একই হতে পারে। রুশি কবিতা অননুবাদ্য বলে রুশিদের যে দাবি, সন্দেহ করি যে তার মধ্যে যথেষ্ট সত্য থাকলেও এই সত্যটা কেবল ঐ ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনুবাদসূত্রে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত, ফার্সি ও ইংরেজির সম্পর্ক বহুদিনের। এ শতকে অপরাপর মুখ্য ইউরোপীয় ভাষা, ফরাসি-জার্মানের সঙ্গে বিশেষভাবে এবং ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে কবিতায় সমৃদ্ধ উর্দু ভাষার সঙ্গে এই সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। আমাদের আপন অভিজ্ঞতার ওপর ভর করেই আমরা কবিতা অনুবাদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

আক্ষেপের বিষয় যিনি এই শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের একজন প্রধান কবি এবং এখন পর্যন্ত কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে যাঁর নাম সবার আগে উচ্চারিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে যাননি। কবিতা অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী। সম্প্রতি তাঁর অনুবাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বিরুদ্ধ মত শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর ছন্দ-কুশলতা

নিয়ে বা অনূদিত কবিতাকে তার স্বকীয় মূল্যে দাঁড় করাবার ক্ষমতা বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেউ অস্বীকার করবে না যে সত্যেন্দ্রনাথের একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, অনুবাদে সহজপটুত্ব। এবং অনুবাদকে অনুবাদ-গন্ধ-মুক্ত রাখার। এজন্য সত্যেন্দ্রনাথকে যদি কিছু মূল্য দিতে হয়ে থাকে, তবে দুঃখ করার কারণ নেই।

অনুবাদকর্মে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মৌমাছি-স্বভাবী, ফুলে ফুলে মধু আহরণ করেছেন, কোথাও স্থির হয়ে বসেননি। তাঁর আগ্রহ কবিতায়, স্বতন্ত্র কবিতায়, কোনো বিশেষ কবিতে নয়, কোনো বিশেষ সময়ের বা গোষ্ঠীর কবিতায় নয়। তিনি কাজ করেছেন কাব্যসংগ্রহ সম্পাদকের, অ্যানথলজিস্ট-এর মেজাজে। তাঁর আগ্রহ সর্বগ্র, তাঁর রুচি সর্বগ্রাহী।

সম্ভবত সেজন্যই যদিও তিনি সর্বাধিক আস্বাদ্য কবিতা উপহার দিয়েছেন বাংলা ভাষায়, কিন্তু কোনো বিশেষ কবি সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেননি, বা বিদেশের কোনো কাব্যধারা সম্বন্ধে। বাংলা কবিতার নতুন পথের সন্ধানে তাই তাঁর কবিতা কোনো ইঙ্গিতের উৎস নয়।

প্রসঙ্গত মনে আসে একজন ভিন্নধর্মী অনুবাদকের নাম– আর্থার ওয়েলি। চীনা কবিতার অনুবাদক। জাপানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। চীনা ও জাপানি ভাষার ও সাহিত্যের গভীরে ডুব দিয়েছেন। ঐ দুই দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লবের খোঁজ নিয়েছেন। পূর্ব-এশিয়ার চীনা ভাষার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের ভাষা ইংরেজির দূরত্ব দুই দেশের মধ্যেকার ভৌগোলিক দূরত্বের সমান। চীনা ভাষায় শব্দের সম্বন্ধ-বাচক কারক বিভক্তি এমন কি বর্ণমালা পর্যন্ত অনুপস্থিত। শব্দ বলতে সবই একমাত্রিক। দুটি ভাষার মধ্যে ব্যবধান বুঝাবার জন্য এ-ই যথেষ্ট। এইসব অসুবিধা অতিক্রম করে, এবং অনুবাদে মূল কবিতার বহিরঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত না করেও ওয়েলি যে অনুবাদ করেছেন, রসজ্ঞ মহলে তা উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে। অনুবাদে চীনের অনুষঙ্গ রক্ষিত হয়েছে। আবার স্বতন্ত্রস্বভাবী কবিতা হিসেবেও ওয়েলি'র অনুবাদ পাঠকের জন্য আনন্দ বয়ে আনে। একই ধরনের কাজ, তবে ব্যাপকতর পটভূমিতে, এবং বিপুলতর উৎসাহ নিয়ে করেছেন এজরা পাউন্ড।

তবে এজরা পাউন্ডের বহুভাষিকতা সর্বক্ষেত্রে সমান নির্ভরযোগ্য নয় বলে অনেকের মত, বিশেষত ওয়েলি'র তুলনায় চীনা ভাষায় তাঁর অধিকার কিছুটা দুর্বল। এজরা পাউন্ড ওয়েলি'র মতোই শুধু কবিতার নয়, সভ্যতার গভীরে ডুবেছেন। কবিতার পুনঃসৃষ্টি তাঁর বিবেচনায় সভ্যতার স্বার্থেই। কবিতা ভাষাকে চিরনতুন রাখে। ভাষার প্রাণশক্তি নষ্ট হলে তা সভ্যতারই পতন সূচনা করে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে এজরা পাউন্ডের চিন্তায় আছে বিপ্লবীর তীক্ষ্ণতা। অনুবাদ ভাষাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়, তার অভ্যাসকে ভেঙে দেয়, তার ওপর এক চাপ সৃষ্টি করে, যেহেতু অনুবাদ্য কবিতার অভিজ্ঞতাকে ধারণ করার জন্য কবির ভাষা তৈরি থাকে না। যে অনুভূতি মূল ভাষায় বন্দি হয়ে আছে নিজের ভাষায় তাকে মুক্তি দিতে হলে ভাষার ওপর জবরদস্তি না করে উপায় নেই। এই 'টেনশন'-এর সংক্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয় অনুবাদের ভাষার গূঢ় ও 'অনাবিষ্কৃত' মাত্রাগুলো।

অনুবাদের চাহিদায় ও চাপে ভাষার অজানা সম্ভাবনাগুলো বেরিয়ে আসে। এজরা পাউন্ডের অনুবাদে প্রাচীন ইংরেজি কবিতা 'সমুদ্রযাত্রী' (সি ফেয়ারার) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কবিতার যে ছন্দস্পন্দ ইংরেজি কবিতা থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, এজরা পাউন্ড সেটা ফিরিয়ে এনেছেন তাঁর এই বহুপ্রশংসিত অনুবাদে। প্রুস্‌ৎ যে প্রতিটি লেখকের নিজস্ব 'অন্তর্লীন ছন্দের' কথা বলেছেন, এজরা পাউন্ড তাঁর অনুবাদ-কর্মে সেই একই চেতনার প্রমাণ দিয়েছেন।

অনুবাদের কাছে নতুন চাহিদার জন্ম বর্তমান শতকের শুরুতে। এর ঢেউ বাংলা সাহিত্যে এসে পৌঁছুল ত্রিশের দশকে। মূলত বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তই ইউরোপীয় কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করলেন। সুধীন্দ্রনাথের হাইনে ও শেক্সপিয়রের সনেটের অনুবাদ থেকে ততোটা নয়, যতটা বিষ্ণু দের এলিয়ট অনুবাদে আমরা এই অন্তর্লীন গভীরতর ছন্দের প্রতি মনোযোগ লক্ষ করলাম। বাংলা কবিতার ছন্দাভ্যাস যেন এলিয়ট-অনুবাদে এসে শক্ত পাথরে ঘা খেল, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমরা যেন কবিতায় চীবরধারী মূর্তি প্রত্যক্ষ করলাম।

অনুবাদ-কর্মের মধ্যে যে টেনশনের কথা বলা হয়েছে, যার জন্ম মূলের চরিত্রকে অনুবাদে ধারণ করার চেষ্টায়, তার নবতর এবং বিস্ময়কর প্রকাশ নিয়ে দেখা দিল বুদ্ধদেব বসুর শার্ল বোদলেয়ার (ক্লেদজ কুসুম: ফ্লর দ্য মাল) এবং রিলকে থেকে অনুবাদ। বুদ্ধদেবের নিজের শেষ পর্বের কবিতায়ও একই টেনশন দেখা যায়। যেন ভিতরের এক গভীর অপ্রকাশ্য আবেগের প্রকাশবেদনায়– তাকে কবিতায় রূপান্তর করতে গিয়ে কবির সমগ্র সত্তা থরথর করে কাঁপছে। জ্যা-বদ্ধ ধনুকের মতো কবিতার ছন্দে সঞ্চারিত হল এক টানটান ভাব।

শার্ল বোদলেয়ার-এর এডগার এল্যান পো অনুবাদ ফরাসি কবিতায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, বলেছেন অনেকেই। ফিটজেরাল্ড-এর ওমর খৈয়াম, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-ও ইংরেজিতে এক অন্য জগতের খবর, এবং কবিতার স্বাদে-গন্ধে এক নতুনত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ার বাংলা কবিতার অনুভূতি ও রুচির মণ্ডলে একটা ক্ষুদ্র বিপ্লব ঘটিয়েছিল, এই ধারণা অনেকেই, বিশেষত তরুণ কবিদের মধ্যে অনেকেই পোষণ করেন। বুদ্ধদেব আরো অনুবাদ করেছেন– যেমন হোলডারলিন ও রিল্‌কে– তবে বিশেষ করে তাঁর বোদলেয়ার অনুবাদ বাংলা কবিতার বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে একটি 'ঘটনার' মর্যাদা পেতে পারে।

ফিটজেরাল্ডের ওমর খৈয়াম যে নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছিল, সেটা মূলত ভাবের নতুনত্ব, কবিতার নয়। কবিতা হিসেবে তাঁর ইংরেজি রুবাইগুচ্ছকে অনেকে ভিক্টোরীয় যুগের গৌণ কবিতার সকল লক্ষণাক্রান্ত, সেহেতু অবশিষ্ট বলেই মনে করেন। গীতাঞ্জলি সম্পর্কে অতটা না বললেও,– যদিও এর গদ্য গঠনে বাইবেল-এর ও liturgy সুর অস্পষ্ট নয়, এর আবেদন নতুন কবিতা পরিচয়ে নয়, এক স্নিগ্ধ সুদূর প্রাচ্য-গন্ধী ভাবজগতের সংবাদবাহী পরিচয়ে। একগুচ্ছ সম্পূর্ণ নতুন চিত্রকল্প, এক সর্বসমর্পিত আত্মনিবেদন কবিতায় অপরূপ কারুকর্মে যখন উদ্ভাসিত হল, এবং তাঁর ঋষিকল্প সৌম্যমূর্তি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপের কবিসভায় দেখা দিলেন, তখন কিছুক্ষণের জন্য সকলেরই নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার কথা।

বুদ্ধদেবের বোদ্‌লেয়ার শুধু এক যন্ত্রণাদগ্ধ চেতনার মসীকৃষ্ণ, বিদ্যুৎ- ঝলকিত জগতেরই উন্মোচন নয়, একই সঙ্গে বাংলা কবিতার আধুনিকতম রূপের এক উজ্জ্বল প্রকাশ।

বাংলা কবিতায় এর পর এক প্রজন্মের কবিকুল বুদ্ধদেব-বোদলেয়ার-এর ঘোরে আছন্ন, আধুনিকতার এক নতুন পরিচয়ে দীক্ষিত। ক্লেদজ কুসুম-গন্ধী আধুনিকতার প্রতিপত্তি দেখে পাছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সিংহাসনচ্যুত হন, তাই আবু সায়ীদ আইয়ুব তাঁকেও অমঙ্গলের জগতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও দূরপ্রভাবী অনুবাদ আর হয়নি।

ত্রিশের দশকের এই তিনজন কবি – সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে– বাংলা অনুবাদ কবিতার নিঃসন্দেহে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। ইতিপূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম, কান্তি ঘোষ ও নরেন্দ্র দেব চেনা- অচেনা জগতের কবিতা বাংলা তর্জমায় পরিবেশন করেছিলেন। নরেন্দ্র দেব ওমর খৈয়ামের রুবাই-এর চতুষ্পদী চরিত্র রক্ষা করেননি, আঙ্গিকে অবিশ্বাস্য স্বাধীনতা নিয়েছিলেন, যা কান্তি ঘোষ ও নজরুল ইসলাম করেননি। বাংলা কবিতার ঋতুবদলে এইসব অনুবাদের কোনো ভূমিকা নেই। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে যে আন্তর্জাতিকতা ছিল, কবিতার নির্বাচনে, সেই সূচনাকে ত্রিশের দশকের কবিরা পরিণতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী দশকগুলোতে যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁদের জন্য অনুবাদের একটা উচ্চমান নির্ধারণ করে গিয়েছেন এই তিনজন কবি। ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও কবিতায় আধুনিকতা যে একটি অখণ্ড ও অবিভাজ্য ঢেউ, এই চেতনার জন্মদাতা প্রধানত বুদ্ধদেব বসু; এই চেতনার বিস্তৃতি যাঁদের অনুবাদকর্মে এখন ঘটে চলেছে, তাঁরা প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবপন্থী। অনুবাদ তাঁদের কাছে একই সঙ্গে আত্ম-আবিষ্কার ও বিশ্ব-অন্বেষা। নিজের কবি-সত্তার বিকাশের জন্যই একজন কবি অনুবাদক হয়ে যান, বা অন্যভাবে বলতে গেলে, অনুবাদের অভিজ্ঞতা একজন কবির পক্ষে তাঁর আপন শক্তি আবিষ্কারের একটি অব্যর্থ পন্থা, বাংলা সাহিত্যে বিগত অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলাভাষী জগতের উভয় খণ্ডেই এটা ঘটেছে। ভাষাচর্চায় পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে আছে, তুলনামূলকভাবে। স্বভাবতই অনুবাদের ধারা ওদিকে আরও প্রখর ও বিচিত্র। তবে বাংলাদেশেও মূলত ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে কবিতার বিশ্বচরিত্র ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে চলেছে। পরোক্ষ অনুবাদের দূরান্বয়িতা, দ্বিধা ও অস্পষ্টতা এ পর্যায়ে অনিবার্য। তবে প্রকৃত ও সৃষ্টিধর্মী অনুবাদের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে অনুবাদের এই পর্যায়ও ইতিহাসে তার প্রাপ্য মর্যাদা পাবে।

বাংলা ভাষায় যত বিদেশি কবিতার অনুবাদ এ যাবৎকাল হয়েছে, তার অধিকাংশই পরোক্ষ। সু-কবির হাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অনুবাদও প্রায় পুনঃসৃষ্টির স্তরে পৌঁছাতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা খুব কম।

অনুবাদক কবির ব্যক্তিত্ব যত প্রবল, অনুবাদ ততোই পুনঃসৃষ্টির পথ ধরে। অর্থাৎ মূল কবির চেয়ে অনুবাদকের কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হয় বেশি। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে'র হাতে শেক্সপিয়র সনেটের অনুবাদে শেক্সপিয়রের মাধুর্য, সরলতা, নম্রতা সবই খর্ব হয়েছে। কিন্তু তবুও দুজন অনুবাদক কবির বিশিষ্ট কাব্যগুণের স্পর্শ লাগায়, কবিতার উপভোগ্যতা নষ্ট হয়নি। সৃষ্টিধর্মী অনুবাদ মাত্রই

সম্ভবত কিছু ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের ছবি তুলে ধরে।

তবে প্রসঙ্গত যে ক্ষতির কথা বলেছি, সেটা একেবারেই অনিবার্য তা-ও বলা যায় না। রুশ ভাষায় শেক্সপিয়র-সনেটের সার্থক তর্জমা করেছেন মার্শাক ও পাস্তেরনাক। দুজনের কাজের উচ্চ প্রশংসা করেছেন রুশ সমালোচক-মণ্ডলী। একজন বলেছেন, 'অনুবাদ যতটা নিখুঁত হওয়া সম্ভব, তাই সম্ভব করেছেন' মার্শাক ও পাস্তেরনাক। ছেষট্টি নম্বর সনেটের পাস্তেরনাক-কৃত অনুবাদ সম্বন্ধে এই সমালোচক বলেন "মনে হয় তিনি শেক্সপিয়রের এই সনেটের মধ্যে যে অন্তর্গূঢ় বহু ব্যঞ্জনা– মাল্টিপ্লিসিটি অব সেন্স– তার ভঙ্গির স্পষ্টতায় ও সরলতায় মিলিয়েছেন এবং একটি সুসঙ্গত সম্পূর্ণতা দান করেছেন, যদিও কখনো কখনো তাঁর নিজের কবি-প্রেরণা তাঁকে মূল কবিতা থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়েছে...। মার্শাকের অনুবাদেও তিনি দেখছেন 'নম্রতা ও কারুকার্যের' বিবাহ।

সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদে তেইশটি সনেটের মধ্যে এই ছেষট্টি নম্বর অনুপস্থিত। বর্তমান লেখকের হাতে এই সনেটের 'স্পষ্টতা ও সরলতা, নম্রতা ও কারুকার্য' কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, অন্যরা বলবেন। তবু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অনুবাদটি উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করছি :

দেখে দেখে ক্লান্ত আমি, খুঁজি তাই মরণে বিশ্রাম।
এখানে দেখেছি যত গুণবান জন্মেই ভিখারি,
এবং নির্গুণ যারা তারা সুখী, চরিতার্থকাম।
শুদ্ধতম অনুরাগ ছলনায় বিঁধেছে শিকারি।
এবং কী লজ্জাকর সম্মানের অপাত্রে প্রদান,
এবং অপাপবিদ্ধ শুভ্রতার রূঢ় বলাৎকার,
এবং যা নিষ্কলঙ্ক অকারণে তার অপমান,
পঙ্গু প্রভুত্বের হাতে লাঞ্ছনা দেখেছি প্রতিভার।
এবং সাহিত্য শিল্প রুদ্ধবাক শক্তির দাপটে,
মূর্খতা ওস্তাদি ক'রে বনে যায় বিজ্ঞতার দাদা,
এবং সরল সত্য দেখি তার মূর্খ নাম রটে,
এবং নাচার সাধু দণ্ডধর চোরের পেয়াদা।
এই সব দেখে শুনে ক্লান্ত আমি চলে যেতে চাই,
কিন্তু আমি চলে গেলে সখার দোসর কেউ নাই।

কবিতা অনুবাদের মধ্যে বিচিত্র সমস্যার সবগুলোর উল্লেখ সম্ভব নয়। ভাষার প্রকৃতিভেদে, কবির প্রকৃতিভেদে, বিশেষ কবিতার প্রকৃতিগত, উপমাগত, আবহগত বৈশিষ্ট্যর কারণে, কোনো কোনো সময় অন্তর্গূঢ়তার কারণে, এসব সমস্যার জন্ম। এ জন্যই একই কবিতার বিভিন্ন অনুবাদকের হাতে কী রূপ গ্রহণ করে, তার তুলনামূলক বিচার কবিতা-পাঠকের কাছে এই অনুবাদ রহস্যের জগৎ উন্মোচন করে। ইংরেজির মতো অনুবাদসমৃদ্ধ সাহিত্যে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কিছু উদাহরণ বাংলা সাহিত্যেও আছে। শেক্সপিয়র, ইয়েটস, এলিয়ট, মার্লামে, বোদলেয়ার, রিলকে-র কোনো কোনো কবিতার দুটি বা তিনটি বা আরও বেশি অনুবাদ হয়েছে– মূলের সঙ্গে এগুলো মিলিয়ে পড়লে কবিতা অনুবাদের দুরূহতা, সমস্যা ও তার সৃষ্টিধর্মিতা বুঝতে পারা সহজ হবে।

সংগ্রহ সূত্র: বই: অনুবাদ। লেখক: জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, প্রকাশক: বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল: ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, অনুবাদ শিল্পী। প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা (১৯৯০-১৯৯১)]

সাহিত্য ও দর্শনের অনুবাদ নিয়ে ...

বি পা শা ম ন্ ড ল

টানা চৌদ্দ বছর ধরে অনুবাদের কাজ করছি বলে, অনুবাদ বিষয়ে কিছু কথা বলার অধিকার যেন তৈরি হয়ে যায়।

প্রথম যে অনুবাদের বই হাতে পাই, সেটা ছিল রাশিয়ান ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত রূপকথার গল্পের বইটি। এরপর বিশ্বসাহিত্যের সব ছোটগল্প, প্রথম ছোটগল্পকার অ্যাডগার অ্যালান পো, আন্তন চেখভ, মোপাসাঁ, রাশিয়ান ছোটগল্প ইত্যাদি। আমার ভাগ্য ভালো যে ঐ বইগুলো সব দক্ষ অনুবাদশিল্পীদের করা ছিল।

অনুবাদ বইয়ের বিষয়ে প্রথম দ্বিধাগ্রস্ত হই নিউজপ্রিন্টে ছাপা পশ্চিমের অর্থাৎ ওয়েস্টার্ন সিরিজ এ-জাতীয় বইগুলো নিয়ে। পরে বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি, ওগুলো আসলে ঠিক অনুবাদগ্রন্থ নয়, ইংরেজি সিনেমা দেখে ঝরঝরে আকর্ষণীয় ভাষাভঙ্গিতে লেখা বিভিন্ন সিনেমার সারাংশ। কিন্তু কিশোর বয়সে মনের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে রেখে ওগুলোই তখন গিলেছি গোগ্রাসে। এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে যখন আমি 'ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সি' পড়েছি, ঠিক তখনই আমি 'বুনো পশ্চিমও' পড়েছি। কোনোটাই খারাপ লাগেনি। এক বিচিত্র পাঠরুচি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শেক্সপিয়রের সবগুলো নাটকের গদ্যরূপ পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলাম স্কুল থেকে। সে-ও এক অর্জন। একদিকে বাংলা সাহিত্যের সবকিছু পড়ছি, অন্যদিকে কাগজে ছাপা অনুবাদ নামে যা কিছু হাতে পড়ছে সব পড়ছি। তখনই ইংরেজিতেই পড়েছি পার্ল এস বাকের, দ্য গুড আর্থ।

নিজের লেখার গোপন তাড়না সেই কবে থেকে, যখন মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়ি। স্কুল ম্যাগাজিনে। স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত বিজয় দিবস বা একুশে ফেব্রুয়ারির পত্রিকায়। কলেজের দেয়ালপত্রে, ম্যাগাজিনে। ঘরে জমা হয়ে যায় ইংরেজি উপন্যাসের স্তূপ। বাংলা অনার্সের ছাত্রী, বইগুলোর দিকে তাকিয়ে করুণ চোখে ভাবি, কখনো এ বইয়ের কালো অক্ষরের তলায় লুকানো ভাব ও ভাষা কি আমি বুঝতে পারব!

লিটলম্যাগসহ জাতীয় পত্রপত্রিকায় কবিতা, ছোটগল্প ছাপা হতে শুরু করেছে। পেশায় শিক্ষক। তখন কয়েকজন সহযাত্রী ২০০৬ সালে অনুবাদ করার তাগাদা দিলেন। দুরু দুরু বুকে ভাবি আমি কি আসলে অনুবাদ করার মতো দক্ষতা অর্জন করেছি! কিন্তু আশ্চর্যজনভাবে ওই দুর্বল সারাংশের প্রায় লেখকের ইচ্ছেমতো মনের মাধুরী মেশানো লেখা নিউজপ্রিন্টের বইগুলো আমার জন্য একটা

দৃষ্টান্ত দাঁড় করাল, যদি ওইগুলো অনুবাদ হয় আর সেগুলো স্বীকৃত পুস্তক হিসেবে মান্যও হয়, তবে আমি খেটেখুটে ডিকশনারি খুঁড়ে যথাযথ শব্দটা নিয়ে নিজের এতকালের পাঠ-অভিজ্ঞতা ও বিদ্যালয় জীবন থেকে করে চলা সাহিত্যচর্চার (কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ তিন ক্ষেত্রেই) দক্ষতা নিয়ে কেন ইংরেজি ভাষাকে লাগাম পরিয়ে বাংলায় পাঠযোগ্য রূপ দিতে এত ভীত বোধ করব? ম্যাজিকের মতো কাজ করল চিন্তাটা। এখন বুঝতে পারি আমার সাহসের উৎস আসলে ছিল বাংলা বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের প্রাতিষ্ঠানিক আবশ্যিক পুস্তকপাঠ এবং সর্বভুকের মতো কালির অক্ষরে যা লেখা আছে আর যেসকল পুস্তক চোখের সামনে পড়েছে সেসব চক্ষু ও মস্তিষ্কে ধারণের মধ্যে নিহিত।

ইংরেজি ভাষায় লিখিত সাহিত্য ও দর্শন থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে আমাকে বিস্তর ঘাঁটতে হয়েছে। পনেরো থেকে বিশটা ইংরেজি কোর্স করেছি তিন মাস থেকে এক বছরে। এমনও ঘটেছে যে সকালে একটার ক্লাস করেছি আবার সন্ধ্যার পরেই আরেকটা। সে এক ঝিনুক দিয়ে জাহাজ সেঁচার ইতিহাস। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কেউ যদি অনুবাদ করতে চায় তার সমস্যা অগুনতি, ইংরেজি মাধ্যমের পড়াশোনার কথা জানি না, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে আবশ্যিক ইংরেজি বলতে যা বুঝাত তা আসলে না বুঝে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করার মতোই বিষয় ছিল। মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্স পড়ুয়া ততোধিক ছাত্র-ছাত্রীকে কাছে থেকে দেখেছি, ইংরেজি বইয়ের একপাতা অপরিচিত বাক্যকে তারা কী ভীষণ ভয়ের চোখে দেখে। অথচ তারাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে গেছে। স্যালুট জানাই তাদের স্মরণশক্তিকে, না বুঝেই কঠিন সব কোটেশন মুখস্থ করে আবার পরীক্ষার খাতায় সেগুলোকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপনও করেছে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে অবশ্য কিছুটা ভিন্নতা এসেছে। সে ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষা তো দূরে থাক, যে ভাষাটিকে আমরা অন্যতম প্রধান ভাষা হিসেবে বিদ্যালয়ের শুরুর দিনটি থেকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি, সে ভাষা থেকে মাতৃভাষায় সাহিত্যিক গুণাবলিসহ ভাষান্তরিত করার ক্ষেত্রে বহুরকম বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা, সমস্যা পাহাড়ের মতো সামনে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে।

একটুও কি ভয় পাইনি? ভয় পেয়েছি। হাউমাউ করে কেঁদেছিও। কেউ নেই পরামর্শ দেবার, সহযোগিতা করার, অথচ অনুবাদ করতে গিয়ে একেকটা শব্দ বা অনুচ্ছেদ ভাঙা কাচের মতো বুকে বিঁধে আছে। একদিকে দর্শনের বইয়ের দ্ব্যর্থত্মক শব্দবাক্য, অন্যদিকে বাংলাভাষায় অনুধাবনযোগ্য করে একে উপস্থাপনের প্রবল চ্যালেঞ্জ। শেষে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড পড়ে ফেলে আবার নতুন করে শুরু করেছি। এখন শুনি যে আসলে আগেই পশ্চাৎপট জেনে নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশকাল পটভূমি সম্পর্কে অবগত হওয়াটা ততটা অসুবিধাজনক নয়, কিন্তু একজন অনুবাদক যখন দর্শনের গ্রন্থ অনুবাদ করতে যাবেন তখন তাকে আসলে অথৈ জলে পড়তে হবে। এখানে পুঁথিগত বা একাডেমিক শিক্ষা কোনো সহযোগিতা করতে পারে না। আর ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে দর্শনের মৌলিক বইগুলো অনুবাদ করতে পারাও যায় না। দর্শনের মূল টেক্সট বইগুলোর অনুবাদে আগ্রহী খুব কম লোকই আছেন, এটা একটা বাঁচোয়া। সে ক্ষেত্রে

সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রগুলো

কাব্যগ্রন্থ, নাটক, গল্পগ্রন্থ, উপন্যাস, সমালোচনাগ্রন্থ, রহস্যোপন্যাস, জনপ্রিয় হাল্কা ধরনের উপন্যাস ইত্যাদি। এর বাইরেও কেউ কেউ গভীর দার্শনিক উপন্যাস অথবা গানও অনুবাদ করে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্ন ভাষা থেকে আমরা শুধু গল্প বা উপন্যাসই ভাষান্তর করি না, সেই সঙ্গে সেই পটভূমির সংস্কৃতিও অনুবাদ করি।

সাহিত্যের অনুবাদ নিয়ে সমস্যা চিরন্তন। বিশেষ করে কবিতায়। রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন, 'অনুবাদে যা নষ্ট হয় তাই-ই কবিতা।' কী ভয়ঙ্কর কথা! যদি তাই হয় এই বৈশ্বিক বাস্তবতায় এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মনিমুক্তোর রঙ কী করে দেখবে? কারণ, সবার পক্ষে তো ওইসব বিশেষ ভাষা জেনে সরাসরি সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে অনুবাদই একমাত্র অবলম্বন। আর এক্ষেত্রে রবার্ট ফ্রস্টের কথা মেনে নিয়ে কবিতার অনুবাদ একটা বিশেষ চ্যালেঞ্জ। এক ভাষায় যেটা ভীষণ সুন্দর বা আবেগময় অন্যভাষায় আক্ষরিক অনুবাদে হয়তো তা সম্পূর্ণই ভিন্ন অর্থে দাঁড়িয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শুধু কৃষ্টি, সংস্কৃতি অথবা ভাষা ব্যবহার নয়, এমনকি ভৌগোলিক পার্থক্যও ভুল তথ্য দিয়ে বসবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাশ্চাত্যের গ্রীষ্মকাল বসন্তকালের মতোই আদরের, কিন্তু বাংলাদেশ বা এশিয়ার গ্রীষ্মকালে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ে। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের কোনো কবি যদি গ্রীষ্মবন্দনায় মুখর হন, আর আক্ষরিক অনুবাদে আমাদের সামনে বিষয়টা উপস্থাপিত হয়, আমরা আতঙ্কিত হয়ে ভাবব, কবি এত গ্রীষ্ম গ্রীষ্ম করছেন কেন, শীত শীত বা বর্ষা বর্ষা করছেন না কেন। বাংলায় 'ব্রীড়া' বলে যে শব্দটি কবিরা ব্যবহার করেছেন, ওই শব্দটির সঠিক ইংরেজিই-বা কী হবে তা নিয়ে সঙ্কটে পড়তে হবে বাংলা থেকে ইংরেজি করতে গিয়ে। এ রকম আরেকটি শব্দ 'অভিমান'। অভিমান শব্দটির সঠিক ইংরেজি কী হতে পারে? অন্য দিকে ইংরেজি 'ব্লাশ' শব্দটি যখন বাংলায় বোঝাতে যাই তখন শুধু 'মুখ লাল হয়ে উঠল' বা 'কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল' লিখলে যথেষ্ট হয় না। আরো বেশি ব্যাখ্যা দাবি করে, কারণ মুখ লাল রাগেও হতে পারে। কান পর্যন্ত লাল লজ্জায়ও হতে পারে। কিন্তু এখানে অনুরাগের কথা বলা হয়েছে। অথচ এই 'অনুরাগ' শব্দটিরও যথাযথ ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই। মাঝে মাঝে তাই মনে হয় অনুবাদ প্রক্রিয়া এক আশ্চর্য চক্র, যেন এর শুরু নেই, শেষ নেই। কোনোভাবেই যেন অন্যভাষার ভাব-ভাষা আরেকটি ভাষায় হুবহু নিয়ে আসা যায় না।

তাহলে কি বাংলা থেকে অন্যভাষায় অনুবাদ বা অন্যভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ কি থেমে থাকবে? মোটেই নয়। বিশিষ্ট অনুবাদক চিন্ময় গুহের জবানিতে দেখি,

"উনিশ শতকে যে আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা নিয়ে রেনেসাঁসের অন্বেষণ শুরু হয়েছিল, তা অনুবাদকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখেনি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি 'শকুন্তলা' (১৮৯৯),

'উত্তররামচরিত' (১৯০০), 'রত্নাবলী' (১৯০০), 'মালতীমাধব' (১৯০০), 'মৃচ্ছকটিক' (১৯০১), প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদের পাশাপাশি ফরাসি থেকে মলিয়েরের 'ল্য বুর্জোয়া জাঁতিয়ম'-এর বাংলা অনুবাদ 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), পিয়ের লোতি'র 'ল্যাঁদ সাঁ লে জাঁগ্লে'-র বাংলা ভাষান্তর 'ইংরাজ-বর্জিত ভারতবর্ষ', নানা ছোটগল্প ও কবিতা এবং মারাঠি থেকে 'ঝাঁসির রাণী' (১৯০৩) ও বালগঙ্গাধর তিলকের 'গীতারহস্য' অনুবাদ করতে পারেন, মাইকেল মধুসূদন যদি মূল গ্রিক থেকে 'হেক্টরবধ' (১৮৭১) অনুবাদ শুরু করতে পারেন, স্বয়ং বিদ্যাসাগর যদি হিন্দি থেকে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৭৪), ইংরেজি থেকে শেক্সপিয়রের গদ্যানুবাদ, সংস্কৃত থেকে কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' বা ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এর বঙ্গীকরণ করতে পারেন, তবে আজ একুশ শতকে অনুবাদের জগতে এই নৈরাজ্য, যথেচ্ছাচার ও চিন্তাদৈন্য কেন?..."

চিন্তাদৈন্য কোনোভাবেই নয়, চর্চার ক্ষেত্রে অনুবাদকদের অন্তহীন পরিশ্রমই আর সচেতনতার কারণেই সাহিত্যপাঠক এখন বিদেশি ভাষা থেকে এত ভালো সব অনুবাদ পাচ্ছেন বাংলা ভাষায়। আর কবিতার ক্ষেত্রে অনুবাদকরা কবিতার বিষয়বস্তুর মতোই গঠনকাঠামোকেও যথাসম্ভব যথাযথভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। কারণ সেখানে যদি গঠনকাঠামোই সংরক্ষিত না হয় তবে তা কবিতাও থাকে না। একজন প্রখ্যাত সমালোচক সুসান ব্যসান্ট ম্যাকগুয়েরি বলেছেন, উৎসভাষার পাঠ থেকে যে মাত্রায় গঠনকাঠামো ছন্দ, স্বর, তথ্য তালিকা ইত্যাদিকে অনুবাদক পুনরুৎপাদন করে থাকেন, সেগুলো অবশ্যই যে ভাষায় অনূদিত হতে যাচ্ছে সেই উদ্দিষ্ট ভাষার ধরন-ধারনের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হবে এবং অবশ্যই অনুবাদের চর্চার ক্ষেত্রে কাঠামোর ওপরে নির্ভরশীল হতে হবে।

কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে আরেকটা আবশ্যিক বিষয় হল, অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল পাঠের ভাবগত খাঁটিত্ব বজায় রাখাটা ভীষণ জরুরি। কবিতার একটি ভালো অনুবাদ কবিতার 'নৈতিক সক্রিয়তাকে' আবিষ্কার করে, যদি আবশ্যিকভাবে এটার যান্ত্রিকতাকে দরকার না হয়। এছাড়াও, নিওমার্ক যেমন বলেছেন, "কবিতার অনুবাদ আসলে এসিড টেস্ট, যেটা অনুবাদের স্পর্ধিত স্বভাবকে প্রকাশ করে।" কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রে শ্লেষালঙ্কার, ইঙ্গিত, উপমা, অনুপ্রাস, বাক্যের অবয়ব এবং রূপকালঙ্কার সবসময়ে সাধারণ থাকে।

বেশিরভাগ অনুবাদক এটা বিশ্বাস করেন যে, কাব্যিক গদ্য অনুবাদে মূলপাঠের আঙ্গিক-লেখার ভঙ্গিমার বেশ খানিকটা ঘাটতি পড়ে। একটি কবিতাকে তার সমমানের চরণে তরজমা করার জন্য একাকী ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের সবসময়ে এটা মনে রাখা উচিত যে, মূল পাঠের কবিতার প্রতি আমাদের সবসময়ে একনিষ্ঠ থাকতে হবে।

ছন্দনির্ভর মিত্রাক্ষর কবিতার ক্ষেত্রে আবেরি বলেছেন যে, ছন্দময় অনুবাদ আসলে একটি হাতিকে একটা সরু দড়ির উপরে হাঁটানোর মতোই দড়াবাজির নৈপুণ্য। একথা থেকে এটা পর্যাপ্ত ভাবেই বোঝানো যায় যে, এ রকম কোনো ভিন্নভাষার ছন্দময় কবিতাকে অনুবাদ করতে গিয়ে কী পরিমাণ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন অনুবাদক। রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম অনুবাদ করেছেন

কাজী নজরুল ইসলাম। সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। কান্তিদেবও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অতটা মন-হরণীয়া নয়। সাহিত্যের অনুবাদ জটিল তো বটেই কিন্তু এক্ষেত্রে কবিতার অনুবাদ করতে গেলে দেখা যায় যে অনেক বেশি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় অনুবাদককে। আর খুব কম ক্ষেত্রেই আংশিক শব্দার্থগত এবং স্টাইলের ঘাটতি করে তা করা সম্ভব। আবার পুরোপুরি অসম্ভবও নয়। বাংলা সাহিত্যেই রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ামের মতো অনেক প্রমাণ আছে যে দক্ষ অনুবাদকেরা কাব্যসংবেদনাসহ এই প্রয়োজনীয় সাহিত্যের বিভাগটিকে অনুবাদ করতেও পারেন এবং মূল পাঠের বিষয়গুলোও চমৎকারভাবে অবিকৃতও রাখতে পারেন।

নাটকের অনুবাদের ক্ষেত্রেও কথাগুলো সমভাবে প্রযোজ্য। তবে নাটকের অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল নাটকের মতোই সময়, স্থান, ইতিহাস এবং ভাষাগত পারম্পর্য বজায় রাখতে হয়। একজন নাটকের অনুবাদক যখন নাটক অনুবাদ করেন তখন তাঁকে এটা মাথায় রাখতে হয় যে তাঁর অনূদিত লেখাটি স্টেজে উচ্চস্বরে উচ্চারিত হবে। কোনো বিষয় পড়ে অনুধাবন করা এক বিষয়, আর সেটাকে বলা ও শোনা এবং সেই বলা-শোনার মধ্য দিয়ে অন্য একটি দেশ-কাল ও পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করানো সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। একটি লিখিত গদ্য বা পদ্য খুব ভালো অনূদিত হতে পারে, কিন্তু সেই পাঠটিই স্টেজে উচ্চারিত হলে অদ্ভুতও শোনাতে পারে।

স্টেজে পারফর্ম করার জন্য নাটকটিকে অনুবাদ করে দিলেই অনুবাদকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। নাটকের রিহার্সালের সময়ে পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে বসে অনূদিত নাটকের সংশোধন করাটাই নাটকের অনুবাদকের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে দর্শক ও নাটকের প্রেক্ষিত অবশ্যই বিশেষভাবে বিবেচ্য থাকা উচিত।

গদ্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে, তা সে উপন্যাস, ছোটগল্প বা প্রবন্ধ-নিবন্ধ যা-ই হোক বিশেষভাবে জটিল হয়ে ওঠে লেখকের লিখন-স্টাইলের কারণে। পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজার জীবিত ভাষা রয়েছে। প্রধান প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে এসব ভাষার বিভিন্ন রকম প্রভাব রয়েছে। রয়েছে এখন যেগুলো মৃতভাষা সেগুলোর প্রভাবও। কাজেই একজন অনুবাদক যখন মূল ভাষা থেকে একটি গদ্য নিয়ে অনুবাদ শুরু করেন তখন তিনি আসলে জটিলতাকেই আহ্বান করেন। কবিতা বা নাটকে যে বিষয়গুলো নিজের বিস্তৃতির সুযোগ পায় না, গদ্যে এসে সেগুলো যেন ডানা মেলে। প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব বহু কৌণিকতা রয়েছে, রয়েছে প্রকাশভঙ্গির জটিলতা, নিজস্ব প্রবাদ-প্রবচন, অভিব্যক্তি, যৌগিক শব্দ, বক্রোক্তি-ব্যাজস্তুতি, অনুকারাত্মক শব্দের বহিঃপ্রকাশ, এসব কিছুই প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব সম্পদ এবং ঐশ্বর্য, কিন্তু এসব ঐশ্বর্যই যখন অনুবাদকের হাতে পড়ে তখন তার জন্য বাধার প্রাঁচীর হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক সময়ে এসব কারণে ভুল অনুবাদও হয়ে যায়, যেমন ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "Hear something through the grapevine এর শাব্দিক অর্থে আসলে কোনো অর্থই দাঁড়ায় না, যদি আমরা বলি, আঙুরলতার কাছ থেকে কিছু শোনা। কিন্তু আসলে এর অর্থ হচ্ছে 'গুজব শোনা'।"এ রকম হাজারো প্রবাদ-প্রবচন বা নিজস্ব বাচিক কৌশল সবভাষারই সম্পদ। যা আসলে

অনুবাদকের জন্য পর্বতপ্রমাণ অস্বস্তি ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আরো সব জটিলতার মুখোমুখি অনুবাদক হন তখন, যখন সাংস্কৃতিক চর্চা বা সংস্কৃতির অনুবাদ করতে হয় । সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনুবাদে অনেক গোঁজামিল ঢুকে যাবার সম্ভাবনা । যা প্রায়ই লক্ষ করা যায় । যখন ভিন্ন ভাষার লোকদের সঙ্গে আমরা কথা বলি বা মেলামেশা করি তখন বডি ল্যাঙ্গুয়েজও একটা ভাষা হিসেবে কাজ করে যেটা থেকে আমরা অনেকটাই সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে পারি, কিন্তু যখন পাঠের মধ্যে দিয়ে অন্য সংস্কৃতিকে জানতে যাই তখন আমাদের সামনে ছবির মতো বিষয়গুলো উপস্থাপিত হতে হবে, নয়তো অনুবাদ খাপছাড়া মনে হবে ।

আরো সব ঝামেলা রয়েছে অনুবাদের ক্ষেত্রে, যেমন বিষয়গত জ্ঞান, একটা উপন্যাসে হয়তো কর্পোরেট জগতের কথা আছে, অথবা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যদি অনুবাদক ওই বিশেষ বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে অনুবাদ শুরু করেন তো সে অনুবাদ মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য ।

এতসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বাংলাভাষার অনুবাদকর্মীরা নিয়মিত তাঁদের আবেগের জায়গা থেকে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের অনুবাদকর্ম । নতুন নতুন আরো অনেকেই যোগ দিচ্ছেন বুকভরা আশা নিয়ে । সেক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ যদি অনুবাদ নিয়ে বিশেষ পদক্ষেপ নেন, তাহলে বাংলা ভাষা যে সমৃদ্ধ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই । এতেও সন্দেহ নেই যে, বাংলাভাষার সব গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলো ভিন্নভাষায় অনূদিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের মণিকণ্ঠে নতুন নতুন উজ্জ্বল রত্ন যোগ করবে ।

[লেখক : কবি, অনুবাদ শিল্পী । একটি পুস্তক প্রকাশনীতে কর্মরত ।]

সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল এক মহাদিগন্তের নাম ভাষান্তর

জান্নাতুন নিসা

মানব-মনের অন্ধ কুঠুরির দুয়ার খুলে, আজন্ম স্বাপ্নিক মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে– ইশারাকে পেছনে ফেলে বেছে নিয়েছে ভাষাকে। সাধারণভাবে, ভাষা বুননে মনের ভাব প্রকাশ করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, শৈল্পিক মাত্রায় অনন্য পরিস্ফূটনে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে; করেছে সাহিত্য রচনা। আর মানবমনের–মানবিক, জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা, অনুভূতি ও সৌন্দর্যের শিল্পিত রূপের আবাস করেছে সাহিত্যে। কিংবা বলা যায়– লেখক মনের বাস্তব জীবনের অথবা কল্পলোকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির নন্দিত উপস্থাপনই আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে সাহিত্য। আজন্মাতিয়াসী মানুষ সবসময় নিজ গণ্ডির বাইরের অস্তিত্বের পরশ পেতে চেয়েছে। তাই তো সাহিত্যে সে কখনও তুলে এনেছে কল্পকাহিনি, আবার কখনও ফুটিয়ে তুলেছে জীবনের বাস্তবতা। আর তাই সাহিত্যে আমরা–গদ্য (যার মধ্যে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত), পদ্য (যার মধ্যে ছড়া, কবিতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত) পেয়েছি; যা নিঃসন্দেহে সাধারণ যেকোনো লেখনী বা অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র আহ্বানই আমাদের টেনে নিয়ে যায় সাহিত্যের স্বাদ-আস্বাদনে; যা নির্দিষ্ট কোনো ভাষায় কখনও সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। যুগ যুগ ধরেই মানুষ তার নিজ ভাষার বাইরের সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য জানতে ব্যাকুল হয়েছে। আর সেই ব্যাকুলতার হাতছানিতে নির্ভরতার যোগান দিয়েছে ভাষান্তর বা অনুবাদ। সাহিত্যের অনন্য শিল্পরুচিসম্মত একটি শাখার নাম– ভাষান্তর বা অনুবাদ। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষার এই-যে রূপবদল, ভাববদল অথবা অনুভূতিবদল– এটিই ভাষান্তর। এটি একটি নান্দনিক শিল্প। ঠিক কবিতা বা গদ্যের মতোই। একটি কবিতা কিংবা সুন্দর গদ্যশৈলীর পেছনে যেমন আলোর ফোয়ারায় লুকিয়ে থাকে, নির্জন প্রহরের শত নীরব সাধনা, তেমনি সফল ভাষান্তরেও লুকিয়ে থাকে সাধনার অমিয়সুধা। এই সুধাপানে ভাষান্তর বা অনুবাদচর্চা যতটা গভীর হবে, বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার ততটাই সমৃদ্ধ হবে; সেইসাথে সাহিত্যাকাশে অনুবাদ বা ভাষান্তর হয়ে উঠবে এক মহাদিগন্ত। যে দিগন্তের বুকে ভাস্বর হয়ে থাকবে পৃথিবীর যত ভাষার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য।

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, ভাষাই সংস্কৃতি। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সংস্কৃতির মূল উপাদান ভাষা। নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যকে–অন্য দেশকে–অন্য দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে জানতে মানুষ দীর্ঘকাল থেকেই পাড়ি জমিয়েছে দেশ-দেশান্তরে আর প্রয়োজনবোধে রপ্ত করেছে

ভিনদেশি বা বিদেশি ভাষা; করেছে অনুবাদ বা ভাষান্তর। খুব সহজে বলতে গেলে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের নামই অনুবাদ। একজন অনুবাদক বা ভাষান্তরকারী তাঁর মেধা, শ্রম, সৃজনশীলতা, সর্বোপরি সচেতনতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে মূল লেখকের স্বরভঙ্গিটিকে যতটা সম্ভব অক্ষুণ্ন রেখে ভাষান্তর করেন। অনুবাদে ভাষার দু'টি দিক আমরা পেয়ে থাকি– একটি Source Language (SL) উৎস বা মূল ভাষা অন্যটি Target Language (TL) লক্ষ্য ভাষা। ফলে অনুবাদককে সর্বদাই উৎস ভাষা (SL) থেকে লক্ষ্য ভাষায় (TL) স্থানান্তর করার সময় দুই ভাষারই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা অনুধাবন করেই অনুবাদ করতে হয়। সেক্ষেত্রে মূলের প্রতি সর্বোচ্চ বিশ্বস্ত থেকে এবং সেই সঙ্গে উদ্দিষ্ট ভাষার চরিত্র, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র অবস্থান রক্ষায় সচেতন ও সচেষ্ট থাকতে হয়। পৃথিবীবিখ্যাত কবি-লেখক-সাহিত্যিক-দার্শনিক-কূটনীতিকসহ অনুবাদকদের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন সময় অনুবাদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য পেয়েছি। অনুবাদকে নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত কিংবা নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখায় আবদ্ধ করা না গেলেও, এর স্বরূপটি তাদের লেখনীতে কিংবা কথায় তাঁরা ভিন্নমাত্রায় অনন্য করে তুলে ধরেছেন। আমরা–প্রাচীন রোমের বিখ্যাত বাগ্মী, কূটনীতিক, রাজনৈতিক তত্ত্ববিশারদ, আইনজ্ঞ এবং দার্শনিক; অনেকের মতে ল্যাটিন ভাষার শ্রেষ্ঠ বাগ্মী এবং প্রবন্ধ রচয়িতা Marcus Tullius Cicero মার্কাস টুলিয়াস সিসারো (৩ জানুয়ারি ১০৬ খ্রিস্টপূর্ব–৭ ডিসেম্বর ৪৩ খ্রিস্টপূর্ব) এবং বিশ্ববিখ্যাত আর্স পোয়েটিকা যার আভিধানিক অর্থ কাব্যের শিল্পকলা (চিঠির আকারে ছন্দে লেখা একটি ক্ষুদ্র বই)-এর রচয়িতা, ল্যাটিন সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিপ্রতিভা ও ল্যাটিন সমালোচনা সাহিত্যের 'আঁধার ঘরের মানিক' হিসেবে সমাদৃত প্রাচীন রোমান কবি Quintus Horatius Flaccus কুইন্টাস হোরেস ফ্ল্যাককাস (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬৫ অব্দ–৮ অব্দ)-এর কাছ থেকে প্রথমবারের মতো অনুবাদ তত্ত্বের আলোচনা পাই। ভাষার বিস্তারে কিংবা সাহিত্যে, অনুবাদের যোগসূত্র দিনের পর দিন নতুনত্ব খুঁজে পাচ্ছে। কারণ মানবসভ্যতার সুউচ্চ স্তরের পাশাপাশি চেতনার সমস্ত উপকরণকেও সোনালি পরশে ছুঁয়ে যাচ্ছে অনুবাদ। প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ আজ ভাষার অখণ্ড বৈভবে রূপান্তরিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হোরেস বলেন, "As the wood change their foliage with the decline of each year and the earliest leaves fall, so words die out with old age and the newly born ones thrive and proper just like human beings in the vigour of youth"। অর্থাৎ বিষয় পুরনো হলেও তা নতুন এবং স্রষ্টার আপন সম্পদ হয়ে উঠতে পারে যদি অনুবাদক সেই বিষয়টির মাত্রাজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থাকেন। বিংশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক Jacques Derrida জ্যাক দেরিদা (১৫ জুলাই ১৯৩০)–৯ অক্টোবর ২০০৪), জার্মান সাংস্কৃতিক তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী Walter Benjamin ওয়াল্টার বেনজামিন (১৮৯২-১৯৪০)-এর একটি বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেছিলেন, 'Translation, . . . ensures the survival of a text'। অর্থাৎ, অনুবাদ কোনো গ্রন্থ বা মুদ্রিত পাঠ্যবস্তুর টিকে থাকা নিশ্চিত করে। তিনি আরও বলেন, 'no translation would be possible if in its essence it strove for likeness to the original. For in its afterlife, which could not be called that if it

were not a transformation and a renewal of something living, the original undergoes a change'। অর্থাৎ, মূলের হুবহু এক রকম হলেই তা অনুবাদ হয় না, মূল থেকে সরে আসার আগমুহূর্ত পর্যন্ত অনুবাদ মূলের পরবর্তী জীবন হয়ে দাঁড়ায় না, অনুবাদে মূল লেখা নবজীবন পায়।

রোমান ক্লাসিসিজমের অন্যতম ব্যক্তিত্ব লনজাইনাস (খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতক) আক্ষরিক অনুবাদের অন্ধ অনুকরণ না করার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। কারণ একটি বইয়ের কেবল এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়া মানেই দু'টি ভাষার অনুবাদের কাজটি সম্পাদিত হয়ে যাওয়া নয়, বরং তা দু'টি সভ্যতার, সংস্কৃতির, জীবনরীতিরও এক সার্থক বিনিময় মাধ্যম। এতে উভয় ভাষার ওপর ছাপও পড়ে পরস্পরের। এক্ষেত্রে উভয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিই লাভবান হয়। প্রথমে এ ব্যাপারে সহজেই স্বার্থকতা তৈরি হয় না, বাধা কিংবা নিষেধাজ্ঞা আসে। অপরিচিত নতুন শব্দের প্রয়োগ মানেই সব দেশে সব কালে বাধার মুখোমুখি হতে হয় একজন অনুবাদককে। কিন্তু এই মুখোমুখি অবস্থানই পরবর্তীকালে তাঁকে সমৃদ্ধ করে। জার্মান সাহিত্যিক Johann Wolfgang von Goethe ইয়োহান ভল্‌ফগাং ফন গ্যোটে (২৮ আগস্ট ১৭৪৯–২২ মার্চ ১৮৩২) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'In translation one must proceed to the very limits of the translatable only them one becomes aware of the foreign nation and the foreign tongue'। গ্যোটের বক্তব্যের সাথে অনেকটা সুর মিলিয়ে জার্মান কবি, সমালোচক ও পণ্ডিত arl Wilhelm Friedrich von Schlegel কার্ল উইলহেম ফ্রিড্‌রিশ ফন শ্লেগেল (১০ মার্চ ১৭৭২–১২ জানুয়ারি ১৮২৯) বলেন, 'কোনো ভাষা বা সাহিত্যের অনুবাদ শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, তা চেতনারও এক বিন্যাস'। আর্জেন্টিনার প্রথিতযশা সাহিত্যিক Jorge Luis Borges হোর্হে লুইস বোর্হেস (২৪ আগস্ট ১৮৯৯–১৪ জুন ১৯৮৬) বলেন, 'Literal translations are not literary'। অর্থাৎ, আক্ষরিক অনুবাদ বলতে কিছু নেই। সহজে আমরা বলতে পারি, অনুবাদক যদি মূলের উপমা, ঘটনার প্রেক্ষাপট, বাক্যবোধ সম্পর্কে সঠিক পাঠোদ্ধার করতে পারে তবেই যথার্থ সাহিত্যিক অনুবাদের সৃষ্টি হয়।

অনুবাদ পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যেরই অপরিহার্য একটি অংশ। যেকোনো সাহিত্য বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে অনুবাদ অপরিহার্য। অনূদিত সাহিত্যের মাধ্যমে সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে অনুবাদমূলক সাহিত্যকর্মের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, যা অনস্বীকার্য। পাশ্চাত্য-আরবি-ফারসি এমনকি বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। ধারণা করা হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ–বাইবেল এবং হোমার রচনাবলি। হিব্রু গ্রন্থ অবলম্বনে গ্রিক ভাষায় লিখিত গ্রন্থটির ইংরেজি অনূদিত রূপ বাইবেল। প্রাচীন গ্রিক ভাষায় রচিত মহাকবি হোমারের (খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী) মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডিসি আমাদের কাছে হয়ে থাকত অলৌকিক শব্দমালা, যদি তা ইংরেজিতে অনূদিত না হত। এ দু'টি মহাকাব্য বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। মহাভারত, রামায়ণ-এর মতো দুই মহাকাব্য যদি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত না

হতো, তবে আমাদের চোখের ভাষাই আজ হয়ে উঠত নির্লিপ্ত। মওলানা রুমী (৩০ সেপ্টেম্বর ১২০৭–১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩), কাহ্‌লিল জিবরান (৬ জানুয়ারি ১৮৮৩–১০ এপ্রিল ১৯৩১), ওমর খৈয়াম (১৮ মে ১০৪৮–৪ ডিসেম্বর ১১৩১), ইকবাল (৯ নভেম্বর ১৮৭৭–২১ এপ্রিল ১৯৩৮), বোদলেয়ার (৯ এপ্রিল ১৮২১–৩১ আগস্ট ১৮৬৭), হোল্ডারলিন (২০ মার্চ ১৭৭০–৭ জুন ১৮৪৩) আমাদের কাছে অনন্য মাত্রায় এসে দাঁড়িয়েছেন কেবল অনুবাদের মাধ্যমেই। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১–৭ আগস্ট ১৯৪১) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর Song offerings-এর জন্য, যে গীতিকাব্য সংকলনকে আমরা সবাই গীতাঞ্জলি নামে জানি। তিনি যদি অবসরের সঙ্গী করতে তাঁর কিছু কবিতা অনুবাদ না করতেন তবে হয়তো আজ গীতাঞ্জলি কেবল আমাদের সম্পত্তিতে পরিণত হত; যা এখন বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সমৃদ্ধ যত ভাষা থেকে বিচিত্র শত ভাব ও তথ্য সঞ্চয় করে নিজ নিজ ভাষার বহন ও সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলাই অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক রূপ। অনুবাদ পারস্পরিক যোগাযোগের অনেক বড় একটি মাধ্যম। যে মাধ্যমে শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধি বেড়ে যায় বহুগুণ, সেইসাথে বর্ণনার উদারতায় বাক্যগঠনের রীতিতেও গ্রহণ-বর্জন চলে জেনে-বুঝেই। অনুবাদ সাহিত্যে একজন লেখকের লেখা চলাচল করে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়, সগৌরবে; কখনও ধীরগতিতে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে আবার কখনও প্রবল তেজে। আমাদের দেশেও অর্থাৎ মধ্যযুগের (১২০০-১৮০০) বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত আঙিনা জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা ছিল। লেখকের মনন আর সৃজনশীলতায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রাচীনআর্য, মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সুলতানি আমল ও অন্য রাজাদের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের প্রচলন হয়। অনুবাদ সাহিত্যের অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করে মানবমনের কূপমণ্ডূকতা থেকে বাঁচতে সেসময় একের পর এক অনুবাদ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান কবি কৃত্তিবাস ওঝা (আনুমানিক ১৩৮১ খ্রিস্টাব্দ–১৪৬১ খ্রিস্টাব্দ); তাঁর অনূদিত প্রথম গ্রন্থটির নাম– শ্রীরাম পাঁচালী। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য বা ধর্মীয় গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অনূদিত হয়েছে। অনেকের মতে, রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়ড এবং ওডিসি মহাকাব্যের মিল রয়েছে। শুধু তাই নয়, রোম নিবাসী গ্রিক কবি দিয়ন ক্রিসোস্তোম (খ্রিস্টোত্তর প্রথম শতক) এমন একটি হিন্দু কাব্যের অস্তিত্ব জানতেন যা হোমার থেকেই অনূদিত কিংবা অপহৃত বলে মনে করা হয়। এটি কোন কাব্য তা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হলেও কাহিনির বিন্যাস ও উপকরণ থেকে তা রামায়ণ বলেই অনুমান করেন অনেকে। অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মিল ঘটেছিল সাহিত্যের মাধ্যমে তা অনস্বীকার্য। একসময় এই অনুবাদ সাহিত্য লেখকের নামেই পূর্ণ হয়ে ওঠে– কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত বা মালাধর বসুর ভাগবতানুবাদ। এরপর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি চন্দ্রাবতীও (ষোড়শ শতাব্দী) রামায়ণ অনুবাদ করেন, শাহ মুহাম্মদ সগীর (আনুমানিক ১৩-১৪ শতক), জৈনুদ্দিন (১৫শ শতক), চাঁদ কাজি, শেখ কবির সহ আরও অনেকেই মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন তাঁদের অনুবাদ

সাহিত্যের মধ্যদিয়ে। কারণ অনুবাদ সাহিত্য ছাড়া আপন গণ্ডির বাইরের নতুন জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র ঘটবে না, বিষয়টি তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইরানের কবি ফেরদৌসির (৯৪০–১০২০ সিই) শাহনামা অনুবাদ করেন মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), রোমান্সধর্মী প্রণয় উপাখ্যান ইউসুফ জোলেখা'র অনুবাদ করেন শাহ্ মুহম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম (১৬২০–১৬৯০), গরীবউল্লাহ। গরীবউল্লাহ জঙ্গনামাও অনুবাদ করেন। লায়লা মজনু অনুবাদ করেন দৌলত উজির বাহরাম খান (আনুমানিক ১৬শ শতক)। হাতেম তাই অনুবাদ করেন সাদতুল্লাহ, সৈয়দ হামজা। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি আলাউল (১৫৯৭–১৬৭৩) একের পর এক অনুবাদ করেন– সপ্ত পায়কর, সিকান্দারনামা, তোহফাসহ আরও অনেকগ্রন্থ। শুধু তাই নয়, হিন্দি কবি মালিক জায়সির (১৪৭৭–১৫৪২) রচিত পদুমাবত থেকেও তিনি লিখেছেন পদ্মাবতী। আর এই সময়ই ময়মনসিংহ গীতিকা ২৩টি ভাষায় অনূদিত হয়। সেসময় যাঁরা অনুবাদ সাহিত্যে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, মহৎ সাহিত্য নির্দিষ্ট দেশ-কালকে ধারণ করেই বীরদর্পে দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে। আর মহৎ যত সাহিত্য হয়ে ওঠে সব দেশের সবকালের মানুষের কাছে কেবল আদরণীয় নয়, বরং পরম পূজনীয়। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩ জুন ১৯১৫–২১ মার্চ ২০০৩) তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেন, 'বাঙালী সমাজের পুনর্গঠনের জন্য এবং বাঙালি ঐতিহ্যের সর্বভারতীয় প্রাণধারার সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ শ্রয়ী প্রভাবেরও প্রয়োজন ছিল'।

এতক্ষণে খুব সহজেই আমরা অনুধাবন করতে পারছি যে, বিশ্বসাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্যের রয়েছে অসামান্য প্রভাব। আর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে রোমানরা বরাবরই বিভিন্ন দিক থেকে প্রথম ধাপের কাজগুলো আগ্রহভরে সম্পন্ন করেছে। অনুবাদেও তারা এগিয়ে প্রথমেই ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর পরবর্তী সময় থেকে ইউরোপে বেশ সচেতনভাবেই অনুবাদের কাজ শুরু হয়। গ্যোটে, ফরাসি তাত্ত্বিক এতিয়েন দোলে (১৫০৯–১৫৪৬) বা হোমার অনুবাদক জর্জ চ্যাপমান (১৫৫৯–১৬৩৪) বা পেত্রাকের (২০ জুলাই ১৩০৪–১৯ জুলাই ১৩৭৪) অনুবাদের দিকে তাকালে দেখা যায়– এ সময় তাঁরা মূল বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ও আক্ষরিক অনুবাদ না করে কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদে। অষ্টাদশ শতকে লাতিন আমেরিকায় অনুবাদ অনেক বেশি না হলেও উনিশ শতক জুড়েই অনুবাদ সাহিত্য বদলে দিয়েছে সাহিত্যের পরিচিত গণ্ডি, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার ম্যাজিক রিয়্যালিজম অনন্যমাত্রা এনে দেয়। উনিশ থেকে বিংশ শতাব্দীর সময়কালজুড়ে– বোর্হেস, কোরতাযার, মারিও ভারগাস ইয়োসা (২৮ মার্চ ১৯৩৬-), গারসিয়া মারকেজ (৬ মার্চ ১৯২৭–১৭ এপ্রিল ২০১৪), ফুয়েন্তেজের লেখার অনুবাদ সাহিত্যকে ছাপিয়ে সমস্ত লাতিন আমেরিকার ভৌগোলিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং স্বতন্ত্র অবস্থান পৃথিবীর বুকে ফুটিয়ে তুলে। মধ্যযুগে ভারত ও বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য যথেষ্ট পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠে। সেসময় বিশ্বসাহিত্য বিশেষ করে আরবি, ফারসি ও ভারতীয় সাহিত্যের সুপ্ত-হৃদ্যিক মেলবন্ধন ঘটে। অনুবাদের সেই ফল্গুধারা আজ পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত। সেই সমাদৃত শত বাঁধনে নিজেদের

তুলে ধরতে মানুষ সহজ থেকে সহজতম মাধ্যম ব্যবহার করছে। আর তাই বুঝি সময়ের বহমানতায় ভাষাও আজ সহজশর্তে পরিবর্তিরূপে নান্দনিক হয়ে উঠেছে। ভাষার আধুনিকীকরণ আমাদের জন্য বেশ সমৃদ্ধ অনুবাদ এনে দিয়েছে। ইংরেজি ভাষার আধুনিকীকরণই আমাদের শেক্সপিয়র (২৬ এপ্রিল ১৫৬৪–২৩ এপ্রিল ১৬১৬) বা জন ডানের (২২ জানুয়ারি ১৫৭২–৩১ মার্চ ১৬৩১) ষোড়শ শতাব্দীর সেই ইংরেজি অনুধাবনে এবং তা অনুবাদে সহায়তা করেছে। আমরা কালিদাস (৪শ–৫শ শতক), মীর মশাররফ হোসেন (১৩ নভেম্বর ১৮৪৭–১৯ ডিসেম্বর ১৯১১), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪–২৯ জুন ১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র (২৭ জুন ১৮৩৮–৮ এপ্রিল ১৮৯৪), শূদ্রক প্রমুখ সাহিত্যিকের রচিত সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে পারছি ভাষার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে। সংস্কৃত ভাষার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলমে বাংলা সাধু ও কথ্যভাষা আধুনিকতার পরশ পায়। পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষা আধুনিকতর হয় সমকালীন লেখক ও কবিদের কলমের আঁচড়ে।

বিকৃতি উপেক্ষা করে ভাষার সুষমা ও উন্নতি প্রত্যাশা করাই ভাষার আধুনিকতা। কারণ ভাষা স্রোতের মতো; স্রোতাভিমুখী ভাষা নিরন্তর পরিবর্তনশীল। মূল ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে ভিন্ন ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষারও ভূমিকা রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষার শব্দ, বাক্যবিন্যাস ও ঝঙ্কার মূল ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ করে। তেমনি ভাষান্তর করতে গেলে উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা সাহিত্যের সান্নিধ্যে আসে আর তাতে করে বিভিন্ন বিষয়ের শব্দের প্রতিশব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়, অন্য ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দও গ্রহণ করা যায়। অন্য ভাষার শব্দ সম্পদের পরিমাণ, প্রকাশক্ষমতা ও বাগভঙ্গি অনুযায়ী সে ভাষায় ব্যক্ত কথার সংকোচন, প্রসারণ, বর্জন ও সংযোজন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে–প্রয়োগে। চৌদ্দ-পনেরো শতকে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পুরাণের প্রভাব পড়েছে। বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গিতে পুরাণের ভাব-ভাষা-ছন্দ গৃহীত হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-প্রণয়োপাখ্যান-ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি সংস্কৃত-ফারসি-আরবি-হিন্দি থেকে অনূদিত হয়েছে আমাদের ভাষায়। সেসময় এভাবেই আমাদের বাংলা ভাষাসাহিত্যের বুনিয়াদ নির্মিত হয়। ভাষান্তর করতে হলে একজন আদর্শ অনুবাদকের উভয় (মূল এবং লক্ষ্য) ভাষার গতিপ্রকৃতি, বাকভঙ্গি ও বাকবিধির বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অনুবাদের মাধ্যমে যে দু'টি ভাষার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা হবে–সেই ভাষা দু'টির বাক্যগঠন ও প্রকৃতি, বিশেষ কোনো অবস্থায় শব্দপ্রয়োগরীতি ইত্যাদি থেকে শুরু করে, ভাষা ব্যবহারের সার্বিক রীতি-নীতি ও সেই দুই সংস্কৃতি-সভ্যতা-ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে অনুবাদের কাজে হাত দেয়া খুব একটা গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্য একটি ভাষা থেকে সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান ও মননের বিভিন্ন বিষয় অনুবাদ করতে হলে সে বিষয়ক ভাব, চিন্তা কিংবা বস্তুর প্রতিশব্দ তৈরি করা অনেক সময় সহজ হয়, তৈরি সম্ভব না হলে মূল ভাষা থেকে শব্দ গ্রহন করতে হয়। তাহলেই ভাষান্তর নিখুঁত ও শিল্পগুণসম্পন্ন হয়। অবশ্য গণিত বা বিজ্ঞান বিষয়ের ভাষান্তর ভিন্ন। বিজ্ঞান বিষয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধ অনুবাদ অবশ্য কাম্য। কিন্তু সাহিত্যের অনুবাদ শিল্পসম্মত হওয়া আবশ্যক

বলেই তা আক্ষরিক হলে চলে না। তাই ভাষাবিদ কবি-লেখক কিংবা মননে উচ্চমার্গীয় না হলে মননশীল সুষ্ঠু অনুবাদ যেমন সম্পন্ন হয় না তেমনি ভাষান্তরের প্রকৃতিও মলিন হয়ে পড়ে।

নতুন প্রজন্ম অনুবাদ-সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে অন্য যেকোনো ভাষায় লেখা বই পড়ে তাদের আচার-আচরণ-সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। বলা চলে, কালের বিবর্তনে অনুবাদ-সাহিত্যের চাহিদা এখন তুঙ্গে। তাই বিশ্বায়নের সাথে পাল্লা দিতে আমাদের অনুবাদ করতেই হবে। সব ভাষাতেই নতুন শব্দ যোগ হচ্ছে, পুরনো অনেক শব্দ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি মাথায় রেখেই ভাবতে হবে, বিশ্বসাহিত্যকে জানতে– অনুবাদের বিকল্প আর কিছুই নেই। সেক্ষেত্রে যদি আমরা মনে করি অনুবাদ খুব কঠিন কিছু নয়, কিংবা অনুবাদসংশ্লিষ্ট ভাষা দু'টি সম্পর্কে মোটামুটি একটু ধারণা থাকলেই হয়তো অনুবাদ করা সম্ভব হবে; আর অভিধান আছে বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানে। তাহলে বিশ্বসাহিত্যের রসাস্বাদনের যে আশায় ভাষান্তর তা থেকে যাবে অপূরণীয়। ভাষান্তরের গতিপথে যদি কিছু বাক্যের কিংবা শব্দের কিছুটা রদবদল ঘটেও তাতে খুব একটা ক্ষতি নেই, সঠিক অনুবাদের স্বার্থে। কারণ ভাষান্তরের মাধ্যমেই বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যত গ্রন্থ-দার্শনিক চিন্তা-বৈজ্ঞানিক তথ্য-সমাজতত্ত্ব-মানবচিন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সবকিছুই আমাদের নাগালে এসেছে। মধ্যযুগে ভারত ও বাংলায় অনুবাদের যথেষ্ট প্রসার ঘটলেও রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ-চর্চায় বেশি সময় নষ্ট করেননি, তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন অনুবাদ করলে মূল সাহিত্যের গুণ বজায় থাকে না। সেই কারণেই তাঁর দীর্ঘ জীবনের সাহিত্যচর্চায় অনুবাদের তুলনায় ভাষাশিক্ষার ওপর অধিক জোর দেন। নিবেদিতা তাঁর লেখা 'গোরা'র অনুবাদ করে কিন্তু তাঁর পছন্দ হয় না, অথচ নিবেদিতার অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁর লেখা প্রথমবারের মতো বাইরে প্রকাশিত হয়। যাইহোক, অনেক ওজর-আপত্তি সত্ত্বেও অনুবাদে মানুষ বরাবরই আগ্রহী হয়েছে বলেই আমরা পৃথিবীর সমৃদ্ধ সাহিত্যগুলো পড়তে কিংবা জানতে পারছি। পৃথিবীর সুবিশাল ভাষার পেয়ালায় বুঁদ হয়ে প্রধান কিছু ভাষাই যেখানে কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে আয়ত্ত করা রীতিমতো অসম্ভব। সেখানে পৃথিবীর তাবৎ ভাষাতে প্রতিনিয়ত গড়ে ওঠা সুমহান আর অমূল্য সাহিত্যসম্পদের স্বাদ নেয়া অনুবাদের চুমুক ব্যতীত আদৌ কি সম্ভব! এই ভাবনাতেই বিশ্বসাহিত্যে তো বটেই, আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও অনুবাদের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

এই যে ভাষান্তর, তার জন্য বিদেশি ভাষা জানা বড় বেশি প্রয়োজন। যদিও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় মূলত ইংরেজির মাধ্যমে। তবুও একথা বলতে দ্বিধা নেই, বিদেশি ভাষা মানেই কেবল ইংরেজি নয়। ঔপনিবেশিক আমলে যতদিন ইংরেজির দাপট বহাল ছিল ততদিন, আমাদের অতি ক্ষুদ্রায়তন শিক্ষিত শ্রেণির যে ক্ষুদ্রতর অংশ বিদেশি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, তারা তা করতেন প্রধানত ইংরেজির মাধ্যমেই। সেই চর্চাধারা অব্যাহত রেখে আমরা, ব্রিটিশদের আধিপত্যকেই বুকে লালন করে কেবল আগাগোড়া ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদে সচেষ্ট হচ্ছি, অথচ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪ মে ১৮৪৯–৪ মার্চ ১৯২৫) ফরাসি সাহিত্যের উত্তম রস-বোধ বাংলায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। উপনিবেশিক

শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একদিকে প্রতিরোধ অন্যদিকে আত্ম-সত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছিল সেসময়। বিংশ শতকেও তিনি এই কর্মে নিয়োজিত ছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি একাজে ক্ষান্ত দেননি। তিনি পিয়ের লোতি'র (১৪ জানুয়ারি ১৮৫০–১০ জুন ১৯২৩) 'ল্যাঁদ সাঁজাংলে'র অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ শুধু ভাষাজ্ঞানে বা ভাষান্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল তাঁর আপন মানসিকতার রঙেও সজ্জিত। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলী (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৪–১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) বলেছেন– 'ত্রিবাঙ্কুরে লোতি ভারতীয় সঙ্গীত শুনে বিস্ময়ের উচ্ছ্বাসে সে সংগীতের বর্ণনাতে কত-না স্বর কত-না ধ্বনি মিশিয়ে দিয়েছেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা সেসব ধ্বনি অবিকল বাজিয়ে চলেছে...। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনী লোতির বিহ্বল ভয়ার্ত হৃদয়ের প্রতি কম্পন প্রতি স্পন্দন ধরে নিয়ে যেন বীণাযন্ত্রের চিকন কাজের সঙ্গে মৃদঙ্গের নিপুণ বোল মিশিয়ে দিয়েছেন'। সত্যেন্দ্রনাথও (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২–২৫ জুন ১৯২২) সেসময় বাঙালিত্বের সীমায়িত গণ্ডি ভেঙে বিশ্বমানবত্বে উত্তীর্ণ হতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়েছেন সুনিপুণভাবে। তিনি একাধিক ভাষা জানতেন, কালোত্তীর্ণ তাঁর অনুবাদ। সমগ্র বিশ্বের কাব্যরূপকে বাংলায় অনুবাদ করেন তিনি। তীর্থ সলিল, তীর্থরেণু, মণিমঞ্জুষা প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ শুধু অনুবাদ কবিতারই সংকলন। অনুবাদকে হাতিয়ার করেই তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্যের পারস্পরিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝে আপন সত্তার প্রকাশ করেন। অনুবাদকে অনেকে সেসময় মৌলিক স্বীকৃতি দেননি। এখনও যে তা মৌলিক সাহিত্যরূপে অন্তত আমাদের দেশে প্রয়োজন ব্যতিরেকে খুব একটা আদরণীয় নয়, অনুবাদের নড়বড়ে অবস্থান সেদিকটি স্পষ্টতই নিশ্চিত করে। যাই হোক, সেসময়ের আরেক উল্লেখযোগ্য অনুবাদক হেমচন্দ্রের সম্পর্কে সাময়িক পত্রিকায় (১৩১০ বঙ্গাব্দ, ২য় বর্ষ, নবম সংখ্যা) বলা হয়– 'হেমচন্দ্রের রচনায় অধিকাংশ অনুবাদ ও অনুকরণ মাত্র ও তাহাতে মৌলিকতার অভাব একথা বলিয়া আমরা তাঁহার নিন্দে করিতেছি না। মনুষ্য কালের সৃষ্টি, স্রষ্টা নহে। যে যুগে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব তাহা অনুবাদ ও অনুকরণের যুগ ...। বলিতে কি, অনুবাদ ও অনুকরণ না হইলে মৌলিকতার বিকাশ হইতে পারে না। হল্যান্ডের পিনি ও নর্থের পুটার্ক না হইলে বোধহয় আমরা হুকার ও রজার আশ্যামের গদ্য, ফেয়ারি কুইন ম্যাকবেথ ও লীয়ের দেখিতে পাইতাম না। ... অনুবাদকেরা ভাষা গঠিত করিয়া মৌলিকতার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। সে জন্য সাহিত্যজগতে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন'। এসময় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অনুবাদে জোর দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রিটিশদের যে খুব মহতী উদ্দশ্যে বলবৎ ছিল না তা জানা যায় ঊনবিংশ শতকের প্রবাদপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০–২৯ জুলাই ১৮৯১) দেয়া 'কথামালা'র বিজ্ঞাপন থেকে– 'রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ-ছয় শত বছর পূর্বে গ্রিস দেশের ইসপ্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলো নীতিগত গল্পের রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইংরেজি প্রভৃতি নানা ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ইউরোপের সব প্রদেশেই অদ্যাপি আদরপূর্বক পঠিত হইয়া থাকে ...। এই নিমিত্ত, শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য শ্রীযুক্ত উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি ঐ সকল গল্পের

অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে সকল গল্পগুলো তাদদৃশ মনোহর বোধ হইবেক না। এজন্য ৬৮টি মাত্র আপাতত অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল'। কেরি অনুবাদকে ধর্মপ্রচারের প্রধান উপায় বলে মনে করতেন এবং যে কারণে তিনি নিজে বা তাঁর নেতৃত্বে ৪০টি এশীয় ভাষায় আংশিক বা সম্পূর্ণ বাইবেল অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এদেশের শিক্ষিত শ্রেণি অনুবাদকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, তার অন্যতম কারণ রেনেসাঁর পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যকে জানার প্রয়াস। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত থেকে যেমন অনেক আগে অনুবাদ হয়েছে তেমনি অন্যান্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষা থেকেও হয়েছে। তবে ঐতিহাসিক কারণেই অনুবাদের সিংহভাগই হয়েছে ইংরেজি থেকে। উপনিবেশবাদ রীতিমতো জাপটে ধরেছিল আমাদের। অবশ্য সেসময় ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান থেকে বেশি অনুবাদ হয়েছে।

ভাষান্তরে ফরেনাইজেশন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয়– অনুবাদে মূলের আবহ-সংস্কৃতি-স্থান-কাল-মানুষজন সবই মূলানুগ রেখে অনুবাদ করলে লক্ষ্যভাষার পাঠক মূল সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পায়। আসলে সাহিত্য তো বরাবরই জীবনধর্মী। দেশ-কাল-স্থান-পাত্র-পরিবেশ অনুযায়ী সাহিত্য রচিত হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বা বিংশ শতকের অধিকাংশ অনুবাদকই কিন্তু সচেতনতা নিয়ে অনুবাদকার্যে নিয়োজিত হননি। অনুবাদ থেকেই অনুবাদ করেছেন, তাই অনেকক্ষেত্রেই উৎস সম্পর্কে নীরব থেকেছেন অনুবাদকেরা। কোন সাহিত্য, কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করছেন, কখনও তা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। আবার কখনও-বা লেখকের নাম উল্লেখ করলেও তিনি কোন ভাষার তার কিছুই জানাননি। ফলে সেই অনুবাদ আদৌ মূলের সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত তা বোঝা দুষ্কর। এই ধরনের অজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত বিংশ শতকের প্রথম দশক। এর ফলশ্রুতিতে অনুবাদের মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব বসু (৩০ নভেম্বর ১৯০৮–১৮ মার্চ ১৯৭৪) নিজে একাধিক অনুবাদ করলেও অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'লেখা যত ভালো অনুবাদকের বিঘ্ন তত বেড়ে যায়।' লেখক তাঁর জানা উপকরণ দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে সাজান। সেই সৃষ্টি যখন আরেক দেশের ভাষায় অনুবাদ হয় তখন কি অনুবাদক একই চিন্তাধারায় কিংবা একই শব্দ-গন্ধ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে! যেমন ইংরেজীতে বাইবেল অনুবাদ হয়েছিল গ্রিক থেকে। আর গ্রিক গ্রন্থটি হিব্রু গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ইংরেজীতে Hell শব্দের অর্থ নরক কিন্তু হিব্রুতে যে শব্দের অনুবাদ নরক বা Hell বলে করা হয়েছে তার অর্থ নরক নয় বরং তা Heal শব্দের কাছাকাছি, যার মানে আরাম হওয়া। যেমন– নতুন চামড়া জন্মালে ক্ষতস্থানে আরাম হয় ঠিক তেমনি মৃত মানুষের আরামের, নিশ্চিন্তে অবস্থানের জায়গা Hell। শব্দবিভ্রাটে অর্থবিভ্রাটের সৃষ্টি হয়ে যায়। জীবনানন্দ দাশের (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯–২২ অক্টোবর ১৯৫৪) 'হায় চিল'– কে যদি ইয়েটসের He reproves the curlew-এর সৃজনশীল তর্জমা হিসেবে দেখি তাহলে দেখা যাবে একটি নতুন কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুও তাঁর 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন– অনুবাদের কিছু শব্দের মানে কিভাবে বদলে গিয়ে নতুন শব্দ এসেছে, তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন কুন্তীর প্রতি ব্যাসদেবের একটি উক্তি, 'সন্তি দেবনিকায়শ্চ

সংকল্পাজ্জনয়ন্তি যে/বাচ্যা দৃষ্টা তথা স্পর্শাৎ সংঘর্ষেনতি পঞ্চধা'। দেবতারা পাঁচ উপায়ে প্রজনন করে থাকেন। সংকল্প, দৃষ্টি, বাক, স্পর্শ ও সংঘর্ষ– এখানে সংঘর্ষ মানে স্পষ্টতই ইন্দ্রিয়মিলন; নীলকণ্ঠও বলেছেন সংঘর্ষণরত্যা। কিন্তু কালীপ্রসন্নে (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০–২৪ জুলাই ১৮৭০) আছে প্রীতি উৎপাদন। অর্থাৎ অনুবাদক এখানে মূলে না গিয়ে শব্দের প্রকৃতিতে আঁচড় কেটেছেন। যদিও তাঁর অনুবাদই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি তার প্রমাণ। এই লেখাটি ইংরেজীতে অনুবাদ হয় Poison Tree নামে। যিনি অনুবাদ করেন তিনি বঙ্গীয় সমাজের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। স্বভাবতই তাঁর অনুবাদে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। যেমন গ্রন্থে এক জায়গায় রয়েছে 'কোথাও-বা গোপাল উড়ের যাত্রা হইতেছে'। অনুবাদক অনুবাদ করলেন, 'In some places there were the journey of the flying Gopal'। অর্থাৎ পুরো লাইনটার অর্থই বদলে গেল। ভাষান্তরে স্বাধীনতার নামে এমন পরিস্থিতি সত্যিই কাম্য নয়।

ভাষান্তর বা অনুবাদে একজন অনুবাদকের স্বাধীনতা যতই থাকুক-না কেন; লক্ষ্য ভাষায় কোনোরকম দুর্বলতা থাকা চলবে না, থাকতে হবে চূড়ান্ত দক্ষতা। অর্থাৎ মূল লেখকের সাথে অনুবাদকের মিতালি বড্ড বেশি প্রয়োজন। যেমনটা আমরা দেখেছি পিয়ের লোতি'র সাথে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। লোতি জাপান, তুরস্ক, আইসল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের যে ছবি ফরাসি ভাষায় এঁকেছেন, তা পড়ে মনে হয় ভাষার সুর-বর্ণ-গন্ধ মিলে-মিশে একাকার হয়েছে। সাহিত্যের স্বাদ তো এমনই হওয়া উচিত। কলমের আঁচড়ে যদি হৃদয়ের ক্যানভাসে দাগ কাটা যায় তবে সে কলম পিয়ের লোতি'র। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লোতি'র লেখা বই ল্যাঁদ সাঁজাংলে-একেবারেই নিগূঢ় ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি কিন্তু ইংরেজকে বাদ দিয়ে লেখা। অর্থাৎ তিনি ভারতবর্ষের ছবি আঁকছেন কিন্তু শুরুতেই মনস্থির করে নিয়েছেন যে, এখানকার ইংরেজদের নিয়ে তিনি কিছু বলবেন না। ইংরেজবর্জিত ভারত (বসুমতী' কর্তৃক প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র গ্রন্থাবলি) ল্যাঁদ সাঁজাংলে'র ঠিক অনুবাদ নয়, যা কলঙ্কতিলক হয়ে আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদশশাঙ্কে। বইয়ের বাকি অংশটুকু অনুবাদ-সাহিত্যে যে কী আশ্চর্য সংযোজন তা সত্যিই অকল্পনীয়। মাদ্রাজে দেখা ভরত-নট্যমের মতো ফরাসি শব্দের উন্মাতাল ছন্দে লোতি মানবহৃদয়ের যত আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করেছেন অবলীলায়। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলার বাঁশিতে মধুর সুর বেঁজে উঠেছে লোতির সেই ছন্দোবদ্ধ তালে। এমন মিতালিতে বাংলা সাহিত্যাকাশে যে অনুবাদ সাহিত্য শুরু হয়েছিল, আজ তার সমাপ্তি হতে চলেছে কেবল ছেলেভোলানো কিছু ইংরেজি উপন্যাসের অনুবাদে। অনুবাদরূপে সেখানে আমরা যা দাঁড় করাচ্ছি তাকে অনুবাদ না বলে অ্যাডাপটেশন বা ছায়া অবলম্বনে রচিত বলা যায়। আর আমরা যেভাবে ভিনদেশি সাহিত্যকে অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের সাথে জাপটে ধরে এগিয়ে যাচ্ছি, ঠিক সেভাবে আমাদের বাংলা সাহিত্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে সচেষ্ট ভূমিকা হয়তো পালন করছি না। আমরা হয়তো আমাদের স্বপ্নের সীমানাকে এখনও অনেকদূর বিস্তৃত করতে পারিনি। আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের যারা পাঠক তাদের কাছেই

তো ঠিকমতো পৌঁছতে পারছি না। যদি পারতাম তাহলে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত সব বইয়ের সাথে প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেশের অনুবাদের বইও পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারতাম। বর্তমানে অনুবাদের নামে আমরা উৎস-ভাষাকে হারাতে বসেছি। বাংলা সাহিত্যেও এমন অনেক লেখা আছে যা আমাদের দেশের পাঠক মহলে সমাদৃত, অথচ তা অনুবাদের জন্য অবহেলিত। ইংরেজিসহ অন্যভাষায় অনুবাদ না হওয়ায় বাংলাদেশের অনেক সাহিত্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পৌঁছতে পারছে না।

আমাদের দেশে এখনও অনেকে মনে করেন অনুবাদ মৌলিক সাহিত্য নয়। যে কারণে অনুবাদচর্চা তার স্বরূপ হারাচ্ছে। তবে এর চেয়েও মজার বিষয় হচ্ছে– আমাদের দেশে অনুবাদ যতটা কম, মূল বইয়ের পাঠক আরও কম। মোটের ওপর এই কমের মধ্যে আবার যে অল্পসংখ্যক পাঠক কোনো বিদেশী সাহিত্য পড়ছেন তাঁরা বেশিরভাগই নিজেকে জাহির করতে ইংরেজির ওপর নির্ভর করছেন। ফলে বৈশ্বিক জ্ঞান বিস্তার লাভ করছে না। বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের পর সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ফলে আমাদের দেশে শিক্ষিত শ্রেণি আয়তনে বিশাল না হলেও নিঃসন্দেহে বিস্তৃততর হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা শিক্ষার মানে হয়েছি হতাশাব্যঞ্জকভাবে নিম্নগামী। আর ইংরেজিও হারিয়েছে তার পূর্বের বৈভব-আধিপত্য। সেক্ষেত্রে আমাদের এখন প্রয়োজন দক্ষ অনুবাদক। যাঁদের ভালো অনুবাদ আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। এজন্য সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। যার যার মতো ব্যক্তিগতভাবে অনুবাদ তো করা যেতেই পারে কিন্তু অনেকে আলোচনা সাপেক্ষে একত্রে কাজ করলে তা আরও সমৃদ্ধ হতে পারে। আর এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সাংগঠনিকভাবে একত্রিত উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক আওতায় এনে সরকারি উদ্যোগে অনুবাদ কেন্দ্র সৃষ্টি করা যেতে পারে। তাতে অন্তত সঠিক অনুবাদের পাশাপাশি অনুবাদকের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেইসাথে ইংরেজি ভাষার বাইরেও যে কোনো ভাষার সাহিত্যই সেই মূল ভাষা থেকে অনুবাদের চর্চাক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে। আবার বাংলা সাহিত্যকেও বিদেশি ভাষায় রূপান্তর করে অন্যভাষীদের কাছে উপস্থাপনের ক্ষেত্রটিও প্রসারিত হবে। তবে আলোচনা সাপেক্ষে হলে দুই ক্ষেত্রেই অনুবাদের মান বজায় থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে অন্তত আশি ভাগ। একজন দক্ষ অনুবাদক বছরের পর বছর পরিশ্রমের পর একটি সু-সম্পন্ন কাজ সম্পাদন করে যথার্থ আর্থিক মূল্য পায় না। আর বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুবাদের ক্ষেত্র প্রসারিত করলে অসাধু প্রকাশকের অর্থলোলুপতার হাত থেকে রক্ষা পাবে অনুবাদক। আর আমরা পাঠক, উৎস-ভাষার উপাদানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারব। সেই সমৃদ্ধ লেখনীর প্রভাবে বিদেশি সাহিত্যের মানসম্মত অনুবাদ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বসাহিত্যের ভালো অনুবাদ ও বাংলাভাষী পাঠকের হাতে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে। সঠিক অনুবাদের অভাবে আমরা আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছি। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখক আছেন যাঁদের লেখা অনুবাদ হলে

আন্তর্জাতিকভাবে আমরা আরও প্রশংসা অর্জন করতে পারি। তাঁদের মধ্যে– কবীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুন আহমেদ, হুমায়ুন আজাদ, আসাদ চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, সেলিনা হোসেন প্রমুখ। অনুবাদের ক্ষেত্র বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা দূতাবাসের সহায়তা নিতে পারি, ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের, আরবি অনুবাদের ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারি। এছাড়া আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি, ফারসি সহ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে নিয়োজিত করতে পারি। পৃথিবীব্যাপী সাহিত্য এবং অন্য যে কোনো বিষয়ের বই পৌঁছে দিতে অনুবাদের বিকল্প আর বড় কোনো মাধ্যম নেই। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে অনুবাদকে অনেক গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। কারণ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের জ্ঞান কিংবা জীবনবোধকে নিজ ভাষায় শুষে নেওয়ার জন্য অনুবাদই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যুদ্ধের ডামাডোল না বাজিয়ে একটি দেশের জ্ঞানের মতো অমূল্য সম্পদ নিজ দেশে নিয়ে আসার মতো স্বার্থকতা আর কী-ই বা হতে পারে! আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ যেক্ষেত্রে বহুগুণে এগিয়ে ছিল আমরা যেন উন্নয়নের দুর্বার গতিতে স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে পিছিয়ে না পড়ি! এই পিছিয়ে পড়া বন্ধ করতে পারলেই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা বাংলা সাহিত্যে লুকিয়ে থাকা শত-সহস্র জোনাকীর আলোর মেলা দেখতে পাব। যে আলোয় আলোকিত হয়ে আমাদের মাঝে ধরা দেবে নোবেল পুরস্কার আর ধ্রুপদী যত সাহিত্য।

[লেখক: কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নারীনেত্রী।]

অনুবাদ: সমৃদ্ধ করে ভাষার প্রকাশভঙ্গি ও সংস্কৃতি

অনন্ত উজ্জ্বল

অনুবাদ কেন করা হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে সঠিক কোনো উত্তর মেলেনি। তবে অনুমান করছি অনুবাদ করা হয় প্রয়োজনে। এই অনুমানের স্বপক্ষে এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়, খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ যখন দলে দলে এদেশে এসে মিশনারি স্থাপন করতে শুরু করলেন তখন তাঁদের কাছে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রথম প্রয়োজন হয়েছিলো স্থানীয়/দেশীয় ভাষায় ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করা। তা করা না হলে কোনোভাবেই এদেশীয় মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই প্রয়োজনের আলোকেই আমরা দেখতে পারি কলকাতা শহরের অদূরে শ্রীরামপুর মিশনের খ্রিস্টান ধমপ্রচারক উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। বাংলা ভাষায় কেরি'র অনুবাদকৃত প্রথম বাইবেল ১৭৯৩ ও ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে, কেরি ও তাঁর সহযোগীরা ভারতীয় আরো ত্রিশটি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। এত কিছু হল কিন্তু কোনো কবিতা, সাহিত্য বা একাডেমিক কোনো বিষয় অনুবাদ হল না। এর কারণ হয়তো, তখন ধর্মের বাইরে আগতদের কাছে অন্য কিছু প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। এরপরে যখন যেটা প্রয়োজন হয়েছে তখন সেটা অনুবাদ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শিবনাথ ভট্টাচার্য যিনি ১৮৭২ সালে এম.এ পাস করার সুবাদে 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করে শিবনাথ শাস্ত্রী হয়েছিলেন, তাঁর রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ থেকে কয়েক লাইন উল্লেখ করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কী প্রয়োজনে এবং কিভাবে প্রথম বাংলা অনুবাদ শুরু হল। এই গ্রন্থে আমরা দুটি ঘটনার উল্লেখ পাই। "প্রথম ঘটনায় উল্লেখ আছে, শ্রীরামপুর মিশনারির তিন ধর্মপ্রচারক কেরি, মার্সম্যান ও ওয়ার্ডের প্রচেষ্টায় ১৮০২ সালে খ্রিস্টাব্দে পীতাম্বর সিং নামের কায়স্থজাতীয় এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তারপরের বছরগুলোতে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যায়। এর ফলে মিশনারিগণের নিকট দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। প্রথম, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারীদের ইংরেজি শিক্ষার উপায় বিধান করা, দ্বিতীয়: বাইবেল সহ খ্রিস্টধর্মের অন্যান্য ধর্মীয় বইসমূহ দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে খ্রিস্টধর্মের চর্চা ও প্রসার ঘটানো।"

জনাব শাস্ত্রী এই গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেছেন, যেসকল সিভিলিয়ান ইংল্যান্ডের পুরাতন হালিস্‌বরি কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এদেশে এসে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে যেত, তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে এদেশীয় রীতিনীতি, এদেশীয় লোকের স্বভাব-চরিত্র, মনেরভাব ও ভাষা বুঝতে পারত না। এর ফলে শাসনকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হত না। বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করেন তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, "নবাগত সিবিলিয়ানদের কিছুদিন কলকাতায় রেখে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়ে রাজকার্যে পাঠাবেন।" এই জন্য তিনি ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। তখন বাংলা ভাষায় বই ছিল না। তখন লর্ড ওয়েলেসলি স্থানীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, কেরি, হরপ্রসাদ রায়, চণ্ডিচরণ মুন্সী ও রাজীব লোচনকে দিয়ে বেশ কিছু বই আরবি, ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ও ইংরেজিতে অনুবাদ করান।

এই আলোচনায় আমরা আরো একটু পেছনে ফিরে যেতে পারি। বেশি পেছনে নয়। আমরা দেখব মোঘলদের আগমন এবং শাসনকালে অনুবাদের বিষয় ও প্রয়োজনীয়তা কী ছিল। সম্রাট বাবরের কন্যা ও বাদশাহ হুমায়ুনের বোন গুলবদন বেগমের লেখা হুমায়ুননামা'য় উল্লেখ আছে, বাদশাহ হুমায়ূন মোঘল দরবারে চিত্রকলা শুরু করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি হিন্দুস্তানি ভাষা (সংস্কৃত কিংবা আদি বাংলা) থেকে ফারসি ভাষায় বহুমূল্যবান হিন্দুস্তানিগ্রন্থ অনুবাদ করিয়েছিলেন। সেগুলোর মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে জাদুবিদ্যার বইপর্যন্ত ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, সম্রাট আকবরের সময় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় রূপান্তর হয়েছিল আরো অধিক। পিতামহ বাবর এবং পিতা হুমায়ুনের মতো আকবর পারসিক কালচার আমদানি করতেই ব্যস্ত ছিলেন না। বরং তিনি হিন্দুস্তানি এবং পারসিক সংস্কৃতির মধ্যে রূপান্তর ঘটিয়ে এই দুই সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। এর চূড়ান্ত পর্ব হিসেবে সম্রাট আকবরের দরবারেই প্রথম রামায়ণ এবং মহাভারত ফারসিতে অনুবাদ হয়।

হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেক আগেই বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। ভারতে ইসলাম ধর্ম আগমনের পরেই মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরান অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার ত্বরান্বিত করার জন্য। কিন্তু ইসলাম ধর্মের কোনো ধর্মশাস্ত্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ ছিল না। বিশেষ করে পবিত্র কোরান ও হাদিস ১৮৮৬ সালের আগে বাংলায় প্রকাশিত হয়নি। ফলে কোরানের মর্মার্থ অনুধাবন করা থেকে বৃহত্তর মুসলিম গোষ্ঠী পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল। তখন প্রায় ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, মূলভাষা থেকে অনূদিত হলে গ্রন্থটির পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হবে। পবিত্র কোরান সম্পর্কেও এমন ধারণা ছিল। সম্ভবত এ কারণে কোনো মুসলিম মনীষী পবিত্র কোরানের অনুবাদ করতে সাহস পাননি। এমন পরিস্থিতিতে ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত 'নববিধান সভা'ই ইসলাম ধর্মগ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম সমাজের 'নববিধান সভা'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরবি-ফারসির সুপণ্ডিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রথম পূর্ণাঙ্গ

কোরান শরীফ বাংলায় অনুবাদ করে ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য এর আগে ১৮০৮ সালে বাংলায় কোরান অনুবাদ শুরু করেছিলেন মাওলানা আমীরুদ্দীন বসুনিয়া। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলায় আংশিক কোরান শরীফ অনুবাদ করেন।

আমার প্রথমে দেখেছি ধর্মপ্রচার, প্রসার ও টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজন হয়েছিল। এর একটু পরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজকার্য, বিশেষ করে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এদেশীয় মানুষের রীতিনীতি, স্বভাবচরিত্র ও মনের ভাব বুঝার জন্য বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষায় বই অনুবাদের প্রয়োজন হল। এরপর একের পর এক ইংরেজি শেখার বিদ্যালয় স্থাপন হল। এদেশীয় লোকেরা ইংরেজি শিখে নিজেদের উন্নতির জন্য অনুবাদ করলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার বই। অনুরূপভাবে এদেশীয় ভাষা থেকে তখন ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ।

দুই.

অনুবাদের মাধ্যমে ভাষা এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় চলাচল করে। বয়ে নিয়ে যায় সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত ঘাত-প্রতিঘাতের বয়ান। আসলে অনুবাদ একটি শিল্প। সাহিত্যের সুস্বাস্থ্যের জন্য অনুবাদশিল্পের প্রয়োজন। সাহিত্য অনুবাদের শেষকথা হল মূল ভাষার সুরটা ধরে রেখে অনূদিত ভাষার পাঠকের বোধগম্য একটি ভাষা প্রকাশ করা। আমরা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সাধারণত আক্ষরিক এবং ভাবগত অনুবাদ এই দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করি। অনুবাদ করতে যে পদ্ধতিই অনুসরণ করা হোক-না কেন, অনুবাদকের মূল উদ্দেশ্য থাকে লক্ষ্য ভাষা ও উৎস-ভাষার মধ্যে একটি নান্দনিক যোগসূত্র তৈরি করা। অন্যভাবে বলতে পারি, মূলত অনুবাদ করার উদ্দেশ্য হল অন্য ভাষার প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে নিজের ভাষার প্রকাশভঙ্গির পরিচয় করিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করা। এই সমৃদ্ধ হওয়া বা ভাষাকে সমৃদ্ধ করানোর চেষ্টার কোনো শেষ নেই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই তাঁর নতুন চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে ভাষা প্রকাশের ভঙ্গি ও শব্দের সমৃদ্ধি করতে পারেন। এ প্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় অনুবাদ একটি শিল্প। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ-চর্চা প্রবন্ধের মূল বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে শিল্পিত অনুবাদের কথা। তিনি বুঝিয়েছেন, প্রতিদিন চর্চার মাধ্যমে সময় দিয়ে এই শিল্পকে শিখতে হয়। এর শেষ বলে কিছু নেই।

তথ্যসূত্র:

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৯০৩
২. গুলবদন বেগম, হুমায়ুননামা
৩. শিশিরকুমার দাস, *Early Bengali prose, Carey to Vidyāsāgar*, ১৯৬৬ ।

[লেখক: কবি, অনুবাদ শিল্পী । কর্মকর্তা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ।]

প্র ব ন্ধ

অনুবাদ ও বাংলা সাহিত্য

জি ল্লু র র হ মা ন সি দ্দি কী

গোয়টে বলেছেন, প্রত্যেক সাহিত্যই শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিয়ে ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে, যদি কোনো বিদেশি উৎস থেকে সে আবার তরতাজা না হতে পারে ।

বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগের ফলে গোয়টের নিজের সাহিত্য এবং ইউরোপের সকল সাহিত্য কিভাবে বার বার সঞ্জীবিত হয়েছে, কিভাবে নতুন প্রাণের ধাক্কায় তার ক্লান্তি, তার গতানুগতিকতা কাটিয়ে উঠেছে, তিনি এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন । তাঁর সারাজীবনের সাহিত্য-কর্মে যে নিত্য-নতুনতা তা-ও তাঁর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ।

ইংরেজি সাহিত্যেও এই বৈদেশিক সম্পর্ক একইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে । এজরা পাউন্ডের ভাষায়, ইংরেজি সাহিত্য অনুবাদ নিয়েই বাঁচে, অনুবাদই এর সৃষ্টির যোগান দেয়, প্রত্যেকটি নতুন ঢেউয়ের প্রেরণা হল অনুবাদ, প্রতিটি তথাকথিত নিস্তরঙ্গ যুগই

অনুবাদের যুগ।'

বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসের বড় অংশই নিস্তরঙ্গতার সময়। এর মধ্যেও যা কিছু নতুন ঢেউ, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ইহলৌকিকতার অনুপ্রবেশ, তা এ দেশীয় সমাজে মুসলমান প্রভাবের পার্শ্বফল ভাববার কারণ আছে। আঠারো শতকের শেষদিকে বাংলা সাহিত্যের পাঁচ শতাধিক বৎসরের ইতিহাসে কোনো স্পষ্ট অগ্রগতি লক্ষ করা যায়নি, সাহিত্য পরিণতির পথে, পরিপক্বতার পথে অগ্রসর হয়নি। অধ্যাপক আহমদ শরীফের ভাষায়, দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা সাহিত্য আবর্তিত হয়েছে, বিবর্তিত হয়নি। আক্ষরিক অনুবাদ দূরের কথা, ভাবানুবাদও এ দেশের লেখকদের ধারণায় ছিল না, ছিল ইমিটেশন। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্যিক যোগাযোগের অভাবে দীর্ঘকালের সাহিত্যে কোনো সত্যিকার প্রাণস্পন্দন নেই। এই অবস্থার অবসান ঘটল উনিশ শতকের শুরুতে, যখন ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটল।

এরপর বাংলা সাহিত্যে প্রথমবারের মতো এক পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগল; বাংলা গদ্য গড়ে উঠল এবং সেই সঙ্গে বাংলা গদ্যসাহিত্য। সাহিত্যে এল পশ্চিমের বিভিন্ন আঙ্গিক। যা কোনোদিন ছিল না– উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক– তার আগমন ঘটল; যা ছিল যেমন কাব্য তা-ও সম্পূর্ণ নতুন খাতে নিত্যনতুন সম্ভাবনার পথে প্রবাহিত হল। একটি বিদেশি সাহিত্যের সংস্পর্শে অল্প সময়ে এমন বৈচিত্র্যময় ও গভীর পরিবর্তন পৃথিবীর আর কোনো সাহিত্যে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

এই পরিবর্তন ঘটেছিল ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে এবং সেই সাহিত্যে অনূদিত গোটা ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে। যদি মনে রাখা যায় যে ইংরেজি সাহিত্য শুধু ইংরেজের সৃষ্টি নয়, সমগ্র ইউরোপীয় মানসের সম্পদ আহরণ করে এর সৃষ্টি ও বিকাশ, তাহলে ইংরেজির কাছে বাংলা সাহিত্যের ঋণের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

ইংরেজ শাসনামলের বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য সাহিত্যিক ধারণার সঙ্গে অনুবাদের স্বচ্ছতা লাভ করেছে। কিন্তু যদিও হিন্দু কলেজের সময় থেকেই ইংরেজিশিক্ষিত নব্য বাঙালি সমাজ ঐ সাহিত্যকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছে, তুলনামূলকভাবে ঐ সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদের আগ্রহ কমই দেখা গেল। বিদ্যাসাগরের পথিকৃৎসুলভ ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত, সংস্কৃত থেকেই বেশি, তবে ইংরেজি থেকেও তিনি শেক্সপিয়রের 'দি কমেডি অব এররস' তর্জমা করেছিলেন। 'ভ্রান্তিবিলাস' গদ্যে লিখিত। চরিত্রগুলোর নাম পরিবর্তিত হয়েছে এদেশীয় নামে। গল্পাংশেও সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন বিদ্যাসাগর এবং মেয়েলি কলহের অনুবাদে অত্যন্ত সরস ও সতেজ বাঙালিয়ানা আরোপ করে প্রমাণ করেছিলেন যে দেশজ অসংস্কৃত বাংলা তাঁর সম্পূর্ণ দখলে ছিল।

'প্রচলিত অর্থে 'ভ্রান্তিবিলাস' অনুবাদ নয় : কাহিনিটি ইংরেজি নাটকের স্বাধীন বাংলা রূপান্তর। ভ্রান্তিবিলাসের কাহিনি মূলাশ্রয়ী; এর মধ্যে সংযোজন বলতে গেলে কিছুই নেই, তবে বর্জন কিছুটা আছে। মূলে যে কাহিনি নাটকের অঙ্কে ও দৃশ্যে বিন্যস্ত, অনুবাদে তাই ধারাবাহিক কাহিনি হিসেবে বিবৃত। "বাংলা পুস্তকে ইউরোপীয় সুশ্রাব্য হয় না" এই বিবেচনায় তিনি শুধু নামেই পরিবর্তন

আনেননি, অনেক বৈদেশিক ভাব ও পরিস্থিতি তিনি আলগোছে বাতিল করে দিয়েছেন।

মূল নাটকের সঙ্গে এই বাংলা কাহিনিটির তুলনা আদৌ সঙ্গত নয় কিনা, বিবেচনার বিষয়। বিদ্যাসাগর যদি নাট্যকার হতেন, অনুবাদটিকে নাট্যরূপ দিতেন, তাহলে তুলনা বিচার যতটা প্রসঙ্গিক হত, এ ক্ষেত্রে তা নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে 'ভ্রান্তিবিলাস' অনেকাংশেই মূল ইংরেজির ঘনিষ্ঠ অনুবাদ এবং গল্পাংশেও মূলানুসারী। সুতরাং অনুবাদের সমস্যাগুলো ঈশ্বরচন্দ্র কোথায় কিভাবে সমাধান করেছেন সেটা জানা প্রয়োজন :

Dromio of Syr
Some devils ask but the pairings of one's nail
A rush, a hair, a drop of blood, a pin
A nut, a cheery stone
But she, more covetious would have a chain.

পশ্চিম দেশীয় ডাইনিকে ঈশ্বরচন্দ্র অবলীলাক্রমে স্বদেশি ডাইনি বানিয়ে ছেড়েছেন : "এই সকল শুনিয়া কিঙ্কর বলিল অন্য কোন ডাইনি ছাড়িবার সময়, ঝাটা, কুলো, শিল, নোড়া বা ছেঁড়া জুতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া যায় এই দিব্যাঙ্গনা ডাইনিটির অধিক লোভ দেখছি ; ইনি হয় হার, নয় আংটি, দুইয়ের একটি না পাইলে যাইবেন না।" অনুবাদকর্মে ঈশ্বরচন্দ্র যে নমনীয় নীতি অনুসরণ করেছেন তার ফলে তিনি দিয়েছেন কোথাও মূলানুগ, আবার কোথাও স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ। উভয় রীতির যথাযথ প্রয়োগে 'ভ্রান্তিবিলাস' পরাশ্রয়িতার আভাসমুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত।

শেক্সপিয়র অনুবাদে ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে অনেকেই অনুসরণ করেছেন। নাট্যরূপ বর্জন করে বর্ণনামূলক কাহিনি রচনায় বিদেশীয় চরিত্র নাম বাদ দিয়ে সেখানে স্বদেশীয় নাম প্রবর্তনে, ও প্রয়োজনমতো ছোটখাট বর্জনের মধ্যে এর প্রমাণ মেলে। সর্বোপরি ইংরেজি সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দুটি-একটি রচনার অনুবাদ করলেও মূলত শেক্সপিয়রই যে ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের লক্ষ হয়েছিলো বাঙালি অনুবাদকের, ঈশ্বরচন্দ্র এই ধারার প্রবর্তক না হলেও আদিপুরুষের একজন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে হরেন্দ্র ঘোষের 'ভানু মতি চিত্ত বিলাস', Marchant of Venice (১৮৫২) থেকে, প্রমথনাথ বসুর অমরসিংহ Hamlet prince of Denmark (১৮৯৯) পর্যন্ত আমরা বাংলায় শেক্সপিয়র অনুবাদের যে ধারা লক্ষ করি, সেখানেও ইংরেজি শেক্সপিয়রকে বাঙালি পোশাক পরানোর ঝোঁক অক্ষুণ্ন ছিল, স্পষ্টতই দেখা যায়। অনূদিত নাটকগুলোর মধ্যে কমেডির তালিকায় পাই মার্চেন্ট অব ভেনিস, সিন্ধলিন, কমেডি অব এররস, উইন্টার্স টেল, টেমপেস্ট, এ মিড সামার্স নাইটস ড্রিম ও অ্যাজ ইউ লাইক ইট; এবং ট্রাজেডির তালিকায় রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট। অনুবাদের সংখ্যা যদি সঠিক নির্ণায়ক হয় তাহলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল ম্যাকবেথ, হ্যামলেট ও রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট। এই তালিকায় পাচ্ছি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি অনুবাদ– টেম্পেস্ট ও রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট, গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি– ম্যাকবেথ (১৮৯৯)।

দুঃখের বিষয় গত শতকের এই অনুবাদগুলো এখন সহজে পাওয়া যায় না এবং কয়েকটি

ব্যতিক্রম ছাড়া এগুলোর পুনঃমুদ্রণও হয়নি।

শতাব্দীর শেষ দিকেই সমগ্র শেক্সপিয়র অনুবাদের প্রথম প্রয়াস হয়েছিল; ১৮৯৭ সালে হারানচন্দ্র রক্ষিত-এর গদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁর নিজের স্বীকৃতি মতেই তিনি 'মর্মানুবাদ' করেছেন। তিনি ভূমিকায় বলেছেন : 'সকল স্থলে মূলের অনুসরণ করিতে পারি নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার পাঠের সুবিধার্থে, সরল আখ্যায়িকার আকারে আমি এই সকল নাটক গ্রথিত করিয়াছি।'

এই অর্ধশতকের শেক্সপিয়র অনুবাদের ধারা ও পদ্ধতি প্রমাণ করে যে, প্রকৃত অনুবাদের কঠিন পথ অনুবাদকেরা প্রায় সকলেই বর্জন করেছেন। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে, যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রায় সকলেই গদ্যাশ্রয়ী অনুবাদ করেছেন, প্রায় সকলেই বঙ্গীয়করণের পথ ধরেছেন যা শুরুতেই বিদ্যাসাগর প্রমুখরা করেছিলেন। অনূদিত শেক্সপিয়র যে ক্ষেত্রে নাট্যরূপ গ্রহণ করেননি সে ক্ষেত্রে মঞ্চায়ন-যোগ্যতার প্রসঙ্গও ওঠে না। তবে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অনূদিত ও অভিযোজিত শেক্সপিয়র বারবার অভিনীত হয়েছে। বাংলা নাটক ও মঞ্চের ওপর শেক্সপিয়রের গভীর ও

দূরবিস্তারী প্রভাব পড়েছে অন্যভাবে। বাংলা সাহিত্যের এই সময়কালের যাঁরা মুখ্য নাট্যকার– ক্ষিরোদপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়– প্রত্যেকেই শেক্সপীয়রীয় নাটকের ভাণ্ডার থেকে চরিত্র, ঘটনা এবং কমেডি ও ট্রাজেডির গঠন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বাঙালি নাট্যচেতনার পরতে পরতে যে শেক্সপিয়র প্রবেশ করেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনূদিত শেক্সপিয়র নাটকের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে গিরিশচন্দ্র ঘোষের ম্যাকবেথ। অনুবাদক ছিলেন ঐ সময়ের একজন সফল নাট্যকার, অভিনেতা ও রঙ্গালয় পরিচালক। বাংলা নাট্যমঞ্চের শতাধিক বৎসরের ইতিহাসে তাঁর মতো পরিপূর্ণ মঞ্চব্যক্তিত্ব দ্বিতীয় একজন জন্মগ্রহণ করেনি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ম্যাকবেথ একজন কৃতী নাট্যকারের কাজ যিনি মঞ্চের চাহিদা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। গৈরিশ ছন্দের ব্যবহারও এই অনুবাদে তার পরিপূর্ণ মহিমায় দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও নাটকটি মঞ্চে সফলতা অর্জন করেনি এবং কয়েক বৎসরের ব্যবধানে দ্বিতীয় পুনর্জন্মও একই অসাফল্যের গ্লানি বহন করে এনেছিলো। মূল ম্যাকবেথে কয়েকটি দৃশ্য গদ্যে, অধিকাংশই শেক্সপিয়রের পরিণত নাটকীয় পদ্যে। এই নাটকীয় পদ্য প্রায় চারশ' বৎসর পরে এখনও মঞ্চে ব্যবহারযোগ্য, এখনও তার প্রবলতা, তার প্রাণশক্তি সমানভাবে কার্যকর। পাশাপাশি গিরিশ ঘোষের অনুবাদে লেডি ম্যাকবেথের একটি বিখ্যাত উক্তির গৈরিশ সংস্করণই (Give him tending : He brings great news) এমন সন্দেহের জন্ম দেয় যে নাট্য-সংলাপের ব্যর্থতাই এই অসাফল্যের একটা কারণ।

সমাদর কত দূতে
আনিয়াছে উচ্চ সমাচার।
(দূতের প্রস্থান)

শ্বাসরুদ্ধ দূত কর্কশ বায়স
হবে শ্বাসরুদ্ধ তার
জানাইতে রাজ আগমন
এই পুরে যমের দুয়ারে ।
আয় আয় আয়রে নরকবাসী পিশাচ নিচয় ।
ডাকিছে জিঘাংসা তোরে আর ত্বরা করি
হব নারী-কোমলতা হতে মম
আপাদ মস্তক কর কঠিনতাময়,
কর ঘন শোণিত প্রবাহ
রুদ্ধ রাখ হৃদয়ের দ্বার
মানব-স্বভাব-জাত অনুতাপ যেন নাহি পাশে
না টলায় উদ্দেশ্য ভীষণ দ্বন্দ্ব নাহি ওঠে মনে
যদবধি কার্য নাহি হয় সমাধান ।
এসো হত্যা উত্তেজনাকারী ।
ভ্রম যারা অদৃশ্য শরীরে
মানব স্বভাবে পাপ উত্তেজনা হেতু
এসো এসো নারীর হৃদয়
পয় পরিবর্তে বিষ দেহ পয়োধরে ।
আয় আয় ঘোর রূপা তামসী ত্রিযামা ।
ভীষণ নরক ধূমে
যেন তীক্ষ্ণ ছুরি না হেরে আঘাত
তমাচ্ছন্ন আবরণ ভেদিয়া গগন
কি কি, কি কর, নাহি বলে । (ম্যাকবেথ : ১ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্য ।)

গিরিশ ঘোষের সংলাপ আবৃত্তিযোগ্য তবে অভিনয়যোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে এর দুর্বলতা বুঝতে হলে শেক্সপিয়রের তুলনীয় অংশটি পড়তে হবে ।

মঞ্চোপযোগী কাব্যভাষা গঠনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত । তাঁর 'রিজিয়া' নাটক যদি শেষপর্যন্ত লেখা হত, তাহলে সম্ভবত আমাদের ধারণার প্রকৃত সমর্থন পাওয়া যেত । এখন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্যই আমাদের অনুমানের স্বপক্ষে একমাত্র সমর্থন । লেডি ম্যাকবেথের উক্তির গিরিশ ঘোষকৃত অনুবাদের পাশাপাশি মেঘনাদবধ থেকে প্রমীলার নৃমুণ্ডমালিনী সখীর এই উক্তির মধ্যে একটু বেশি পরিমাণে নাট্যগুণ আছে বলে মনে হয় :

শীঘ্র ডাকি আন হেথা তোর সীতানাথে
বর্ব্বর? কে চাহে তোরে তুই ক্ষুদ্রজীবী?

নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায় । শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা বনবাসী ।
কী ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি
ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক বিভীষণে?
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর বাহু বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পূজিতে যুবতী ।
কোন যোধ সাধ্য, মূঢ়, বোধিতে তাঁহারে?

মঞ্চোপযোগী পদ্যসংলাপ সৃষ্টি বিশ্বনাটকের ইতিহাসে যে কয়টি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সেগুলো আঙুলে গণনা করা যায় । ইংরেজি সাহিত্যেও ষোড়শ শতকের শেষের বিশ বৎসর ও সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক, মোট তিরিশ বৎসরের নাট্যকর্মে এ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছিল । পরবর্তী ইতিহাস মূলত ব্যর্থতার কাহিনি । শেক্সপিয়রের প্রতি সুবিচার করার চেষ্টায় গিরিশ ঘোষ যে ব্যর্থ হয়েছিলেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই । কবিনাট্যকারগণ যতদিন আসবেন, চেষ্টা করে যাবেন । রবীন্দ্রনাথও করেছেন । বুদ্ধদেব বসু অতোটা সাহস করেননি, তাঁর কাব্যধর্মী নাটক, 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-কে কাব্যনাটক বলা যায় না । তবে আমাদের সমসাময়িক কবিদের মধ্যেও এই চিন্তা টিকে আছে । এবং এর প্রমাণ, এস্কিলাস, সফোক্লিস ও শেক্সপিয়রের কয়েকটি সাম্প্রতিক অনুবাদে । শেক্সপিয়র অনুবাদে এখনও গদ্যের নিরাপদ পন্থাই অনুসরণ করে চলেছেন বেশিরভাগ অনুবাদক । তবে পদ্যের ব্যবহারও অব্যাহত রেখেছেন বাঙলার কোনো কোনো দুঃসাহসী কবি । মূলের দাবি, কবিতার দাবি ও মঞ্চের দাবি পূরণ করে নাটকের কাব্যসংলাপ রচনার প্রয়াস কবিদের অব্যাহত আছে । এবং বাংলা সাহিত্যে এই প্রয়াস মূলত গ্রিক ও ইংরেজি, বিশেষত শেক্সপিয়র অনুবাদ প্রচেষ্টার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । আধুনিক বাংলা কবিতায় যে আলগা চালের অক্ষর বৃত্ত, নাটকীয় সংলাপে তারও কিছু কিছু বৈচিত্র্যধর্মী প্রয়োগ আমরা দেখতে পাচ্ছি:

(ক) প্রহরী । খুলে বলি । দণ্ড ভয়ে আমরা সকলেই জড়োসড়ো
গিয়ে মৃতদেহ থেকে সরালাম ধুলার আস্তর,
গ'লে যাওয়া লোকটার উলঙ্গ শরীর মেলে রেখে
হাওয়ার দুর্গন্ধ থেকে দূরে একটা পাহাড়ে বসলাম ।
এ ওকে শাসিয়ে বলছে, 'বাপু হে ঘুমিয়ে পড়ছ কেন?
এইভাবে এক ঠায় বসে আছি .... দেখতে দেখতে
চড়া দুপুরের সূর্য তেতে উঠলো মাথার উপর
কখন আচমকা লাগলো আঁখি ঝড়, কোড়া হাতে যেন

মাটি থেকে খ্যাপা হাওয়া আকালের দুশ্চিন্তার মতো
উঠে এসে চারদিক এলোপাথাড়ি চাবুক কসালো,
বুক খালি করে দিলো পাতা ছাওয়া বন, ঝরা পাতা
নিয়ে গেলো আকাশের বুকে

(সফোক্লিস, 'আন্তেগোনে',
আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনূদিত)

মূল নাটকের একই অংশ, অন্য অনুবাদ

(খ) ব্যাপারটা এই খুলে বলছি
আপনার ঐ ধমক খেয়ে ফিরে গেলাম ।
ফিরে গিয়েই যতো মাটি ছিল সবই
মৃতদেহের ওপর থেকে সরিয়ে দিলাম ।
তখন আবার আগের মতোই
যেমন ছিল তেমনি হলো
নগ্ন একটা মৃতদেহ
এবার বসলাম ধীরে সুস্থে
পাহাড়ের ওই যেদিকটাতে হাওয়া ছিল
যাতে করে মড়ার পচা গন্ধ নাকে
অল্প আসে
মধ্যে মধ্যে চড়া গলায়
আমরা সবাই নিজেদেরকে
সজাগ করে বলেছিলাম
সাবধান ভাই
কেউ যদি আজ ঘুমিয়ে পড়ে
তার কপালে দুঃখ আছে
এমন চলল ঘন্টা কয়েক
রোদ উঠল ভীষণ কড়া
সূর্য এলো মাঝ আকাশে
গরম হোল বেয়াড়া রকম
তখন হঠাৎ কোথা থেকে

এলো একটা ধুলোর আঁধি
সারা আকাশ অন্ধ করে
উড়িয়ে নিয়ে শুকনো পাতা
ঝাঁপিয়ে পড়ল মাঠের উপর

(সফোক্লিস, 'আন্তেগোনে',
শিশির কুমার দাশ অনূদিত)

'ক' দৃষ্টান্তটিকে আমরা 'আলগা চালের অক্ষরবৃত্ত' বলতে পারি, তবে 'খ' সম্বন্ধে কী বলা যাবে? এর ঝোঁকটা স্পষ্টতই স্বরবৃত্তের দিকে। দুটি অনুবাদের মধ্যে মিল শুধু একটি জায়গায়– দুজনই প্রহরীর উক্তিতে মানুষের মুখের চলতি ভাষার ঢং ধরবার চেষ্টা করেছেন।

কাব্যনাটকের আরও একটি সম্ভাবনাময় মাধ্যম, বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য, গদ্যকবিতার ছন্দ। সম্প্রতি বাংলাদেশের কয়েকজন কবি, বিশেষত সৈয়দ শামসুল হক, এবং এখন মুহম্মদ নূরুল হুদা, এই সম্ভাবনাকে নিকটবর্তী করেছেন তাঁদের অনুবাদকর্মে :

পুরুষহীন গৃহে নারীর একাকী জীবন-যাপন যে কতো মর্মান্তিক
একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা জানে না।
উপরন্তু, এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে এসেছে পথিকের পর পথিক,
তারা প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে নিয়ে এসেছে দুঃসহতর দুঃসংবাদ।
আমার স্বামীর দেহে যত আঘাতের গুজব আমি শুনেছি
তার সবই যদি সত্যি হতো, তাহলে তাঁর শরীর
পরিণত হতো অসংখ্য ছিদ্রময় জালে
আর যদি সত্য হতো তাঁর মৃত্যুবরণের গুজবগুলো, তাহলে বলবো
আজ আমাদের সম্মুখে যিনি উপস্থিত,
তিনি সেই মৃত্যুঞ্জয়ী দৈত্য দ্বিতীয় গেরিয়ন,
তিনবার মৃত্যু বরণকারী সেই ত্রিদেহী দানব,
যাঁর তিন মৃতদেহ সমাহিত হয়েছিল তিন তিনটি কবরে।
অনেক সময় দুঃসংবাদ এসেছে, ফাঁসির রজ্জুর মতো
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেঁচিয়ে ধরেছে আমার কণ্ঠ,
আমি তলিয়ে গেছি সীমাহীন হতাশায় আর বেদনায়।

(ঈস্কিলাস, 'আগামেমনন'
মোহাম্মদ নুরুল হুদা অনূদিত)

বাংলায় বিদেশি, এবং বিশেষত ক্লাসিকাল নাটকের অনুবাদে একটা মঞ্চোপযোগী কাব্যভাষা নির্মাণই একমাত্র সমস্যা, তা বলব না। তবে এটা অবশ্যই একটা মূল সমস্যা, যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান, সাম্প্রতিক অনুবাদে মনে হয়, প্রায় নাগালের মধ্যে এসে গেছে। থিয়েটারের চাহিদা মেটাবার জন্য মৌলিক নাটকের পাশাপাশি ইউরোপীয় প্রায় সকল মুখ্য নাট্যকারের দুটি একটি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকাংশ নাটক বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এবং এই অনুবাদকর্মে মঞ্চসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কবিতার মতো নাটকেও আধুনিকতায় প্রবর্তনার বৈদেশি অনূদিত নাটক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। একদা অনূদিত ইবসেন বিলাতের রঙ্গমঞ্চে যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, অধুনা অনূদিত ব্রেশ্‌ত বাংলা জগতে তাই করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে ব্যাপকতম বিকাশ ঘটেছে কবিতায়। এবং এটা ত্রিশোত্তর দশকগুলোতেই ঘটেছে। এর পূর্বে বাঙালি কবিদের আগ্রহ সীমিত ছিল ইংরেজি সাহিত্যে এবং ইংরেজি সাহিত্যেরও রোমান্টিক ভিক্টোরীয় কবিদের মধ্যে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যাপক অনুবাদকর্মে দশদিগন্ত উন্মোচিত করে দিলেন। এককভাবে পরবর্তীকালের কোনো কবি এত বিচিত্র উৎস থেকে যদিও অনুবাদ করেননি, তবু তাঁদের সামগ্রিক কর্ম সত্যেন্দ্রীয় সূচনারই চমৎকার পরিণতি। এই সামগ্রিক কর্মে অগ্রণী কবিরা প্রায় সকলেই যোগ দিয়েছেন,– সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ মিত্র, শামসুর রাহমান, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ফররুখ আহমদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, সানাউল হক, মঙ্গলাচরণ চট্টোপ্যাধায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপ্যাধায় এবং আরও অনেকে। কবিতা চয়ন করা হয়েছে– ইউরোপের সকল প্রধান সাহিত্যের সকল মুখ্য কবির রচনা থেকে। তরুণতর কবিরাও উভয় বঙ্গে সমান উৎসাহে অগ্রজদের এই অনুবাদকর্মের ধারাকে চলিষ্ণু রেখেছেন। বাংলা ভাষায় বর্তমানে কাব্যচর্চার প্রায় অবিভাজ্য অঙ্গ হিসেবে অনুবাদচর্চা নিজের জায়গা করে নিয়েছে। প্রাচ্য দেশীয় কবিতার মধ্যে চীনের ও জাপানের কবিতা ইতিপূর্বেই বাংলা অনুবাদে এনেছিলেন পূর্বসূরিগণ। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা এবং কৃষ্ণ আফ্রিকাও আমাদের অনুবাদ মানচিত্রের অঙ্গ। বলা বাহুল্য, অনুবাদের সিদ্ধি সকল ক্ষেত্রে সমান নয়, তবে স্বকীয় রচনায় সার্থক, অনুবাদেও তাঁরা প্রায়ই অসার্থক নন, এটুকু অবশ্য বলা যায়।

বৈদেশিক কবিতার বাংলা অনুবাদে ইংরেজি ভাষাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিদের অবলম্বন। মূল ভাষা থেকেও বিশেষত উর্দু, ফরাসি, জার্মান ও রুশ থেকেও অনুবাদ হয়েছে, তবে তার পরিমাণ বেশি নয়। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'অন্য দেশের কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় যা বলেছেন, তা উদ্ধৃতিযোগ্য, কারণ এই প্রশ্নে অধিকাংশ সক্রিয় কবি অনুবাদকের মুখপাত্র হিসেবেই তাঁকে গণ্য করা চলে :

'মূল ভাষা না জেনে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা গুরুতর ধৃষ্টতা বা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু এ জন্য আমি নিজেকে তেমন অপরাধী মনে করি না, তার প্রথম ছোট কারণ শব্দের সৌকুমার্য যখন ভাষান্তরিত করা অসম্ভব, তখন মূল ভাষা জানার প্রশ্ন তেমন জরুরি নয়, দ্বিতীয়ত, আমার

আগে এই ধরনের অনুবাদের কাজ বাংলাদেশে করেছেন আরও অন্তত পঞ্চাশ জন কবি, যাঁদের শিরোভাগে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।'

সুনীলের বক্তব্যের মধ্যে গ্রাহ্য সেইটুকুই যা পরিস্থিতির বাস্তবতাকে স্বীকার করে, এবং সর্বোত্তমের অভাবে পরবর্তী উত্তমকে পায়ে না ঠেলার সৎপরামর্শ দেয়। অনুবাদের আদর্শ যদি হয় মূলের প্রতি যতটা সম্ভব তন্নিষ্ঠ থাকা তাহলে মাঝখানে দ্বিতীয় ভাষার দৌত্য মানেই হল দূরত্ব সৃষ্টি। বাংলা কবিতায় অনুবাদচর্চা বেগবান হয়েছে এই অনিবার্য দূরত্বকে স্বীকার করে নিয়ে। এই দূরত্ব দূর করতে পারা গেলে অনুবাদেও পরিবর্তন আসবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মূল কবিতার শব্দে অর্থের যে ব্যঞ্জনা, অনুবাদক তাতে নানাভাবে সাড়া দিয়ে থাকেন কারণ অনেক শব্দই একার্থক নয়। বিশেষ অনুবাদে তার একটি অর্থই ধরা পড়ে, ব্যঞ্জনার বাকিটুকু মূল ভাষার সঙ্গে পরিচয় না হলে চিরদিন অজানা থেকে যায়। শব্দার্থগত দিক ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক কবিতার গতি, তার ছন্দ-স্পন্দ, সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয় ভূমিকা,– অন্য ভাষায় অনুবাদে পুরোপুরি আসার কথা নয়। পরোক্ষ অনুবাদে সেটা একেবারেই হারিয়ে যেতে পারে।

বাংলায় যে কাব্যসম্পদ গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদের দায়ও এসে পড়েছে বাঙালি অনুবাদকের ওপর। এতে বাংলা কবিতার অনুবাদে প্রত্যাশিত উৎকর্ষ আসতে পারছে না। কবিতার অনুবাদও কবিতা রচনার মতোই সৃষ্টিধর্মী কাজ, যা একজনের মাতৃভাষাতেই সম্ভব। রবীন্দ্রকাব্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী বলেন : "রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পর্যায়ের ইংরেজি অনুবাদে অনেক ভালো কাজ করেছেন কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি এ পথ থেকে সরে আসেন এবং তাঁর অধিকাংশ মুখ্য কবিতা বিশেষত শেষের দিকের কবিতা তিনি ধরেননি।

.... রবীন্দ্রনাথে আমরা মূল্যের রহস্য এবং অনুবাদের সমস্যা এবং এ-ও এক রহস্য, এ দুটির সম্মুখীন হই। আমি বিশ্বাস করি, অনুবাদ যথার্থ হতে পারে যদি কবি তাঁর মায়ের হাঁটুর কাছে বসে যে ভাষা শিখেছেন, যে ভাষা তাঁর অবচেতনার ভাষা সেই ভাষায় তা করেন।" (আমার অনুবাদ)। অমিয় চক্রবর্তী যা বলতে যেয়েও বলেননি, সেটা সহজেই অনুমেয় : স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছেন। আমাদের জন্য এখনও কোনো আর্থার ওয়েলি'র জন্ম হয়নি, দুঃখ করেছেন অমিয় চক্রবর্তী।

এবং রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীতে অনুরুদ্ধ হয়েও যে পাস্তেরনাক সম্মত হননি, তৃতীয় ভাষার মাধ্যমে তাঁর কবিতার রুশি অনুবাদ হতে দিতে– "ওই ভুল আমি আর করতে চাইনে",– আপত্তিকেও সঙ্গত বিবেচনা করেছেন। We appreciated his reluctance and his refusal. তাঁর নিজের কবিতা বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদে কী দাঁড়িয়েছে, দেখে তাঁর অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে উঠেছিল, অন্যসূত্রে আমরা তা জানতে পেরেছি।

সংগ্রহসূত্র: বই: অনুবাদ। লেখক: জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, প্রকাশক: বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল: ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, অনুবাদ শিল্পী। প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা (১৯৯০-১৯৯১)]

স্বাধীনতা-উত্তরকালের অনুবাদ সাহিত্য

আ ব দা র র শী দ

বিশ্বের বিচিত্র সাহিত্য-সম্ভারকে মাতৃভাষার সাহিত্যে আমদানি করার প্রবৃত্তি খুবই স্বাভাবিক, তাই যুগে যুগে এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশে ভাষান্তরিত, রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসের কাল থেকেই বাংলায় ভাষান্তরণের কাজ চলে আসছে।

বর্তমানকালেও, বাংলাদেশে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো অনুবাদের কাজও মোটামুটি

সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। অনুবাদ সম্পর্কে সাধারণভাবে একটা ধারণা প্রচলিত আছে,– বা বলা যায়, যে অনুবাদ জিনিসটা অনেকটা দুধের বদলে ঘোলের মতো। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। এ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু, যিনি বোদলেয়ারের কবিতা, কালিদাসের মেঘদূত-এর মতো আশ্চর্য কাব্যানুবাদ করতে পেরেছেন, যিনি পাস্তেরনাকের উপন্যাসের অত্যন্ত সার্থক অনুবাদ করেছেন,– বলেছিলেন যে, অনুবাদ ব্যাপারটিকে তিনি কিছুতেই দুধের বদলে ঘোল মনে করতে পারেন না। তিনি মনে করেন সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকও একজন স্রষ্টা।

বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর এই দৃষ্টিভঙ্গিটি একেবারে অনুপস্থিত নয় বলেই মনে করা যেতে পারে। আমাদের বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, বাংলা ভাষায় যে সমস্ত অনুবাদ হয়েছে বা হচ্ছে তার অধিকাংশই এসেছে ইংরেজি সাহিত্য থেকে, অথবা অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ থেকে, তাতে অবশ্য তেমন কিছু এসে-যায় না। বিশ্বসাহিত্যের যেখানে যা কিছু সুন্দর ও মূল্যবান, তা যে ভাষার মাধ্যমে আসুক, তাতে দেশের সাহিত্য অবশ্যই সমৃদ্ধতর হয়। সরাসরি অনুবাদ তো ভালোই, অনুবাদের অনুবাদ হলেও লাভ।

আবার সবসময় সরাসরি মূল ভাষা থেকে অনুবাদ করলেই যে সেটা উৎকৃষ্ট হবে এবং মূলের ইংরেজি তর্জমা থেকে অনুবাদ করলেই নিকৃষ্ট হবে এমন কোনো কথাও নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মস্কো থেকে রুশ ভাষার কিছু কিছু গ্রন্থের যেসব সরাসরি বঙ্গানুবাদ হয়েছে তার তুলনায় ঐসব গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় করা অনুবাদ উৎকৃষ্ট হতে দেখা গেছে। এর কারণ আমার মনে হয়, শুধু বিদেশি ভাষার প্রতি দখল থাকাটাই অনুবাদকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় গুণ নয়। অনূদিতব্য ভাষার প্রতি দখল তো অনুবাদকের থাকতেই হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে অনূদিতব্য বিষয়কে ধারণ ও তার উপলব্ধির ক্ষমতা এবং নিজ ভাষায় তা সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশ করার দক্ষতাও অনুবাদকের অবশ্যই থাকতে হবে।

তাই অনূদিতব্য বিষয়টি যেখানে কতকগুলো তথ্যের বা ঘটনার সমাবেশ, তার অনুবাদে তথ্য বা ঘটনাগুলো মোটামুটিভাবে পরিবেশিত হলেই তা পাঠককে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বিষয়টি যদি হয় কাব্য, নাটক বা গল্প উপন্যাস, তবে তার অনুবাদে পাঠক শুধু তথ্য বা ঘটনার বিবরণে সন্তুষ্ট হতে পারে না– সেখানে ভাষার মাধুর্য, প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতা, অনুভূতির গাঢ়তা, ভাবের যথাযথ প্রতিফলন ইত্যাদি না থাকলে সে অনুবাদ ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ সব মিলিয়ে সেই অনুবাদই উত্তম, যাতে মূলের রস অক্ষুণ্ন থাকবে অথচ অনুবাদের জাতীয় গন্ধটুকু থাকবে না। সার্থক অনুবাদ ব্যাপারটা শুধু ভাষান্তরণের মধ্য সীমাবদ্ধ নয়, তার সঙ্গে আরও কিছু থাকতে হয়, আর সেইটুকুর অভাব হলে সেগুলো পড়ে পাঠক আনন্দ তো পায়ই না, বরং অনুবাদ সম্পর্কেই সে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। আর সেই জন্যই বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন অনুবাদকও একজন স্রষ্টা।

এই অকিঞ্চিতকর ভূমিকাটুকুর পর এবার আমরা আলোচ্য বিষয়টিতে চলে আসতে পারি। আলোচনার বিষয় 'স্বাধীনতা-উত্তরকালের অনুবাদ সাহিত্য।'

স্বাধীনতা-উত্তরকালে, অর্থাৎ বিগত মাত্র ছয়-সাত বছরের মধ্যেই, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর পরিমাণে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত এই সকল অনুবাদের একটু পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমে ধরা যাক কাব্যের কথা। কাব্যক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর শেক্সপিয়রের সনেট এবং মিলটনের স্যামসন অ্যাগনিস নামক সুবিখ্যাত ট্রাজেডির সার্থক কাব্যানুবাদ। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অনূদিত, সুবিখ্যাত মার্কিন মহিলা কবি এমিলি ডিকিনসনের কবিতা, সানাউল হক অনূদিত ফরাসি কবি ইভানগলের প্রেমের কবিতা এবং আবদুস সাত্তার অনূদিত 'আরবি কবিতা'। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সানাউল হক, আবদুস সাত্তার– এঁরা সকলেই বাংলাদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। তাই অনুবাদের ক্ষেত্রেও এঁরা প্রত্যেকেই সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

অনূদিত এই সকল কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অনূদিত কবিতার সংখ্যাও প্রচুর। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সৈয়দ আলী আহসান কৃত পোল্যান্ডের কবি হাইন্‌ৎস্‌ উইনফ্রিড সাবাইস-এর কবিতার অনুবাদ, সাইয়িদ আতিকুল্লার সোলঝেনিৎসিনের কবিতার অনুবাদ, আবদুর মোহিত কৃত রাইনের মারিয়া রিলকে এবং পাবলো নেরুদা'র কবিতার অনুবাদ।

এর পরে আমরা নাটকের পরিচয় নিতে পারি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এখানে প্রচুর নাটকের অনুবাদ হয়েছে। এর মধ্যে জাঁ পল সার্তের তিনটি নাটক– 'নিঃশব্দ নরকে','দ্বার রুদ্ধ' এবং 'ছায়াহীন কায়া'– প্রথমটি অনুবাদ করেছেন মুস্তাফিজুর রহমান, দ্বিতীয়টি যুগ্মভাবে জিয়া হায়দার ও আতাউর রহমান এবং তৃতীয়টি করেছেন বর্তমান প্রবন্ধকার। মুস্তাফিজুর রহমান আরো অনুবাদ করেছেন ম্যাক্সিম গোর্কি'র 'ইয়েগর বুলিকভ অন্যান্য' আর 'ওরা থাকে নীচে' এবং আলবেয়ার কামু'র 'ক্যালিগুলা'। জিয়া হায়দার এবং আবদুল্লাহ মামুন দুজনেই অনুবাদ করেছেন ক্রিস্টোফার মার্লোর নাটক ড. ফস্টাস। আবু শাহরিয়ার অনুবাদ করেছেন শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' এবং ইউজিন ইওনেস্কোর 'তপ্তবাতাসে দুজন।' ইসমাইল মোহাম্মদ করেছেন 'হপ্‌ত্‌মানের তিনটি নাটক', নরেন বিশ্বাস করেছেন ম্যাক্সিম গোর্কি'র 'মা'। শাহাবুদ্দীন আহমদ অনুবাদ করেছেন শেখভের দুটি নাটক 'সি গাল' এবং 'তিন বোন'। রুডলফ বেসিয়ারের 'সহসা জীবন' নাটকের অনুবাদ করেছেন খালেদা হানুম। বর্তমান প্রবন্ধকারকৃত ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিক ট্রাজেডির তিনটি গদ্য অনুবাদ পাওয়া গেছে– সফোক্লিসের 'এ্যান্টিগনি ও 'ইলেকট্রা' এবং ইউরিপিডিসের 'ইলেকট্রা'।

অনুবাদ ছাড়াও বাংলায় বিদেশি নাটকের রূপান্তরের সংখ্যাও প্রচুর। যেমন 'হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপার' নামে শেখভের চারটি নাটকের এবং লেডি গ্রেগরির 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাটকের রূপান্তর করেছেন মমতাজ উদ্দীন আহমদ। আলী যাকের করেছেন মলিয়ের-এর 'বিদগ্ধ রমণীফুল', এডওয়ার্ড অ্যালবির 'এই নিষিদ্ধ পল্লিতে' ও ব্রেখটের 'সৎ মানুষের খোঁজে'; আতাউর রহমান ও আসাদুজ্জামান রূপান্তর করেছেন ফেরেন্‌ক মোলনারের 'ভেঁপুতে বেহাগ', আসাদুজ্জামান নূর আরো করেছেন ব্রেখটের 'দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা'; জিয়া হায়দার করেছেন গোগোল-এর

'প্রজাপতির নিবন্ধ'। এ ছাড়া অতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'বৈদেশি' নামে শহীদ মুনীর চৌধুরী কৃত পাঁচটি বিদেশি নাটকের রূপান্তর। এগুলো হচ্ছে রিচার্ড হিউসের 'ললাট লিখন', ইডেন ফিলপটসের ১ মহারাজ', ইলিয়াট ক্রশে উইলিয়ামের 'জমা খরচ ইজা', অ্যালান মঞ্চ হাউসের 'গুর্গন খাঁর হীরা' ও জন অগাস্ট স্ট্রিটন্ডবার্গ-এর 'জনক'। নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তরণের ক্ষেত্রে শহীদ মুনীর চৌধুরীর অবদান অসামান্য ও অবিস্মরণীয়।

নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে আরো একজন কীর্তিমান ব্যক্তি হচ্ছেন কবীর চৌধুরী। স্বাধীনতা-উত্তরকালের হিসাবে তাঁর অনুবাদ ও রূপান্তর কর্মের সংখ্যা বেশি না হলেও এ পর্যন্ত তিনি ইবসন, ইউজিন ও নীল, জি. বি. প্রিস্টলি, ক্রিস্টোফার ফ্রাই, ক্লিফোর্ড ও ডেটস প্রমুখ বহু নাট্যকারের নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর করেছেন।

ইবসেনের বহু নাটক অনুবাদ করেছেন আবদুল হক– অবশ্য তার সবগুলোই স্বাধীনতার আগে।

ছোটগল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই সময়কালের মধ্যে যে কটি অনুবাদ হয়েছে তার অধিকাংশই উর্দু থেকে। উর্দু সাহিত্যের যে ক'জন সেরা লেখক রয়েছেন– কৃষণ চন্দর, খাজা আহমদ আব্বাস, সাদাত হাসান মান্টো, মুন্সী প্রেমচাঁদ– এঁদের সকলের রচনাই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদের কাজে এই সময়ের মধ্যে যাঁরা অগ্রণী, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আখতার উন নবী, জাফর আলম, মোস্তফা হারুন, আনোয়ারা বেগম, আতোয়ার রহমান, কাজী মাসুম। উর্দু অনুবাদের ক্ষেত্রে নেয়ামাল বাসির-এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেসমস্ত উর্দু গল্প-উপন্যাসের অনুবাদ হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : কৃষণ চন্দরের 'স্বর্গ নরক', 'চাঁদ হে চাঁদ', 'ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ', 'মিস নৈনিতাল', 'গাদ্দার', 'মাটির প্রেম', 'হংকং-এ একরাত', 'এজেন্ট এফ.বি.আই'। সাদাত হাসান মান্টো'র 'জার্লিং ডার্লিং', 'এক টুকরো মিছরি', 'দুটি উদাস চোখ', মান্টোর শ্রেষ্ঠ গল্প, খাজা আহমদ আব্বাস এর– 'রক্তের মতো লাল', 'রিটার্ন টিকেট', মুন্সী প্রেমচাঁদের 'ললিতা ও নির্মলা'। এছাড়া নির্বাচিত উর্দু গল্প নামক গ্রন্থে মোস্তফা হারুন অনূদিত প্রেমচাঁদ, মান্টো, খাজা আহমদ আব্বাস, কুদরতুল্লা শাহাব, ইসমত চুঘতাই, কুররাতুল আইন হায়দার প্রমুখের গল্পের অনুবাদ সংকলিত হয়েছে।

উর্দু ছাড়া অন্যান্য ভাষার উপন্যাসের মধ্যে আছে আহমদ ছফা অনূদিত পি. ডলভোদ-এর 'তানিয়া', আবদুল হাফিজ অনূদিত পার্ল বাকের 'গুড আর্থ', আবুল ফজল অনূদিত হেমিংওয়ের 'তবুও সূর্য ওঠে', মেহের কবির অনূদিত বুলগেরীয় লেখক গিওগি কাবাসলাভোভ-এর 'ট্যাঙ্গো; এবং বর্তমান প্রবন্ধকার অনূদিত জেরোম কে, জেরোমের 'এক নায়ে তিনজন'।

আর গল্পের মধ্যে আছে মুস্তাফিজুর রহমান অনূদিত 'বিদেশি সেরা গল্প'– এতে ইউরোপীয়, মার্কিন ও রুশ গল্প রয়েছে। রয়েছে আবদুস সাত্তারকৃত আরবি থেকে সরাসরি অনূদিত আধুনিক আরবি গল্প ও নির্বাচিত আরবি গল্প। করুণাময় গোস্বামী অনূদিত 'আফ্রিকার গল্প', পূর্ণেন্দু দস্তিদার অনূদিত 'মোপাসা'র গল্প'। পূর্ণেন্দু দস্তিদার ইতোপূর্বে শেখভের গল্প অনুবাদ করেছেন, শেখভের

গল্পের সার্থক অনুবাদ কবীর চৌধুরীও করেছেন।

প্রবন্ধ, সমালোচনা, গবেষণা, রম্য রচনা ইত্যাদি বিষয়ক কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থও এই সময়ের মধ্যে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুনীলকুমার মুখোপ্যাধায় অনূদিত অ্যারিস্টটলের 'কাব্যনির্মাণ কলা' ও 'হোরেসের কাব্যতত্ত্ব'; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব'; জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী অনূদিত জন মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা', সরদার ফজলুল করিম অনূদিত প্লেটোর 'রিপাবলিক' এবং আবু মহামেদ হাবিবুল্লা অনূদিত 'আল বেরুনীর ভারততত্ত্ব'।

এ ছাড়া রয়েছে মাযহারুল ইসলাম অনূদিত অ্যান্টনী মাসকারানহাসের 'বাংলাদেশ লাঞ্ছিতা', জাফর আলম অনূদিত মান্টোর 'গল্প লেখক ও অশ্লীলতা'; মোস্তফা হারুন অনূদিত মান্টোর চলচ্চিত্র জগৎ সম্পর্কে আলোচনা 'গাঞ্জে ফেরেশতে' এবং কৃষণ চন্দরের রম্য রচনা 'আমি গাধা বলছি'; এ.বি.এম. কামালউদ্দীন শামীম অনূদিত কৃষণ চন্দরের 'লন্ডনের সাত রং', তাজা কলম অনূদিত মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন'; রাহাত খান অনূদিত 'শিক্ষা ও সমাজ'।

ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় সাহিত্যও বেশ কিছুসংখ্যক অনূদিত হয়েছে। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মাওলানা কারামত আলী নিজামী অনূদিত 'ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার', মুহীউদ্দীন খান অনূদিত 'জীবনসায়াহ্নে মানবতার রূপ', মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী অনূদিত 'বোখারী শরীফ'।

সাহিত্যের আরো একটি রসের দিক আছে, অনেকে যাকে অকারণ উন্নাসিকতায় থ্রিলার বলেন– সেই থ্রিলার-পিপাসুদের– যাঁরা সংখ্যায় নেহাত নগণ্য নন,– তৃষ্ণা নিবারণের দায়িত্ব প্রায় এককভাবে বহন করে চলেছেন কাজী আনোয়ার হোসেন। অনুবাদ ও রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলায় অজস্র বিদেশি থ্রিলার তিনি আমদানি করেছেন। এই শাখায় কিন্তু কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি, এডগার ওয়ালেস– এঁরা পরিত্যক্ত হয়েছেন অযৌক্তিকভাবে।

শিশু-কিশোরদের জন্যও এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু অনুবাদ, ভাবানুবাদ বা সংক্ষেপিত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে মোস্তফা হারুন অনূদিত কৃষণ চন্দরের 'নীলা হরিণের দেশে', আসাদ চৌধুরী, শামসুল হক ও মোসলেমা খাতুন অনূদিত 'হ্যান্স এ্যান্ডারসনের ৬টি রূপকথা'; আবদুস সাত্তারের 'ছোটদের আরবি গল্প', ফয়েজ আহমদের টলস্টয়ের কয়েকটি গল্পের ভাবানুবাদ 'বোকা আইভান', আবদুল হান্নান কোরায়শীর টলস্টয়ের তিনটি গল্পের ভাবানুবাদ 'শয়তানের পরাজয়'; মোহাম্মদ নাসির আলীর 'টলস্টয়ের সেরা গল্প' ও চীনদেশের রূপকথা; কাজী আবদুল আলিমের 'দেশ বিদেশের সেরা গল্প'; শাহজাহান কিবরিয়ার 'উল্টোবুড়ি' এবং 'বেড়ালের গলায় ঘণ্টা'; চৌধুরী ওসমানের 'অচিন দেশের স্বপনপুরী'; আবুল হোসেন মীর-এর পিমোসিও অবলম্বনে 'কাঠের মানুষ'; সুরাইয়া আখতার বেগমের শার্লট ব্রন্টির ভাবানুবাদ 'জেন আয়ার'; কাজী মাসুমের ব্লাইটনের ভাবানুবাদ 'দুষ্টু ছেলের দল'; হুরমতুন নেসার অ্যান্ডারসনের ভাবানুবাদ 'তুষার রানী', আতোয়ার রহমানের বিদেশি গল্পের ছায়াবলম্বনে রচিত গল্প সংকলন

'তেরো নদীর পারে' ; বন্দে আলী মিয়ার 'সাত রাজ্যের গল্প', আলমগীর জলিলের 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন', রায়হানা বেগমের 'নাচিয়ে রাজকন্যে'; মাহমুদ চৌধুরীর 'রবিনসন ক্রুসো' ও 'বেনহুর' ; মোহাম্মদ নাসির আলী ও সৈয়দ আবদুল হালিমের 'গালিভারস ট্রাভেল্‌স'; মীর ফখরুল কাইয়ুমের 'মহাশূন্য থেকে দেখা পৃথিবী'; এম.এ জব্বারের 'চাঁদের দেশে অ্যাপোলো'; মিনা শরফুদ্দীন অনূদিত 'পরমাণুর রাজ্য'; বন্দে আলী মিয়ার ' ইরান ও তুরানের গল্প' এবং 'গুলিস্তার গল্প'; সরদার ফজলুল করিমের 'গল্পের গল্প' ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কিশোরদের জন্য একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে অনুবাদকেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মূল কাহিনির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দিতে নারাজ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংক্ষেপিত অনুবাদ কিংবা অনুবাদকের নিজের মতো করে বলা। তাতে আমার মনে হয় মূলের রস থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ ধারায় ভিক্তোর উগো, আলেকজান্ডার দুমা, জুলভার্ন, মার্ক টোয়েন, স্টিভেনসন প্রমুখ লেখকদের আশ্চর্য কাহিনিগুলোর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের একান্ত অভাব। এগুলো সম্পূর্ণ অনুবাদ থাকলে কিশোররা এবং বড়রাও আনন্দ পেতে পারত।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের অনুবাদ সাহিত্যের এই হল মোটামুটি তালিকা তা-ও খুব সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ হল না। গুণাগুণ বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে এই সমস্ত অনুবাদের মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না তবে শুধু এইটুকু বলতে পারি, এই তালিকায় অনুবাদের যে সংখ্যা আমরা পাচ্ছি সেটা যেমন আশাপ্রদ, গুণগত দিক থেকে সবগুলোই ঠিক ততোখানি আশানুরূপ নয়।

শেষ করার আগে দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে এমন অজস্র ক্লাসিক রচনা আছে, যা এখনো বাংলায় অননূদিত রয়ে গেছে, সেগুলোও যাতে ক্রমশ অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আসে সেদিকে অনুবাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

আর একটা জিনিসের অভাব আছে, তা হল হাস্যরস। এই রসের প্রতিও অনুবাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ওডহাউসের নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁর একটিও বই আমাদের এখানে অনূদিত হয়নি, অথচ ওডহাউস সৃষ্ট বার্ট্রাম উস্টার ও তস্য বাটলার, অতুলনীয় জিভস্‌-এর কাহিনি কিংবা তাঁর ব্রান্ডিংস কাস্‌ল-এর অধিবাসী লর্ড এমসওয়ার্ডের কাহিনি যাঁরা পড়েননি, তাঁরা জানেন না তাঁরা কী হারাচ্ছেন।

সবশেষে বাংলা একাডেমি, মুক্তধারা ও বুক সোসাইটিকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি, কেননা এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। অন্যান্য প্রকাশকেরা অনুবাদ সম্পর্কে অনুরূপ আগ্রহ প্রকাশ করলে আমাদের অনুবাদ সাহিত্য আরো দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারত।

সংগ্রহসূত্র: বই: একুশের প্রবন্ধ (১৯৭৭-১৯৭৯)। সংকলক ও সম্পাদক: মোবারক হোসেন। প্রকাশক: বাংলা একাডেমি। প্রকাশকাল: আষাঢ় ১৪০৩/ জুন ১৯৯৬।

[লেখক: অনুবাদ শিল্পী, প্রাবন্ধিক।]

একুশ শতকের দাবি ও সম্ভাবনা: বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য: সমস্যা ও উত্তরণ

আলী আহমদ

বাংলা সাহিত্যটি বেশ সুপ্রাচীন এবং অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের সাথে অনুবাদের মাধ্যমে এর যোগাযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যের কথা বলতে গেলে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে সৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তী সময়ে রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের অনুবাদ সাহিত্যের কথাই মূলত বুঝতে হবে। কারণ বিভাগপূর্ব বাংলা ভাষায় অনুবাদ শুরু হয় মধ্যযুগ থেকেই। প্রাচীন ভারতে দেব-ভাষা হিসেবে স্বীকৃত সংস্কৃত থেকে আঞ্চলিক কিংবা লোকজ ভাষাসমূহে ধর্মীয় শ্লোকাদির অনুবাদ তখন নিষিদ্ধ হলেও সাধারণ মানুষের চাহিদা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্য অনূদিত হয়েছিল বহুপূর্বেই। তবে তা সাহিত্য হিসেবে যতটা-না তার চেয়ে বেশি হয়েছিল ঐ মহাকাব্য দুটির ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মর্যাদা প্রাপ্তির কারণে। পরবর্তী সময়ে বাংলা গদ্যের

উদ্ভব, কথা সাহিত্যের বিকাশ ও আধুনিক, বিশেষত পাশ্চাত্য সাহিত্যের, সংস্পর্শ লাভের ফলে বাংলায় অনুবাদের মাত্রা ও পরিধি অনেকাংশে বেড়ে যায়। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে আমরা মূলত বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। তবে প্রসঙ্গক্রমে ভৌগোলিক ও কালিক সীমারেখা কখনও কখনও অতিক্রান্ত হতে পারে।

এর পূর্বে অবশ্য অনুবাদের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। বর্তমান সাহিত্য-বিশ্বে অনুবাদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে Translatology বা অনুবাদবিদ্যা নামে সাহিত্যের আলাদা একটি সুপুষ্ট প্রশাখা এখন পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যেরও কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পঠন-পাঠন চলছে। এবং পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্রেফ অনুবাদ-বিষয়ক সাময়িকী বেরোচ্ছে অনেকগুলো। ঐ সমস্ত নিয়মিত প্রকাশিত সাময়িকীসমূহে বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিক নিয়ে বোদ্ধাজনেরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করে থাকেন।

অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার এখন আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অপরকে বোঝা বা নিজেকে বোঝানোর যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয়তা তা থেকেই মূলত সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনুবাদের উদ্ভব। মানবসভ্যতার বেশ প্রথমদিকেই এই প্রয়োজন অনুভূত হলেও, অনুবাদ সাহিত্যের তেমন একটা অগ্রগতি পূর্বে খুব একটা হয়নি, প্রধানত দুটি কারণে– এক. ঐ গ্রন্থসমূহ হয় ঐশ্বরিক, নতুবা দুই. এহামেধার সৃষ্টি। সুতরাং তার ভাষান্তর হয় 'পাপ' নয়তো-বা 'অসম্ভব'। কিন্তু তা বলে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত অনুভূতি না-কমে ক্রমাগত বরং বেড়েই চলেছে। অনুবাদের গুরুত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে মাদাম দ্য স্তেল (Madam de Stael) নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন, "মানবিক চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহান গ্রন্থগুলো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় স্থানান্তরের মাধ্যমেই মানুষ সাহিত্যের প্রতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করতে পারে।" সাহিত্যে অনুবাদকর্মের প্রয়োজনীয়তা এর দ্বারা খুব সুস্পষ্ট এবং জোরালোভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। এর বিকল্প কী হতে পারে তা নিয়েও লেখিকা আলোচনা করেছেন "অনুবাদ ব্যতিরেকে চলতে গেলে গ্রিক, লাতিন, ইতালীয়, ফরাসি, ইংরেজি, স্পেনীয়, পর্তুগিজ, জার্মান ইত্যাদি যে সমস্ত ভাষায় মহান লেখকেরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং করছেন সেই সমস্ত ভাষাগুলো ভালো করে জানা প্রয়োজন, কিন্তু এতে সুদীর্ঘ এক সময়ের প্রয়োজন, প্রয়োজন অনেক সাহায্য-সহায়তার এবং তারপরেও এ চিন্তা অসম্ভব হবে যে এক বিশাল মানবগোষ্ঠী এমন দক্ষতা কখনও অর্জন করতে সমর্থ হবে।" And're lefevere-এর Comparative literature পৃ. ১৮৯ (বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধকারের নিজের)। খুব সাদামাটা চোখেই ধরা পড়বে যে মাদাম দ্য স্তেলের সাহিত্য-বিশ্বের দৃষ্টি অত্যন্ত একপেশে ও সংকীর্ণ। কারণ ধ্রুপদী ও আধুনিক চীনা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, জাপানি, বাংলা, উর্দু-হিন্দি-তামিল ইত্যাদি প্রধান প্রধান এশীয় সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও, রুশ, নরওয়েজীয়, পোলিশ সহ আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় সাহিত্যও তিনি বিবেচনায় আনেননি। এর দ্বারা মাদাম দ্য স্তেলের সাহিত্য-বিশ্ব সম্পর্কীয় ধারণার সীমাবদ্ধতা প্রমাণিত হয়,

অনুবাদের গুরুত্ব আরো জোরালো প্রমাণিত হয়। আন্দ্রে লফেভের অবশ্য একটি অত্যন্ত যৌক্তিক প্রশ্ন তুলেছেন অনুবাদ সম্পর্কে। অনুবাদ যদি এতটাই মহান ও প্রশংসনীয় কাজ হয়, তাহলে, তিনি প্রশ্ন করেন, কেন এর সপক্ষে এতটা সাফাই গাইতে হবে? এই আপাত-বিভ্রান্তিকারী প্রশ্নের উত্তর অবশ্য তিনি নিজেই জুগিয়েছেন। ভিক্তর উগো'র (Victor Hugo) ছেলে ফ্রাঁসোয়া ভিক্তর (Franacois Victor) শেক্সপিয়রের রচনাসমগ্রের ফরাসি অনুবাদের ভূমিকায় ভিক্তর উগো যা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে এর জবাব। তিনি বলেছেন– "বিদেশি কোনো কবির অনুবাদের দ্বারা আসলে নিজের কাব্যকেই সমৃদ্ধ করা হয়; তথাপিও এই সমৃদ্ধির ফলে যারা লাভবান হয় তারা কিন্তু খুশি হয় না। অন্ততপক্ষে প্রথমদিকে তো নয়ই; প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া বিদ্রোহের। যে-ভাষায় নতুন বাকভঙ্গির প্রচলন করা হয়, সে ভাষা তা প্রতিহত করার জন্য যা কিছু সম্ভব সবই করে। পরবর্তী সময়ে এই সংযোজনে ঐ ভাষা নতুন শক্তি পায়, কিন্তু সংযোজনের সময় ঘৃণা করে নতুন এই ধারা। উদ্ভট ঐ রচনাশৈলী অপ্রত্যাশিত সব ধরন, বাকপ্রতিমার অভাবনীয় সব প্রয়োগ, এ সবকিছুই আগ্রাসনের শামিল। এমন হলে, নিজের সাহিত্যের কী হবে? নিজের রক্তের সাথে অন্য লোকের রক্ত-সংক্রমণ– এ কেমনতর ধারা? এত অতি-কাব্য। কাব্য-প্রতিমা অপব্যবহার, চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি করে সীমানা অতিক্রম করে স্থানীয় রুচির মধ্যে জোর করে বহির্বিশ্বের অপরিচিত রুচি ঢুকিয়ে দেয়া।" (পূর্বোদ্ধৃত আন্দ্রে লফেভেরের গ্রন্থের ১৯০ পৃষ্ঠায় Victor Hugo-র উদ্ধৃতি)। এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে আমি এটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি যে অনুবাদের মাধ্যমে যে বিদেশি (এবং সংস্কৃতি) সাহিত্য প্রবেশ করানো হয়, প্রথমদিকে সেখানে এক আলোড়ন ওঠে, কারণ নতুন এই সাহিত্যের আমদানির মাধ্যমে অনুবাদী সাহিত্যে চিন্তা-চেতনা, রচনা-শৈলী, তার ধরন-ধারণ সব কিছুতেই এক অনভিপ্রেত পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে। এই চিন্তাধারার উল্টোদিকে কিন্তু অনুবাদ-সম্পর্কিত আরেক দল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা মনে করেন যে, অনুবাদের মাধ্যমে অপরিচিত বিদেশি সংস্কৃতি প্রচলনের সময় সম্ভাব্য সংঘাত ও প্রতিরোধকে যতখানি সম্ভব এড়িয়ে অনুবাদী সাহিত্যের গণমানুষের রুচি ও গ্রহণ ক্ষমতার কথা মনে রেখে অনূদিত সাহিত্যের পরিবর্তন করা যেতে পারে। (Young) ইয়াং-এর " Night Thought" এর ফরাসি অনুবাদক ল তুর্নিয়ার (Le Tournier) যেমন বলেন: "আমার দেশের পক্ষে সুমিষ্ট এবং আনন্দদায়ক এক ফরাসি ইয়াং (Young) -কে আমি ইংরেজ ইয়াং-এর মধ্য থেকে বের করে আনার লক্ষ্যে কাজ করেছি– যাতে করে পাঠকরা আর যেন প্রশ্ন না করেন যে তাঁরা মৌলিক বই পড়ছেন– না কি তার অনুলিপি পড়ছেন।" ল তুর্নিয়ার এর পরে আরো বলেছেন যে, প্রতিবেশীর সাহিত্যে যা সর্বোত্তম, যা আমাদের রুচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেইগুলোই তিনি অনুবাদে নিয়েছেন এবং যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কিংবা নয় রুচিশীল, সেগুলো তিনি বাদ দিয়েছেন। তুর্নিয়ারের অনুবাদ সম্পর্কিত এই মতাদর্শ ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার মতো আরো অনেকেই একেবারে পছন্দ করি না। কারণ 'আপত্তিকর', 'রুচিহীন' কিংবা 'অসামঞ্জস্যপূর্ণ' অংশ কেটে বাদ দেয়ার অধিকার যদি কোনো অনুবাদককে দেয়া হয় এবং তিনি অনুবাদকালে তা প্রয়োগ করেন তাহলে যে-কাজটি দাঁড়াবে

তাকে আর যা-ই বলা যাক অনুবাদ বলা যাবে না।

জার্মান লেখক ও সমালোচক জোহান গটফ্রিড হার্ডার (Johann Gottfried Herter) ল তুর্নিয়ারের কঠোর সমালোচনা করে বলেন: "সুগভীর জ্যাতাভিমানে গর্বিত ফরাসিরা অন্য যুগের রুচির সাথে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা না করে তাদের নিজেদের রুচির সাথে অন্যান্য সব কিছুকে খাপ খাইয়ে নেয়। তাদের চোখে পীড়াদায়ক না হওয়ার লক্ষ্যে হোমারকে হাল ফ্যাশনের পোশাক পরে বন্দি হিসেবে ফ্রান্সে ঢুকতে হবে।" হোমারের প্রসঙ্গ আরো খানিকটা টেনে হার্ডার বলেন যে, প্রাচীন এই মহাকবিকে তাঁর পুরনো ও অনাড়ম্বর পোশাক পাল্টেই যেন নতুন কাপড়ে ফরাসিদের মধ্যে আসতে হবে। হার্ডারের এই বক্তব্যে খানিকটা ফরাসি-বিদ্বেষের গন্ধ পাওয়া গেলেও, অনুবাদে যে মূল রচনার অঙ্গহানি ও পরিবর্তন অনাকাঙ্ক্ষিত ও অগ্রহণীয় সেই বক্তব্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য।

ফরাসি ল তুর্নিয়ার এবং জার্মান গটফ্রিড হার্ডারের পূর্বোক্ত মতদ্বৈততা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের প্রকারভেদ সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করে তোলে। আঠারো শতকের ইংরেজ কবি ও নিবন্ধকার জন ড্রাইডেন এ বিষয়ে তিন প্রকারের অনুবাদের কথা আমাদেরকে বলেন: প্রথমত Metaphrase বা আক্ষরিক অনুবাদ। এ ক্ষেত্রে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের কাজ শব্দের পরিবর্তে প্রতিশব্দ এবং এক ছত্রের পরিবর্তে আরেক ছত্র রূপান্তরকে বুঝায়। দ্বিতীয়ত, Paraphrase বা রূপান্তর। এরূপ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল রচনার আক্ষরিক অনুবাদ না করে সার্বিক ভাব বজায় রেখে অনুবাদী সাহিত্যের বাক-প্রণালী অনুযায়ী রচনা তৈরি করা হয়; এবং তৃতীয়ত (হোরেশীয় অর্থে) imitation বা ভাবানুবাদ। এরূপ অনুবাদের ক্ষেত্রে, মূল রচনা শব্দ বাক্য এবং ভাবও অনেক সময় বর্জন করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সেখান থেকে এটা ধার করে নিয়ে একটি রচনা দাঁড় করিয়ে দেয়াকে বুঝতে হবে।

সে যাই হোক, মোদ্দা কথায় অনুবাদ হচ্ছে এক ভাষা, সাহিত্য, মূল রচনা ও এক ধরনের রচনাশৈলীর সীমান্ত অতিক্রম করে অন্য এক ভাষা, সাহিত্য, রচনাশৈলী ও শব্দ-প্রকরণে প্রবেশ করা। সভ্য জগতে সাহিত্যের অনুবাদ সব সময়ই কম-বেশি এভাবেই গণ্য হয়েছে বলে আমরা জানি। কিন্তু প্রায়শই যা মনে রাখি না তা হল এই যে অনুবাদ সব সময়ই 'নতুন ধারণা, নতুন ধরন, নতুন কলাকৌশল প্রবর্তন করেছে, এবং অনুবাদের ইতিহাস এক সংস্কৃতিকে অন্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত করাও ইতিহাস।' (Bassnet and lefevere কৃত রচনা Eve Tavor Bannet রচিত Postcultural Theory বইয়ের ১৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)। এ কথা যদি আমরা মেনে নেই তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে অনুবাদ স্রেফ এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় কোনো কিছুর রূপান্তরই বোঝায় না, এর ব্যাপ্তি ও গভীরতা আরো অনেক বেশি। এবং তাই যদি হয় তাহলে অনুবাদকের অবস্থান ও ভূমিকাও গভীরতর মনোযোগের দাবি রাখে। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে অনুবাদকের অদৃশ্যমানতা ও অনুবাদ কর্মের স্বচ্ছতা বিষয়ক একটি 'মিথ' চালু হয়েছিল। কিন্তু এক. ভাষার চিহ্ন-প্রকরণে স্থানান্তরের জন্য অবশ্যই একজন অনুবাদক থাকতে

হয়। দুই. ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে এক সেতুবন্ধনের কাজ করেন অনুবাদক এবং তাঁর অনুবাদকর্মের মাধ্যমে অপরিচিত এক পৃথিবীকে এনে উপস্থিত করেন অন্য আরেক জগতে এবং নতুন সেই জগৎকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর করে তোলেন। সুতরাং তাঁর ভূমিকা ও অবস্থানের গুরুত্ব, অন্তত বর্তমান সময়ে, তর্কাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে যা তর্কাতীত তো হয়ইনি, বরঞ্চ অনেক আলোচনার ঝড় তুলছে সংশ্লিষ্ট সকল মহলে তা হল কী অনূদিত হওয়া উচিত আর কেমনভাবেই হওয়া উচিত তা।

জন ড্রাইডেনের দ্বিতীয় ধরন, অর্থাৎ Paraphrasing কেই যদি আদর্শ অনুবাদ-রীতি হিসেবে আমরা মেনে নেই তাহলেও যে মতবিরোধের শেষ হবে তা মনে হয় না। কথাটা সম্ভবত মালার্মেই বলেছিলেন যে, "What is lost in translation is poetry"। একাধিক ভাষায় এবং বিশেষ করে একই কবিতা , দুই বা ততোধিক ভাষায় যাঁরা পড়েছেন এ-কথার সত্যতা তাঁরা একেবারে অস্বীকার করতে পারবেন বলে মনে হয় না। শুধু কবিতা কেন? গদ্য সাহিত্য আসলে তো স্রেফ কোনো কাহিনিনির্মাণ নয়; সেওতো ভাব, চিন্তা ও রসের এক ব্যঞ্জনাময় ও শিল্পিত প্রকাশ। অনুবাদে তা-ও কি রক্ষা করা সম্ভব? কিন্তু অনুবাদ ছাড়া আধুনিক সময়ে কোনো পথ আছে বলেও তো মনে হয় না। এক ভাষা-সাহিত্য থেকে আরেক ভাষা-সাহিত্য যিনিই অনুবাদ করেন তিনিই এক সময় এসে 'অননুবাদনীয়তা'র মুখোমুখি হন। এই অননুবাদনীয়তাই 'অন্য' সংস্কৃতি, অন্য সাহিত্য। অননুবাদনীয়কে অনুবাদ করা তখন আরো অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত আঁন্দ্রে লেফেভরের আরেকটি ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি এখানে দেয়া যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'অনুবাদককে... বিশ্বাসঘাতক হতেই হবে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে তিনি তা জানতে বা উপলব্ধি করতে পারেন না এবং প্রায় সব সময়ই এ ছাড়া তাঁর গত্যন্তরও নেই'। (পূর্বোদ্ধৃত আঁন্দ্রে লেফেভের-এর ২০৫ পৃষ্ঠায়)। মূল লেখকের 'অননুবাদনীয়তা'য় পৌঁছেই অনুবাদকে 'বিশ্বাসঘাতক' হতে হয়। এই স্থানটি অনুবাদের যেমনি সবচেয়ে জটিল অংশ তেমনি অনুবাদের চরিত্র-নির্ধারকও বটে। এখানে পৌঁছেই অনুবাদককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কীভাবে, কতটা 'বিশ্বাসঘাতক' হবেন তিনি। এক্ষেত্রে অনুবাদকের দক্ষতা, পাণ্ডিত্য সব কিছু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আসলে অনুবাদ তো স্রেফ ভাষান্তর নয়, সে কথা আগেই বলেছি। এ হচ্ছে এক ভাষা-সংস্কৃতি-সভ্যতা-সাহিত্য থেকে অন্য ভাষা-দেশ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতায় রূপান্তর। সুতরাং ঐগুলোকে যে অনুবাদক যতটা আত্মস্থ করতে পারেন তাঁর অনুবাদই ততোটা মান ও রসোত্তীর্ণ হয়। কিন্তু সভ্যতার বর্তমান স্তরে সাহিত্য অনুবাদকের কাজ যতটাই অপরিহার্য ও জটিল হোক-না কেন তাঁর অবস্থান কিন্তু এখনও একটি অদ্ভুত পর্যায়ে রয়েছে। এ কথা সত্য যে মহান কোনো লেখকের ভাষান্তরের মাধ্যমে যখন অনুবাদ করা হয় তখন অনুবাদকের অপরিহার্য 'বিশ্বাসঘাতকতা' সত্ত্বেও ঐ লেখককে যতখানি সম্ভব মূলানুগ রাখা অনুবাদকের সুমহান দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অনুবাদ যদি সার্থক হয় তাহলে মূল লেখক পান পরিচিতি ও খ্যাতি। আর অসফল অনুবাদের ক্ষেত্রে সব গাল-মন্দ অনুবাদকের ভাগ্যেই জোটে। এটাকে ভাগ্য বলে মেনে

নিয়েই অনুবাদের কাজে হাত দিতে হয় অনুবাদককে।

নাতিদীর্ঘ এই তাত্ত্বিক পটভূমিতে এবার বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক উভয় ক্ষেত্রেই অনুবাদ-সম্পর্কিত চলমান বৈশ্বিক বিতর্কের মোটেই বাইরে নয় বাংলাদেশ। অনুবাদ কেমন হওয়া উচিত এ নিয়ে অমীমাংসিত আলোচনা ও প্রয়োগ চলছে এখানেও। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে নিজেদেরকে আমরা যতটাই সাহিত্যপ্রেমী ভাবি-না কেন সাহিত্যচর্চা বাংলাদেশে লজ্জাজনকভাবে সীমিত। অনুবাদচর্চা তো আরও সংকীর্ণ। বাংলাভাষীরা পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। তাছাড়া বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে বাঙালি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর নিজেদেরকে এশীয় অনেক ভাষা-গোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বেশি সাহিত্যচর্চাকারী ও বোদ্ধা বলে আত্মাভিমানে ভুগি আমরা। কিন্তু ভেতরটা আসলে অনেকটা ফাঁকা। গত শতকের সত্তর এমনকি আশির দশক পর্যন্ত বিদেশি লেখক বলতে ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান-রুশ ধ্রুপদী কবি সাহিত্যিকদের মূলত বুঝেছি আমরা। টি.এস ইলিয়ট আর ইয়েটস পর্যন্ত এসে থেমে গেছি। নোবেল প্রাপ্তির কারণে ফকনার-হেমিংওয়ের মৌলিক রচনা পঠিত এবং আলোচিতও হয়েছে ইংরেজি জানা মহলে। কিন্তু অনুবাদের বেড়ায় শেক্সপিয়র, মিল্টন, বায়রন, শেলি-কীটস-এর চেয়ে খুব একটা সামনে এগোতে পারিনি আমরা।

আশির দশকের একেবারে শেষ প্রান্তে কিংবা নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে এসে ইংরেজি লেখক ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দুয়েকটি সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক বাংলায় অনূদিত হওয়া শুরু করলে আধুনিক সাহিত্য অনুবাদের অত্যন্ত সংকীর্ণ হলেও একটি ধারার সূচনা হয়েছে বলা চলে। এর অবশ্য কারণও আছে। বাংলাভাষী সুবিশাল একটি জনগোষ্ঠী পৃথিবীতে বসবাস করলেও এর শিক্ষিত এবং সাহিত্যামোদী অংশটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। তারা প্রায় সকলেই ইংরেজিতে সুশিক্ষিত থাকার কারণে ইংরেজির মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেন। বাংলাদেশের উদ্ভবের পর এই অবস্থার অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। গুণগত মান যতই পড়ে থাক-না কেন। এবং তা পড়ে গেছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে, ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত অথচ ইংরেজি না-জানা এক বড়সড় মধ্যবিত্তের তৈরি হয়েছে এখানে। খুব সামান্য হলেও এর মধ্যে একটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছে যারা বিদেশি সাহিত্য পড়তে চায় অথচ ইংরেজির মাধ্যমে তা পড়ার মতো যথেষ্ট ইংরেজি তাদের জানা নেই। এদের প্রয়োজনেই বাংলাদেশে আধুনিক সাহিত্যের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সঙ্গত কারণেই আশা করা যায় যে, আগামী বছরগুলোতে এই চাহিদা আরো বাড়তে থাকবে। কিন্তু বিদেশি সাহিত্যে আগ্রহী যথেষ্ট ইংরেজি না-জানা এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির আকৃতি এখনও সর্বত্র এমন একটা পর্যায় পৌছেনি যেখানে বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ বাণিজ্যিক দিক দিয়ে লাভ হতে পারে, যেমন হয়ে দাড়িয়েছে চটুল বাংলা উপন্যাসের বাজার। সুতরাং অলাভজনক অথচ অনেক আয়াসসাধ্য সাহিত্য-অনুবাদে স্বেচ্ছাশ্রমে এগিয়ে আসার লোকসংখ্যাও অনেক সীমিত। অবশ্য সাহিত্য যশোপ্রার্থী কিছু লোক যে

এদিকে একেবারে এগিয়ে আসছে না তা নয়। কিন্তু তাতে অনেক সময় লাভের চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে বেশি।

ওদিকে আমাদের সাহিত্যাভিমান এতটাই লজ্জাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পর্তুগিজ ঔপন্যাসিক জোসে সারামাগো যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান তাঁর ভাষায় প্রথম তখন আমাদের বিদ্বজ্জনেরা সাংঘাতিক অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। যাঁরা বিনয়ী তাঁরা সলজ্জভাবে স্বীকার করেন যে এই লেখকের নাম তাঁরা কখনো শোনেননি। সাহিত্য-বোদ্ধাভিমানীরা নোবেল কমিটির কাজের বিশ্লেষণ করেন এই বলে যে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের ভূ-রাজনৈতিক কারণে পর্তুগালে কিংবা পর্তুগিজভাষী কাউকে এখন নোবেল পুরস্কার দেয়া প্রয়োজন তাই সারামাগো নামক একজন কাউকে বের করা হয়েছে। বাঙালি বিদ্বজ্জনের অতি উদ্ধত অংশটির প্রতিক্রিয়া আরো মারাত্মক। এঁদের কেউ কেউ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এই বলে যে, পশ্চিমা কুকুর পশ্চিমারাই সামলাবে। অন্য কেউ আবার বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদের কোনো দালালকেই তো বেছে নেয়া হবে সাম্রাজ্যবাদীদের এই পুরস্কার দেয়ার জন্য। পরে যখন জানা গেল যে জোসে সারামাগো পৃথিবীর প্রধান প্রধান সকল ভাষাসহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে লাখ লাখ কপি বিক্রিত হয়েছে, পৃথিবীর নানান ভাষায় তাঁকে নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনামূলক বই লেখা হয়েছে, তাঁর ওপর গবেষণার জন্য পাশ্চাত্যের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় পি.এইচ.ডি ডিগ্রি দিয়েছে অনেককে; নোবেল প্রাপ্তির পূর্বে তিনি পৃথিবীর বড় বড় সাহিত্য পুরস্কার প্রায় সবগুলোই পেয়েছিলেন। এবং সারামাগো তাঁর দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কার্ডধারী সদস্য– তখন আমাদের এই বিদ্বজ্জনের কোনো প্রতিক্রিয়া কোথাও প্রকাশ হতে দেখিনি। এমনি অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় আমাদের অপরিসীম অজ্ঞতার। একটু বিস্তারিতভাবে এই একটি উদাহরণ তুলে ধরলাম এই কারণে যে বহির্বিশ্বের চলমান সাহিত্য আন্দোলন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমাদের সবচেয়ে অগ্রসর অংশের অজ্ঞতাও যে কতটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যাপক তা এখন আমাদের উপলব্ধি করা দরকার।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বহির্বিশ্বের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনুবাদের মাধ্যমেই এই হতাশাজনক অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব। কিন্তু কে করবে এই অনুবাদ? এবং কী কারণে তা করবে সে বিষয়টিও গভীর মনোযোগের দাবিদার। যে-সামান্য অনুবাদ-চর্চা আমাদের সাহিত্যে চলমান তা-ও প্রসঙ্গক্রমে খানিকটা বিশ্লেষণের দাবিদার। খুব ক্ষীণধারা, কিন্তু আমাদের অনুবাদ জগতে বেশ শক্তিশালী বেশ কিছু অনুবাদক রয়েছেন বাংলা ভাষায় প্রয়োগে যাঁদেরকে প্রাচীনপন্থী বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই শ্রেণির অনুবাদকগণ ভালো ইংরেজি জানেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু যখনই তাঁরা বাংলায় কিছু অনুবাদ করতে বসেন তখন কেন জানি না তাঁদের কলমের ডগায় সব তৎসম শব্দ, যৌগিক বাক্য আর পরিহারযোগ্য সন্ধি-সমাস এসে ভিড় জমায়। সুন্দর প্রেমদৃশ্যের বর্ণনা থেকে শুরু করে নাটকের সাধারণ পাত্র-পাত্রীর সংলাপের ক্ষেত্রে অনেক সময় এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই কারণে এই সম্মানিত অনুবাদকগণ ভাষা ও রচনাশৈলীতে বিশুদ্ধতা অর্জন করেও অনুবাদকে তেমন আকর্ষণীয় করে

তুলতে পারেন না বলে মনে হয়। এর বিপরীতে আরেক দল অনুবাদকের দেখা পাওয়া যায় আমাদের সাহিত্যে, যাঁরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিশ্বসাহিত্যকে বাংলায় অনুবাদের প্রয়াস পান। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু অনুবাদকদের এই দলের অনেকেরই ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই জ্ঞান এত সীমিত যে অনুবাদনীয় সাহিত্যের দুর্বোধ্য অংশ ক্ষমার অযোগ্য কাটছাঁট করার পরেও যা বাংলায় লেখেন তা বাংলায় হয় না, সাহিত্য তো পরের কথা। এই শ্রেণির অনুবাদকদের উদ্দেশ্য মহৎ হলে হতেও পারে। কিন্তু সাহিত্যের, বিশেষত অনুবাদ সাহিত্যের মারাত্মক ক্ষতি করে চলেছেন এঁরা। এঁদের উদ্ভব, আগেই যেমন বলেছি, অনেকটা সাহিত্য যশোপ্রার্থিতার কারণে এবং খানিকটা পাঠক চাহিদা-মেটানোর কারণেও। তবে আমাদের সাহিত্যে অনুবাদকে অপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে এই শ্রেণির অনুবাদকের ভূমিকাই বোধ হয় একমাত্র দায়ী। কোনো অনুবাদ সাহিত্য যদি আকর্ষণীয় হয় ও পাঠকপ্রিয়তা পায় তাহলে সমালোচকেরা প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে এ লেখাটিকে এই বলে প্রশংসা করেন যে 'অনুবাদটি অনুবাদের মতোই মনে হয় না'। বিদেশি ভাষার কত অনুবাদকর্ম পড়েন আমাদের শিক্ষিত শ্রেণি, কিন্তু এমন মন্তব্য আমি অন্তত তাদের কাউকে করতে শুনিনি।

এছাড়া সংখ্যালঘু আরেক এবং শেষ শ্রেণির অনুবাদক রয়েছেন যাঁরা প্রাচীন, মধ্যযুগীয় কিংবা আধুনিক যেকোনো সাহিত্যেরই অনুবাদ করেন, সে অনুবাদ সব অর্থেই মানোত্তীর্ণ হয়। কিন্তু এই শ্রেণির অনুবাদকের সংখ্যা অতিশয় কম এবং নানা কারণে তাঁদের অনুবাদও অপ্রতুল। অনুবাদ সাহিত্যের অত্যন্ত সীমিত বাজারে এই শ্রেণির অনুবাদ সাহিত্যের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, এর সৃষ্টি খুবই কম। সুতরাং অন্যান্য অনুবাদকগণ ঐ শূন্যস্থান পূর্ণ করার প্রয়াস পান এবং অনুবাদকে করে তোলেন অপ্রিয় এবং আমাদের সাহিত্য-জগৎকে করেছেন অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আমাদের অনুবাদ সাহিত্যের আরেকটা বিপজ্জনক সীমাবদ্ধতা হচ্ছে অনুবাদকদের ভাষাজ্ঞান। না, একটু পূর্বে ভাষাজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে যে আলোচনা করেছি আবার তার পুনরাবৃত্তি করব না। এই সীমাবদ্ধতা ভাষার সংখ্যার। এখানে যা কিছু অনুবাদ হয় তার প্রায় সবটুকুই ইংরেজি থেকে। আমাদের দেশে ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা-জানা লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। দু-চারজনে যাও-বা ইংরেজি ছাড়া অন্য দুয়েকটি ভাষা জানেন তাঁদেরও সম্ভবত সাহিত্যিক কোনো আগ্রহ না থাকায় কাউকেই সাহিত্য অনুবাদে নিয়োজিত হতে দেখা যায় না। পার্শ্ববর্তী পশ্চিম বাংলার সাথে তুলনা করলেও এ ব্যাপারে আমরা লজ্জাজনকভাবে পিছিয়ে আছি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে।

অনুবাদ বলতে এতক্ষণ আমরা মূলত সৃজনশীল বিদেশি সাহিত্যের বাংলায় অনুবাদের কথা বলেছি; কিন্তু প্রবন্ধ-নিবন্ধ কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিদেশি বইগুলোরও ব্যাপকহারে বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। সে ব্যাপারে বাংলা একাডেমির মতো একটি প্রতিষ্ঠান যে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই নগণ্য। নিষ্পাপ আকাঙ্ক্ষার সরল প্রকাশে যদি কোনো সমস্যার সমাধান হত তাহলে সহজেই বলে দেয়া যেত যে প্রাগুক্ত

সমস্যাগুলো অবিলম্বে দূর করলেই অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তরণ ঘটবে এক আলোকিত জগতে। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজ নয়। বিশ্বায়ন ও বিরাষ্ট্রীয়করণের এই জোরালো জোয়ারের মুখে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের সুপারিশের ক্ষুদ্র তরী হালে তেমন একটা পানি না-ও পেতে পারে। কিন্তু ব্যাপক অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের এই দেশে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, আমার ধারণা, অগ্রণী ভূমিকা রাষ্ট্রকেই পালন করতে হবে। ভর্তুকি দিয়ে হোক কিংবা সরাসরি প্রকাশনার কাজ হাতে নিয়েই হোক, সুযোগ্য অনুবাদকদের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বই বাংলায় অনুবাদ করিয়ে তা পাঠকের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে জোরে-শোরে এগিয়ে আসতে হবে বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠানকেই। দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে এটি লাভজনক উদ্যোগে পরিণত হতে পারে অচিরেই। বাংলা একাডেমি এখন যে একেবারেই কিছু করছে না তা নয়। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য এবং সে বিষয়ে অদক্ষতা ও আমলাতান্ত্রিকতার অভিযোগ ব্যাপক। গভীর আত্ম-অনুসন্ধানের ব্যবস্থা নিতে পারে বাংলা একাডেমি এ ব্যাপারে। প্রশাসনিক আধুনিকায়নের মাধ্যমে অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারলে একাডেমি ব্যক্তিমালিকাধীন অনুগামী পেতে পারে যথেষ্ট। সামান্য ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এমন একটি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলা একাডেমি অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের দুঃখজনক বন্ধ্যাত্ব মোচনে এক সফল অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আরেকটি বিষয়ে আমাদের এখন গভীর মনোযোগ দেয়ার সময় এসেছে বলে আমার বিশ্বাস। অনুবাদ সাহিত্যের কথা যখনই আমরা আলাপ করি তখনই মনে মনে ধরে নেই বিদেশি, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদের প্রসঙ্গটি। কিন্তু এর একটি উল্টো স্রোতও হতে পারে এবং আমি মনে করি, অবশ্যই তা হওয়া উচিত। যশোকামী যত আত্মসমালোচনাই করি-না কেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্য একেবারে খেলো নয়। পৃথিবীর সেরা সাহিত্যসমূহের দিগ্বিজয়ী সব সাহিত্যগ্রন্থের তুলনায় সৃজনশীল সাহিত্য বাংলাদেশে তেমন হয়তো একটা লেখা হয়নি এখনো, তবুও আমাদের ছোটগল্প, বেশ কিছু উপন্যাস, প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং বেশ কিছু কবিতা আন্তর্জাতিক মাপে অবশ্যই মানোত্তীর্ণ। কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে বহির্জগতে এর প্রবেশ প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ, বহির্জগতে সাহিত্য-বিশ্বে আমরা শুধু অধমর্ণ হয়েই থাকব, উত্তমর্ণ হব না কখনো তা কি সম্মানজনক? বাংলাদেশে বিদেশি, বিশেষত ইংরেজিতে, অনুবাদও কিছু কিছু হয় অবশ্যই। এক শ্রেণির সাহিত্য ও

কাব্য-যশোপ্রার্থী বই লিখে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে খুব ব্যয়বহুল করে ছাপিয়ে নেন। নিন্দুকেরা যদিও বলে যে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাবার জন্যই তাঁরা এমন করে থাকেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় যে অবাঙালি ও বহির্বিশ্বের পাঠকের কাছে পরিচিতি লাভের প্রচেষ্টা থেকেই অনুবাদের তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল এই কাজটি তারা করেন। বাংলা একাডেমিও সৃজনশীল বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু নির্বাচিত বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ মাঝে মাঝে করিয়ে থাকে। এই অনুবাদ সব ক্ষেত্রেই যে খুব মানসম্পন্ন হয় তা নয়, তবে

মোটামুটি মান এই সবগুলো অনুবাদেরই আছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের বইগুলোর বিপণন আরো মারাত্মক সীমাবদ্ধতার শিকার। সারা পৃথিবীর ইংরেজি অনুবাদের বাজারে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে লন্ডন ও নিউইয়র্ক। বইয়ের গুণগত মান যাই হোক, ঐ দুই শহরের কোনো প্রকাশক তা প্রকাশ করলে বিশ্বব্যাপী তা পৌঁছে যাবেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি দেশের কোনো লেখকের ঐ সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই সীমিত। বাংলা একাডেমি যে সমস্ত বাংলা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ করায় তার বাজার যে কোথায় সে সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এ ব্যাপারে পেঙ্গুইন ও অন্যান্য কতিপয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলা একাডেমি এই দিকটি আংশিক হলেও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

একটি সমাজ যখন অনুন্নত তখন তার প্রায় সবগুলো দিকই অনুন্নত থাকে। অর্থনীতির দারিদ্যের দুষ্ট চক্র তত্ত্বের প্রয়োগ সাহিত্য-বিশ্বেও সমানভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হয়। ব্যাপক অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের কারণে গণজীবনের অন্যান্য অনেক দিকের মতো আমাদের সাহিত্যিক দিকও অনুন্নত। অনুবাদের বাজার মূলধারার সাহিত্যের চেয়ে পৃথিবীর সব দেশেই ক্ষীণস্রোতা। বাংলা সাহিত্যে এটি সহজবোধ্য কারণেই অতিশয় সংকীর্ণ-প্রবাহী। এই ধারাটিকে অধিকতর বেগবতী করে বর্তমানে বিশ্বপ্লাবী অনুবাদের মূল ধারার সাথে সংযোগ ঘটিয়ে, দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে/যাবে না ফিরে'র অবস্থায় আমাদের সাহিত্যের উত্তরণ ঘটাতে এগিয়ে আসতে হবে আমাদেরকেই। অন্য কেউ আমাদের জন্য এ কাজ করে দেবে না। উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো সাহিত্য সাময়িকীই আমাদের দেশে নেই, শুধু অনুবাদ নিয়ে সাময়িকী তো দূরের কথা। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সাহিত্যপ্রেমীদেরকেই। সুখের কথা এমন দুয়েক জনকে এখন পাওয়া যাচ্ছে যারা এমন উদ্যোগের কথা ভাবছেন সক্রিয়ভাবেই।

ক্ষীণবল ব্যক্তিমালিকানাধীন কিছু কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের প্রধান প্রধান বইগুলো ছাপাবার কথা ভাবছে, এবং কেউ কেউ তেমন বেশ কিছু বই ইতোমধ্যে ছাপিয়েছেনও। এটি নিঃসন্দেহে আনন্দের সংবাদ। কিন্তু খানিকটা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এবং অনেকটা অসাধু ব্যবসায়িক রীতির কারণে এই প্রকাশকদের অনেকেই অনুবাদকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করেন। ফলে যোগ্যতাসম্পন্ন অনুবাদকগণ দুয়েকটি কাজের পর এ ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, এর পর মাঠে নামেন অনুবাদ-যশোপ্রার্থীরা যাঁদের অধিকাংশেরই যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

এঁদের অনেকে পারিশ্রমিক তো দাবি করেনই না, বরঞ্চ নিজের খরচে (প্রকাশকের লভ্যাংশসহ) বই প্রকাশ করেন তাঁরা এবং অনুবাদকে ক্রমাগত করে তোলেন অপাঠ্য। এঁদের হাত থেকে অনুবাদ সাহিত্যকে রক্ষা করার জন্য লেখক-প্রকাশক সকলকেই নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে।

পরিশেষে, আবারো আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে বর্তমান সাহিত্য-বিশ্বে অনুবাদের স্থান

কোনো মতেই ছোট করে দেখার উপায় নেই। নিজেদেরকে বিশ্বসাহিত্যের মুখরিত অঙ্গন থেকে সরিয়ে নিয়ে কূপমণ্ডূকতার ক্ষুদ্র অন্ধকার কোণে বসে স্রেফ আমাদের চটুল সাহিত্য নিয়ে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলা থেকে যদি আমরা বেরিয়ে আসতে চাই এবং চাই বহির্জগতেও আমাদেরকে পরিচিত করতে তাহলে দ্বিপথী অনুবাদ ছাড়া আর কোনো পথ আমাদের সামনে নেই। এই পথকে নিষ্কণ্টক ও মসৃণ করে উচ্চতর গতি সঞ্চার করে এগিয়ে চলার কাজ সাহিত্যপ্রেমীদেরই শুরু করতে হবে এবং তা শুরু করতে হবে এখনই।

সংগ্রহসূত্র: বই: একুশের প্রবন্ধ ২০০১। প্রকাশক: বাংলা একাডেমি। প্রকাশকাল: জৈষ্ঠ্য ১৪০৮/ জুন ২০০১।]

[লেখক: অনুবাদ শিল্পী। প্রাক্তন কাস্টমস কর্মকর্তা।]

অনুবাদ চর্চা ও বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য

আ হ মে দ মা ও লা

তথ্য-প্রযুক্তির বিস্ফোরণের এ যুগে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পল্লবিত সব শাখার খোঁজ-খবর রাখা, দেখা, বোঝার জন্য অনুবাদের বিকল্প সড়ক আছে বলে আমার জানা নেই। অনুবাদ মানে কেবল ভাষান্তর নয়, এক ভাষার ভাব-সম্পদ অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করাও। মানুষের সাথে মানুষের, ভাষার সাথে ভাষার, হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের অকৃত্রিম সেতুবন্ধন রচনার মাধ্যম হিসেবে অনুবাদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। যদিও অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যের রসাস্বাদন কতটা নির্ভরযোগ্য, তা নিয়ে নানা মতভেদ, মতান্তর, বিদ্রূপময় তামাশারও অন্ত নেই।

যেমন একটি লাতিন প্রবাদে আছে– 'অনুবাদ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক'। কবি রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন– 'বিদেশি ভাষার কাব্যিক অনুবাদ পড়ে পাঠকের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা ষোলআনা।' কেউ বলেন 'অনুবাদে মূল লেখক আড়ালেই থেকে যান।' আরো মজার তথ্য হচ্ছে, 'সবচেয়ে ভালো অনুবাদ নাকি প্রায়শ ভুল অনুবাদ।' অনুবাদের দুটো ভিন্ন ধারা রয়েছে– সেটাফ্রেস্টিক ও প্যারাফ্রেস্টিক অর্থাৎ মূলানুগ অনুবাদ ও স্বাধীন অনুবাদ। তবু একথা সত্যি যে, অনুবাদই বিশ্বসাহিত্যের একমাত্র ভাষা। অনুবাদের শরণ না নিলে দুনিয়ার সব ভাষার ধ্রুপদী সাহিত্য আমাদের অপঠিতই থেকে যেত। কথিত আছে, কবি গ্যায়েটে কালিদাসের 'শকুন্তলা' পড়ে কৈশোরের ফুল ও পরিণত বয়সের ফল একসঙ্গে পেয়েছিলেন, সেটা ছিল কেবল অনুবাদ নয়, অনুবাদের অনুবাদ। 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া আর অনুবাদ পড়া নাকি সমান কথা,' ব্যাপারটা এরকম হলেও বাংলা ভাষায় যাঁরা বিশ্বসাহিত্য চর্চা করেন, তাঁদের কাছে অনুবাদই একমাত্র ভরসা। কারণ সাহিত্য-উৎসাহীদের কাছে অনুবাদ অনেকটা প্রেমিকার সঙ্গে দ্বন্দ্বময় ভালোবাসা চালিয়ে যেতে হয়।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধারা শুরু হয়েছিল মধ্যযুগে। সে ধারা বর্তমানে পুষ্পপল্লবে, ফসলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। অতীত ও বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিরাট একটি অংশ অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সমকালীন ইউরোপীয় ভাষাগুলোর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম, তত্ত্ব– বিশ্বের নানা চিন্তা, তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে এখন বাংলা ভাষায় অনায়াস লভ্য। প্রতিবছর বুকার পুরস্কার, নোবেল পুরস্কারসহ বেস্ট সেলার সব বই অনূদিত হয়ে বাজারে আসছে প্রায় সাথে সাথেই। এটা খুবই ইতিবাচক লক্ষণই বলতে হবে।

বিভাগোত্তর বাংলাদেশে অনুবাদের একটি সমৃদ্ধ ধারা পরিলক্ষিত হয়। মনস্বী নাট্যকার শহীদ মুনীর চৌধুরী এক্ষেত্রে পথিকৃৎ হয়ে আছেন। স্বল্প সময়ে অনেক মেধাবী কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। যেমন, জর্জ বার্নাড'শ রূপান্তরিত নাটক 'কেউ কিছু বলতে পারে না', জন গলওয়ার্দির'রুপার কৌটা' শেক্সপিয়রের 'টেশিং অব দি শ্রু' অবলম্বনে 'মুখরা রমণী বশীকরণ', 'ওথেলো'। সরদার ফজলুল করিমের 'প্লেটোর রিপাবলিক', 'প্লেটোর সংলাপ', 'অ্যান্টিডুরিং', রুশো'র 'স্যোসাল কটাক্ট'। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'অ্যারিস্টোটলের সাহিত্যতত্ত্ব'। আহমদ ছফা'র 'ফাউস্ট', বার্ট্রান্ড রাসেলের, 'সংশয়ী রচনাবলী' মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বার্ট্রান্ড রাসেলের অনুবাদ 'সুখ'। সৈয়দ আলী আহসানের অনুবাদ সফোক্লিসের 'ইডিপাস', 'হুইটম্যানের কবিতা', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'অ্যারিস্টোটলের কাব্যতত্ত্ব', ইবসেনের 'বুনোহাঁস' সুব্রত বড়ুয়ার, 'এমিল ও গোয়েন্দা বাহিনী' 'শঙ্খচিল' শামসুর রাহমানকৃত হ্যামলেট অনুবাদ, 'ডেনমার্কের যুবরাজ' 'রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা'। কবীর চৌধুরী বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। স্বল্প পরিসরে তাঁর অনূদিত গ্রন্থের তালিকা দেয়া সম্ভব নয়। কয়েকটি উল্লেখ করছি মাত্র, 'শেখভের গল্প', 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ওল্ডম্যান এন্ড দ্য সি', 'চুম্বন', 'প্রেম ও কলেরা'। 'কাফকা'র নির্বাচিত গল্প' 'নেটিভ সান' 'পাঁচটি একাঙ্কিকা' 'বেকেটের তিনটি নাটক' ইত্যাদি। কবীর চৌধুরী

মূলানুগ অনুবাদে সিদ্ধহস্ত। বাঙালি পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করেছে বিশ্বসাহিত্যের বিশাল এক ভাণ্ডার।

স্বাধীনতা-উত্তর সমকালীন বাংলাদেশে অনুবাদ চর্চায় যাঁরা নিয়মিত-অনিয়মিতভাবে অবদান রেখে চলছেন, তাঁদের মধ্যে আলম খোরশেদ 'যাদুবাস্তবতা গাথা:ল্যাতিন আমেরিকার গল্প', আলী আনোয়ার 'অনিকেত বেদনা', 'খোঁজা' খায়রুল আলম সবুজের 'গাঙচিল', 'আন্তিগোনে', 'নোরা' খোন্দকার আশরাফ হোসেনের 'টেরি ঈগলটন সাহিত্যতত্ত্ব', 'রাজা ঈদিপাস', 'পাউল সেলানের কবিতা' জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর 'শেক্সপিয়রের সনেট', 'অ্যারিওপাজিটিকা', 'টেমপেস্ট' কাওসার হুসাইনের 'ইতালো কালভিনের গল্প', 'বেকনের প্রবন্ধ' বদিউর রহমানের 'অ্যারিস্টোটলের পোয়েটিকস', 'ধ্রুপদী সাহিত্যতত্ত্ব', র‍্যালফ ফক্স 'উপন্যাস ও জনগণ', মুহাম্মদ নুরুল হুদার 'আগামেনন', 'নীল সমুদ্রের ঝড়', মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ 'তিনটি ফরাসি প্রবন্ধ', 'মাছি', শফি আহমেদের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড', 'প্লেটোর শেষ দিনগুলি', 'দ্য লায়ন এ্যান্ড দ্য জুয়েল', সৈয়দ শামসুল হকের 'ম্যাকবেথ', 'ত্রয়লাস' ও 'ক্রেসিদা', 'টেম্পেস্ট'। তাঁর অনুবাদে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রয়েছে। সমকালীন বিশ্বসাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদে যাঁরা নিরন্তর সচেষ্ট রয়েছেন, তাঁরা হলেন– খালেকুজ্জামান ইলিয়াছ 'মিথের শক্তি', 'পেয়ারার সুবাস', ফজলে রাব্বি অনূদিত চিনোয়া আচেবের 'থিংস ফল এপার্ট', উর্দু সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য অনুবাদক জাফর আলম, জি এইচ হাবীব গার্সিয়া মার্কেসের 'নিঃসঙ্গতার একশ বছর', 'সোফির জগৎ', 'পরদেশী গল্প', আসোস টুটুলার 'তাড়িখোর', আইজাক অসিমভের 'ফাউন্ডেশন', শওকত হোসেন, রাজু আলাউদ্দিন, রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী, তিনি 'সিন্দাবাদ' নামে একটি অনুবাদ পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। গার্সিয়া মার্কোজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ করেছেন অদিতি ফাল্গুনী 'গাত্রপিতার হোমন্ত' নামে।

'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিচউড' নামে মার্কোজের নোবেল পুরস্কার পাওয়া বইটি বেশ কয়েকজন অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শাহাবুদ্দিন ভূঁইয়া, প্রমিত হোসেন, জি. এইচ. হাবীব অন্যতম। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু অনুবাদের ক্ষেত্রে নিবেদিতপ্রাণ একজন কর্মী। তাঁর অনুবাদে বেরিয়েছে খুশবন্ত সিংয়ের 'অবিস্মরণীয় নারী', 'ট্রেন টু দিল্লি', 'ওরিয়েনা ফালাসির', 'সাক্ষাৎকার' ইত্যাদি। দরবেশ আলী খান অনূদিত টমাস মোরের 'ইউটোপিয়া', 'সালাহউদ্দিন আইয়ূবের 'আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা' 'সংস্কৃতি জিজ্ঞাসা' ফয়েজ আলমের অনুবাদে এডওয়ার্ড

সাঈদের 'ওরিয়েন্টালিজম' সাঈদের 'রিপ্রেজেন্টেশনস অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল' অনুবাদ করেছেন দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু ও মাহবুবা নাসরীন।

সম্প্রতি মাসরুর আরেফিন 'কাফকা সমগ্র' অনুবাদ করে বেশ সাড়া ফেলেছেন। ফারুক মঈনুদ্দিন অনুবাদ করেছেন ক্লিন্টন বি সিলি'র জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যিক জীবন 'আ পয়েট অ্যাপার্ট'– অনন্য জীবনানন্দ। এছাড়া মাসিক, দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রতিদিনই অনুবাদ হচ্ছে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের গল্প, কবিতা, উপন্যাস। বিশেষত, ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যের

বর্তমানে বাংলাদেশে বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে। অনুবাদ ছাড়া অন্য ভাষার মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়। অনুবাদের জানালা চারিদিক থেকে খুলে দেয়া দরকার। এজন্য শুধু বাংলা একাডেমির ওপর নির্ভর করলে চলবে না। অন্যান্য সংস্থা, প্রকাশকদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের দরকার দক্ষ একদল অনুবাদক, যাঁদের

হাত ধরে বিশ্বসাহিত্যের বাঙ্ময় ভুবনে বিচরণ করবে বাঙালি লেখক-পাঠক। আবার বাংলা ভাষার মহৎ রচনাগুলোও যেন ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের বাঙালি অনুবাদকদেরই। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন কিন্তু ইংরেজি অনুবাদের জন্যই। অনুবাদের ভালো-মন্দ বিচার করবে মহাকাল। সমকালের পাঠকের প্রত্যাশা, অনুবাদের এই কল্লোলিত ধারা প্রবহমান থাকুক, জয়তু অনুবাদক।

[লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।]

বাংলাদেশে অনুবাদ চর্চা

শা হ্ আ ল ম সা রো য়া র

বিশ্ব-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সকল মানুষের মনোজগতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের স্রোত সেই পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হচ্ছে। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক আজ চরম বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিশ্ব-পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সারা- পৃথিবীকে ভোগসর্বস্ব এককেন্দ্রিক গ্রহে পরিণত করেছে। সারা পৃথিবীতেই মৌলিক চিন্তাচর্চার জায়গাটি সংকুচিত হয়ে এসেছে। একটা সময়ে দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, রাষ্ট্রচিন্তকদের বিশ্বজুড়ে নাম শোনা যেত। এখন আর সেরকম শোনা যায় না। অর্থাৎ সারা

পৃথিবীতেই সৃজন ও মনন চর্চার ধারা মন্থর হয়ে এসেছে। সেদিক থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, পৃথিবী জুড়ে বই পঠন-পাঠন কমেছে, আর বাংলাদেশেও একই বাস্তবতা বিরাজমান।

বই প্রকাশ একটি ব্যবসায় প্রক্রিয়া, এখানে মুনাফা কতটা হল কিংবা আসলেই হল কিনা, সেটি একটি গুরুতর বিষয়। অনুবাদকৃত বই কতটা বিক্রি হল তার ওপর নির্ভর করে প্রকাশক কতটা মুনাফা করতে পারবেন, যে কথা মৌলিক বইয়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অনুবাদের সঙ্গে যিনি বা যাঁরা যুক্ত, তাঁদের প্রতি প্রকাশকের অন্তত আর্থিকভাবে মনোযোগী হওয়ার বিষয়টি অনেকটাই ওই বিক্রির ওপর নির্ভরশীল। যদি তাই হয়, তবে অনুবাদ বা মৌলিক বইয়ের পঠন-পাঠন বাড়ানোই হবে প্রথম কাজ। সে ক্ষেত্রে সাধারণত ক্রেতা-পাঠকের আগ্রহ অনুবাদ বইয়ের প্রতি মৌলিক বইয়ের তুলনায় কম থাকে, কেননা ভিন্ন একটি ভাষা থেকে আরেক ভাষায় বিষয়টি তুলে আনার সময় অনেক ক্ষেত্রেই ভাষাগত সংকট লক্ষ করা যায়। অনুবাদে বিষয়কে কতটা তুলে আনা গেল, সে ব্যাপারেও পাঠকের সন্দেহ থাকা অস্বাভাবিক নয়– ফলে মৌলিক বইয়ের তুলনায় অনুবাদের বইয়ের প্রতি পাঠকের আবেদন সবসময় না হলেও কখনো কখনো কম হয়ে থাকে বলে আমার ধারণা। অনুবাদের মান সে ক্ষেত্রে সত্যিই যদি একটি সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে এই মান উন্নয়নের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই দায়িত্ব নেয়ার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। নতুন নতুন অনুবাদক তৈরি করা, তৈরিকৃত অনুবাদকদের মান উন্নত করা, মান রক্ষার জন্য বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ছাড়া এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। সে ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এখনো তৈরি হয়নি, কারণ এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অতীতে হয়তো সেভাবে সামনে আসেনি। বিখ্যাত অনুবাদকেরাও হয়তো বিষয়টি নিয়ে অতীতে সেভাবে ভাববার প্রয়োজন বোধ করেননি, কারণ তাঁরা হয়তো নিজেদের লেখা নিয়েই ভেবেছিলেন। সামষ্টিকভাবে অনুবাদক-সমাজ তৈরি করবার যে উদ্যোগ সেটি গ্রহণ করবার মতো হয়তো তাঁদের মধ্যে সাংগঠনিক দক্ষতাও সেভাবে ছিল না। তবে এতকাল পরে হলেও আমরা যে ভাবতে পারছি সামগ্রিক একটি প্রয়াসের কথা, সেটি একটি ভালো দিক। এই যে শুরু হয়েছে অনুবাদ জগতের সার্বিক উৎকর্ষের কথা, হয়তো এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে এখান থেকেই ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বড় কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে।

দুই.

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, কেবল ভাষা জানলেই অনুবাদ করা যায় না। সে জন্য নির্দিষ্ট রচনা অনুবাদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুটি ভাষার মধ্য থেকে যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হবে, অনুবাদক সে ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ না হয়ে যে ভাষায় অনুবাদ করা হবে সে-ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ হলে, তার পক্ষে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। এবং সে অনুবাদ তুলনামূলকভাবে পাঠকের কাছে বেশি কমুনিকেটিভ ও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

সার্বিকভাবে অনুবাদশিল্পকে উৎকর্ষের জায়গায় নিতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা দরকার হয়, কিন্তু সেই তৎপরতার জন্য নতুন কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়। সে ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি বা মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মতো যেসব প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে আছে, সেসব প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে সময় ও অর্থের যে ব্যাপার রয়েছে, সে ক্ষেত্রে সেটি আদৌ পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কিনা, পারলেও সেটি কতটা কাল সময় ব্যয় করে হবে, এবং পূর্ণাঙ্গ সরকারি প্রতিষ্ঠান হলে, সেটি আদৌ কোনো কাজ করতে পারবে কি না– এ রকম অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে, যে বিষয়গুলোর জবাব খোঁজ করে দেখাও আজ বড় একটি কাজ হতে পারে। আমার কাছে মনে হয়, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান হলে সেটি কাজ করতে পারার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সফলতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে। প্রতিষ্ঠান সরকারি হলে, নানা কারণে স্থবিরতা নেমে আসতে পারে। সুতরাং আমার মতে পুরোপুরি সরকারি নয় বা পুরোপুরি বেসরকারি নয়, বরং সরকারের সহযোগিতা নিয়ে আধাসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হলে কাজ করবার ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম এসে যায়, সেটি হল, বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমির কাছে স্বাভাবিকভাবেই লেখক সমাজের প্রত্যাশা অনেক বেশি। প্রতিষ্ঠানটি চাইলে অনুবাদের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারত। যেহেতু এখন পর্যন্ত অনুবাদের স্বতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, সে কারণে বাংলা একাডেমিতে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বিভাগ গড়ে উঠতে পারত। যতদূর জানি, সেখানে এখনো অনুবাদের একটি উপবিভাগ রয়েছে। ফলে যে পরিমাণ সক্ষমতা থাকবার কথা তা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রতুল হওয়ার কথা। সুতরাং এ অবস্থায় যা করা যেতে পারে, সেটি হল, কাছাকাছি সময়ের মধ্যে বাংলা একাডেমি একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ খুলতে পারে, যেখানে সক্ষমতা বাড়িয়ে অনুবাদের মান ও পরিমাণের দিকে আরও গতিশীল হতে পারে। আর দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে সরকারের সহযোগিতায় একটি বেসরকারি স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হতে পারে। তবে এটি অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি ও কঠিনতম একটি কাজ। এ রকম উদ্যোগ সরকার নিজের থেকে যেমন নিতে পারে একইভাবে যাঁরা অনুবাদক আছেন, তাঁদেরও যৌথ চেষ্টায় সেটি হতে পারে। তবে আমার ধারণা, বেসরকারিভাবে অনুবাদকদের উদ্যোগে কাজটি হলে সেখান থেকে কাজের যে গতি ও মান আশা করা যাবে, সরাসরি সরকারের উদ্যোগে সেটি হলে সে ধরনের মান ও গতি অক্ষুণ্ন রাখা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে।

[লেখক: প্রাবন্ধিক/ নিবন্ধকার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আইএফআইসি ব্যাংক লি.।]

বাংলাদেশের অনুবাদশিল্পের সম্ভাবনা ও সংকট

নূরকামরুন নাহার

যোগাযোগবিদ মার্শাল ম্যাকলুহান ১৯৬৪ সালে *গ্লোবাল ভিলেজ* শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এই *গ্লোবাল ভিলেজ* বিশ্বের সকল মানুষকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। মানুষের চিন্তার জগৎ নিজ এবং নিজের জগৎ ছাড়িয়ে ক্রমেই বিশ্বমুখী হয়ে পড়েছে। মানুষ এখন মূলত বিশ্বনাগরিক। সে যেমন জানতে চায় নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, তেমনি তার জানার কৌতূহল পৃথিবীর ওই প্রান্তের মানুষের জীবন আর জীবনভাবনা সম্পর্কে। মানুষ এখন জানতে চায় কী ঘটছে তার চারপাশে, কিভাবে ভাবছে দূরের দেশের মানুষটি, কেমন তার জগৎ দেখার দর্শন। অন্য জীবন এবং অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে চাওয়ার এই প্রবল আকুতির প্রথম প্রতিবন্ধকতাই হল ভাষা। পৃথিবীতে মোট ভাষার সংখ্যা কত এ নিয়ে নানা বিতর্ক না থাকলেও বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে ৭০০০ বা তার অধিক ভাষা রয়েছে। বহু ভাষা বিলুপ্তির পরও ভাষার বৈচিত্র্য এখন বিপুল এবং ব্যাপক। সংগত কারণেই একজন মানুষ অনেক ভাষায় দক্ষ হতে পারেন না। তাই বিভিন্ন ভাষায় রচিত জ্ঞান ও জীবনকে জানার জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয় অনুবাদের ওপর। অনুবাদের প্রতি পাঠকের আগ্রহ চিরন্তন। বর্তমানে ম্যাকলুহানের *গ্লোবাল ভিলেজ* ভিন্ন ভিন্ন জীবন আর পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ধারণা, বোধ ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে জানার আগ্রহকে আরো তীব্র করেছে। এই ক্রমবর্ধমান আগ্রহ অনুবাদের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করেছে। সাহিত্য তো বটেই জ্ঞানের অন্যান্য শাখায়ও সৃষ্টি হয়েছে এই চাহিদা। এই চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বব্যাপী। যার হাওয়া লেগেছে বাংলাদেশে। গত দেড় দশকে অনুবাদ একটা স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে নিজের অস্তিত্বকে জানান দিচ্ছে। ব্যাপক বিষয়ে বের হয়েছে এবং হচ্ছে অনুবাদের নানা বই। সৃষ্টি হয়েছে অনুবাদের একটা বাজার। সাহিত্যের বই থেকে শুরু করে নানা বিষয়ের অনুবাদের বইয়ের একটা পাঠকশ্রেণিও সৃষ্টি হয়েছে। অনুবাদের এই চাহিদা এবং ব্যাপক অনুবাদের পরেও বাংলাদেশের অনুবাদশিল্প দৃঢ় কোনো ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি।

অনুবাদ হচ্ছে নানা বই। বিশেষ করে বেস্ট সেলার বইগুলো অনুবাদ হয়ে দ্রুত বাজারে চলে আসছে। অনূদিত বইগুলোর প্রতি প্রকাশকের আগ্রহ আছে, পাঠকের আগ্রহ আছে তাই অনুবাদের প্রতি আগ্রহ বোধ করছেন অনুবাদকেরা। চাহিদা, পাঠক, প্রকাশক এবং অনুবাদক– এই চারটি ইতিবাচক বিষয় থাকার পরেও অনুবাদশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নানা সংকট ও

সমস্যা। প্রথমত, চাহিদার ফলে বাজারে যত দ্রুত অনুবাদ বই চলে আসছে কিন্তু সেভাবে অনুবাদের মান সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই মানসম্পন্ন অনুবাদ হচ্ছে না।
দ্বিতীয়ত, অনুবাদশিল্পীরা যথার্থ সম্মানী এবং সম্মান পাচ্ছেন না এ বিষয় নিয়ে হতাশার জায়গা তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি অভিযোগ উঠেছে যে অনুবাদকেরা নানাভাবে প্রতারিত হচ্ছেন প্রকাশক কর্তৃক। তৃতীয়ত, অনুবাদের চাহিদা তৈরি হবার সাথে সাথে বাজারে রাতারাতি কিছু অনুবাদক আমদানি হয়েছে যাঁদের অনুবাদের যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ।
চতুর্থত, শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকাশকগণ অনুবাদকদের দিয়ে কিছু বই যেনতেন ভাবে অনুবাদ করিয়ে নিচ্ছেন।
পঞ্চমত, অভিযোগ উঠেছে যে কোনো কোনো অনুবাদক অন্যের অনুবাদ চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছেন।
ষষ্ঠত, প্রকাশকদের পুঁজিবাদী চরিত্র ও বাণিজ্যিক মুনাফার কারণে অনেক ভালো বই অনুবাদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনুবাদকেরা অনুবাদ করছেন না। কারণ ওই সকল বই প্রকাশকেরা প্রকাশ করতে আগ্রহী নন।

নব্য অনুবাদক অনেকের অনুবাদ মানসম্পন্ন তো নয়ই বরং তাঁদের এই অনুবাদে মূল টেক্সট বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অনুবাদক মূল টেক্সট-এর অনেক অংশ বাদ দিয়ে অনুবাদ করছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল বইয়ের মূল লেখার ভাব সংরক্ষণের যে বিশেষ সতর্কতা সেটা তো তাঁরা রক্ষা করছেনই না বরং অনেক ক্ষেত্রেই এসকল অনুবাদক গুগল অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে অনুবাদ করছেন– যা একেবারেই অপাঠ্য। তাই পাঠকরাও প্রতারিত হচ্ছেন।

বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য এবং অনুবাদ সাহিত্যের এইসব সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন অনুবাদশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক ও প্রকাশকগণ–

জি. এইচ. হাবীব
সহযোগী অধ্যাপক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইংরেজি বিভাগ
অনুবাদক, শিক্ষক
উল্লেখযোগ্য অনুবাদ– ইয়েস্তাইন গোর্ডার-এর সোফির জগৎ, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর নিঃসঙ্গতার একশ বছর।

আপনি তো অনুবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন, এই জায়গাটির সম্ভাবনা কতটুকু দেখছেন?
অনুবাদের বিষয়ে যে কথাটা প্রথমেই বলতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের দেশে অনুবাদকে হীন করে দেখা হয়। অনুবাদ যথার্থ মূল্যায়ন পায় না। এই কাজটি এমনকি যারা ইংরেজির ছাত্র তারাও খুব

একটা মূল্যায়ন করে না। মৌলিক কাজকে যেমন সম্মানের চোখে দেখা হয় সেভাবে এটাকে সম্মান দেয়া হয় না। কিন্তু তারপরও বলব অনুবাদের বাজার কিন্তু রয়েছে, কারণ বিশ্বসাহিত্যকে জানতে হলে অনুবাদের কোনো বিকল্প নেই। আপনি কতগুলো ভাষা জানতে পারবেন? সুতরাং বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ আপনাকে নিতেই হবে। তাই অনুবাদের প্রতি আগ্রহ দেখা যায়। অনুবাদের বই বিক্রিও হয়। সুতরাং একটা সম্ভাবনার জায়গা তো অবশ্যই আছে। তবে সেই জায়গাটাকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা সেভাবে জায়গাটিকে কাজে লাগাতে পারিনি।

দীর্ঘদিন অনুবাদ কাজের সাথে আপনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনুবাদ করতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন?

অনুবাদ করতে গিয়ে ব্যাপক সমস্যা হয়েছে বা ব্যাপক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি এমনটা বলব না। তবে একটু আগেই যেটা বলছিলাম– অনুবাদকে একপ্রকার হীন করে দেখা হয়– এটা অবশ্যই একজন অনুবাদকের জন্য একটা সমস্যা। অনুবাদকের মনের ওপর এটি প্রভাব ফেলে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি যে সমস্যাটি বোধ করি সেটা হচ্ছে পরিভাষার সমস্যা। অনেক শব্দের ঠিক অনুবাদ করা যায় না। পরিভাষা পাওয়া যায় না। কিন্তু অনুবাদ তো করতেই হবে। শব্দও নিতে হবে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন– 'ভাষার গাড়িটাকে যদি চলতে না দেন তবে চলবে কী করে?' তাই ভাষার, গাড়িটাকে চলতে দিতে হবে। আর শব্দও গ্রহণ করতে হবে। একসময় ইংরেজি ভাষাকেও কিন্তু বর্বর ভাষা বলা হত। কারণ তখন ল্যাটিন ব্যবহৃত হত এবং অনেক শব্দের ইংরেজি শব্দ ছিল না। ইংরেজি ভাষা নানা ভাষা থেকে ব্যাপক শব্দ গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। তারা এভাবে শব্দ গ্রহণ করে ভাষাটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু শব্দ গ্রহণই করেনি তারা সেটাকে তাদের মতো করে গড়ে নিয়েছে। আর শব্দ কিন্তু ব্যবহারে ব্যবহারেই তৈরি হয়। প্রতিশব্দও তাই। সব শব্দ কিন্তু মানুষ গ্রহণ করেও না। কোনো কোনোটা গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চলচ্চিত্রের প্রতিশব্দ ছায়াবাণী, রূপবাণী করেছিলেন। সেটা কিন্তু গৃহীত হয়নি তেমনভাবে– আমরা কিন্তু চলচ্চিত্রটাই ভালোভাবে গ্রহণ করেছি।

তাই বলা যায় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে –

১ পরিভাষাগত আর

২ ভাষার সংস্কৃতি।

কারণ একটা ভাষার সাথে অনেক কিছু জড়িত থাকে। আর একটা সমস্যার কথা বলা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কী অনুবাদ হচ্ছে তার কোনো ডাটা বেইজ নেই। তাই কোনটা করা হয়েছে তা জানা যায় না। একই বই তাই দুই- তিনজন করেছে– এমনও হচ্ছে। এটা না করলেই ভালো। কারণ আপনাকে তো বাজারের কথাও মনে রাখতে হবে।

অনুবাদক বা যাঁরা অনুবাদ করছেন তাঁরা অনুবাদের সম্মানী নিয়ে হতাশার কথা বলেন– এ বিষয়ে আপনার কী মত?

অনুবাদের সম্মানী নিয়ে হতাশা তো আছেই তবে এটাও অনেকে বলে থাকেন বাজারে যারা সম্মানী পায় তাদের মধ্যে অনুবাদকেরাই পায়। অর্থাৎ অন্য লেখার জন্য আরো কম সম্মানী পাওয়া যায়। আমি যখন অনুবাদ শুরু করি ধরেন সেই '৮৮ সালে যখন শার্লক হোমস অনুবাদ করেছিলাম আমি কিন্তু ভালো টাকাই পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা হচ্ছে আপনি কত বই ছাপাচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করে। এখন যদি প্রকাশক ১০০০ বা ৫০০ কপি বই ছাপায় তাহলে সে নিজেই কী ব্যবসা করবে আর আপনাকেই-বা কী দেবে? বই অবশ্যই বেশি প্রকাশ করা প্রয়োজন, এখন বই বেশি প্রকাশ করতে হলে বই তো বিক্রি হতে হবে। সেজন্য আমাদের লাইব্রেরি সিস্টেম আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন। সারা দেশে প্রচুর লাইব্রেরি আছে– এর মধ্যে সরকারি নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি নানা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব লাইব্রেরিতে যদি ভালো অনুবাদের বই কেনা হয় তাহলে একজন প্রকাশকের ৩০০০ থেকে ৫০০০ বা তার বেশি বই প্রকাশ করাও কোনো সমস্যাই নয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ভালো বই কেনা হচ্ছে না। নানাভাবে নিম্নমানের বই কেনা হচ্ছে। বই কেনায় কোনো শৃঙ্খলাও নেই।

আর একটা বিষয় হল 'সন্দেশ' নামে একটি প্রকাশনা অনুবাদকদের সাথে প্রতারণা করেছে। আমিও তার শিকার হয়েছি। এগুলো অনুবাদকের সম্মানীর ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে।

অনুবাদের মান নিয়ে বেশ অসন্তোষ আর অতৃপ্তির জায়গা রয়েছে পাঠকদের মধ্যে। বলা হচ্ছে ভালো অনুবাদ তো হচ্ছেই না কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল টেক্সট থেকে বাদ দিয়ে অনুবাদ হচ্ছে – এ সে বিষয়ে যদি কিছু বলেন – অনুবাদের মান খুব একটা ভালো হচ্ছে না এটা স্বীকার করতেই হবে। এবং এ ক্ষেত্রে ফিকশনের চেয়ে নন-ফিকশনের অবস্থা আরো বেশি খারাপ। একটু আগেই সম্মানীর কথা বলেছিলাম। এখানে এটা আবার বলতে চাই যে অনুবাদ করে যে সম্মানী পাওয়া যায় সেটা কিন্তু অনেক কম। এখন আপনি যদি এনজিও'র কিছু অনুবাদ করেন, বা ওই সময়টা অন্য কোনো কাজে দেন তাহলে অনুবাদ করে যা পাচ্ছেন তার চেয়ে অনেক বেশি পাবেন। তাহলে আপনি অনুবাদে খুব সময় দেবেন কেন? সেজন্য অনুবাদে খুব বেশি সময় দেয়া হচ্ছে না। ফলে অনুবাদের মান পড়ে যাচ্ছে। বিখ্যাত বইগুলো অনুবাদ করা হচ্ছে কারণ অনুবাদের চাহিদা আছে। কিন্তু সেগুলো খুব কম সময়ে করা হচ্ছে। সেভাবে মনোযোগ দিয়ে করা হচ্ছে না, বই বিক্রি হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে পাঠক অনুযোগ করছে – অনুবাদ ভালো হচ্ছে না।

আর একটা খুব বাজে ট্রেন্ড চলে এসেছে সেটা হচ্ছে। অন্যের অনুবাদও নিজের নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। অনেকে অনুবাদ বই বের করেই খুশি থাকছে, তারা পারিশ্রমিকেরও চিন্তা করছে না। কোনো রকমে একটা বই বের করে ফেলছে। এসব কিছুই অনুবাদের মানে নেতিবাচক প্রভাব রাখছে।

অন্যভাষার বই আমরা বাংলাভাষায় অনুবাদ করছি কিন্তু আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে সেগুলো সেভাবে অনুবাদ তো হচ্ছেই না বলা যায় অনুবাদই হচ্ছে না। বিশ্বের কাছে আমাদের বইগুলোর পরিচিতির জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ খুব প্রয়োজন– কিন্তু সেরকম কোনো উদ্যোগ তো নেই।

আমাদের বই ইংরেজিতে খুব কম অনুবাদ হচ্ছে। এটা খুবই সত্য কথা। এর কারণ হচ্ছে – এখানে ইংরেজিতে অনুবাদ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লোক কম আছে। আমাদের করা ইংরেজি বাইরে সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইংরেজি করতে হলে যারা দীর্ঘদিন বাইরে ইংরেজি চর্চা করছে অথবা নেটিভদের দিয়ে করাতে হবে। সেটার জন্য সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্যোগ না নিলে হবে না। তবে অনুবাদ তো অবশ্যই করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' নামে একটি কোর্স আছে এই 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' আমাদের এই ক্রমবর্ধমান অনুবাদের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারে? অথবা ওই কোর্সটির সম্ভাবনা কেমন মনে করেন?

আমরা যারা ইংরেজিতে পড়েছি তারা কতজন অনুবাদের সাথে আছি? এখন ইংরেজি বিভাগগুলো কী করে? ওখানে ইংরেজিতে ছেলেমেয়েরা পড়ে। তারা কিছু সাহিত্য পড়ে, শেক্সপিয়র পড়ে। কিন্তু তারপর তারা আর কোনো কাজ করে না। আমাদের ভালো টেক্সট নেই, এরিয়া অফ নলেজ তো খুবই দরিদ্র।

এখন 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' যারা পড়ছে তারা অনুবাদের সাথে কতটুকু থাকছে? ওখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা অনুবাদ করতে হয়। কোর্সের অংশ সেটা। সেটা কি খুব মনোযোগের সাথে করা হচ্ছে। নাকি শুধু পাশের জন্য করা হচ্ছে। আমরা তো এখন আর টেক্সট পড়ি না, শিট পড়ি। তাহলে আমরা কতটুকু করতে পারব? আর এই কোর্স পড়ে পরে কি তাঁরা অনুবাদের সাথে থাকছেন?

তবে এটা ঠিক যে ট্রান্সলেশন স্টাডিজ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ তো দরকার। যাঁরা অনুবাদ করছেন তাঁরা তো অনুবাদ করছেন কিন্তু তাঁরা যদি টেকনিকগুলো জানেন তাহলে অনুবাদ নিশ্চয়ই আরো ভালো হবে। অনুবাদের মর্যাদাটা বাড়ানো দরকার। একটা বিষয় কিন্তু এই যে আমরা সব সময়ই অনুবাদের মধ্যেই আছি। আমি আপনাকে সাহিত্য-ইতিহাস-ভাষা সম্পর্কে যাই বলি-না কেন। আপনি তো আপনার অভিজ্ঞতা আর বোধ দিয়ে সেটা অনুবাদ করেই নিচ্ছেন। আর এখন তো অনুবাদ সবসময়ই হচ্ছে। গুগল অনুবাদ হচ্ছে। বিভিন্ন কনফারেন্সে নানান দেশের নানান বক্তা আর স্কলাররা আসছেন। সেগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে সবার কাছে পৌঁছাচ্ছে। সারা বিশ্বে নানা ধরনের কাজ হচ্ছে। বেশিরভাগ সাহিত্য। তবে নন-ফিকশনের অনুবাদ বাড়ানো দরকার। এসব কিছুর জন্যই প্রশিক্ষণ ভালো কাজ করবে। তাই 'ট্রান্সেলেশন স্টাডিজ' অবশ্যই ভালো ভূমিকা রাখতে পারেবে। যদি আমারা শিক্ষাটাকে কাজে লাগাই।

কিন্তু 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' আপনি ভালোভাবে পড়বেন কখন যখন চাহিদা থাকবে বাজার থাকবে, সেরকম কোনো বাজার কি সৃষ্টি হয়েছে?

অনুবাদের বাজার তো আছেই। আজকাল নানা কারণেও তো অনুবাদ করার প্রয়োজন পড়ছে। তাই বাজার একটা আছে এখন যারা পড়ছে তাদের এটার মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করাতে হবে।

শওকত হোসেন

অনুবাদক, লেখক

উল্লেখযোগ্য কাজ– স্রষ্টার লড়াই–

স্রষ্টার ইতিবৃত্ত– ক্যারেন আর্মস্ট্রং

আপনি তো অনুবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন– এই জায়গাটার সম্ভাবনা কতটুকু দেখছেন?

ভালো সম্ভাবনা। প্রচুর অনুবাদ হচ্ছে, আরো অনেক অনুবাদ আসবে। আমরা যখন সেবায় অনুবাদ করা শুরু করি। তখন তো হাতে গোনা কয়েকজন ছিলাম। এখন তো প্রচুর অনুবাদক এসেছেন। আমার কাছে তো অনুবাদের এই জগৎটাকে বিশাল সম্ভাবনার মনে হচ্ছে। গত ১৫/ ২০ বছরে অনেক অনুবাদক এসেছেন এবং অনেক ভালো অনুবাদ হয়েছে। তবে এই যে এত অনুবাদ হচ্ছে সব ভালো হচ্ছে তা বলা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় এটাও একসময় ঠিক হয়ে যাবে। যাঁরা অনুবাদ করছেন তাঁরাও ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন এবং ভালো অনুবাদ করবেন। টিকে থাকার জন্যই তাঁদের ভালো করতে হবে। আমার তো মনে হয় এই জায়গাটাতে এক সময় প্রতিযোগিতা হবে কত ভালো অনুবাদ করা যায় এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে ভালো অনুবাদ যেমন হবে তেমনি ভালো অনুবাদক সৃষ্টি হবে। আপনি দেখবেন আগে ঈদ সংখ্যায় সেভাবে অনুবাদের কিছু থাকত না এখন কিন্তু প্রতিটি ঈদ সংখ্যায় অনুবাদ থাকছে। একটি তো থাকছেই, কখনও দুটিও থাকছে। তাতে কি বোঝা যাচ্ছে অনুবাদের প্রতি পাঠকের আগ্রহ আর চাহিদা বাড়ছে? এখন অনুবাদের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে কেন? বাড়ছে কারণ হচ্ছে আমাদের নিজস্ব ভালো বইয়ের পরিমাণ কিন্তু কমে গেছে। আমাদের এখানে এখন সৃষ্টি হয়েছে মৌসুমি লেখক। যাঁরা বইমেলার সময় লিখছেন নিজেরাই বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন এবং নিজেরাই বেস্ট সেলার হচ্ছেন। সেজন্য পাঠক ভালো বই পড়ার ক্ষেত্রে অনুবাদের দিকে ঝুঁকছে। পয়সা খরচ করে যে বইটি তারা কিনতে চাচ্ছে সেটি একটি ভালো বই আর সেটির ক্ষেত্রে তারা অনুবাদকে প্রাধান্য দিচ্ছে । পাঠক এখন বিশ্বে কী লেখা হচ্ছে দেখতে চাইছে। আমার পাশের দেশ কী লিখছে। হারুকি মুরাকামির কী লিখছেন, নাগিব কী লিখছেন, এভাবেই অনুবাদের সম্ভাবনা দিন দিন বাড়ছে।

দীর্ঘদিন অনুবাদ কাজের সাথে আপনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত– অনুবাদ করতে গিয়ে কোনো ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন?

ভাষায় রূপান্তরটাই বড় সমস্যা। লেখকের বক্তব্য ধরাটা একটা বড় বিষয়। আর হচ্ছে শব্দ। এক শব্দের নানান রকম ব্যবহার রয়েছে। লেখক কেন এই শব্দটা ব্যবহার করলেন অনুবাদের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বিষয়। সব শব্দের অনুবাদ করা সম্ভবও হয় না। সে ক্ষেত্রে আমরা ভাবানুবাদ করি নানা প্রতিশব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু তারপরেও অনেক সময় নিজেই হয়তো পুরো তৃপ্ত হতে পারি না।

অনুবাদক বা যাঁরা অনুবাদ করছেন তাঁরা অনুবাদের সম্মানী নিয়ে হতাশার কথা বলেন– এ বিষয়ে আপনার কী মত?

সম্মানী এক কথায় খুব কম, খুবই নগণ্য। আমাদের এখানে অনেক প্রকাশক এবং মানুষের ধারণা অনুবাদ একটা হেলা ফেলার বিষয়। একটা বিদেশি বই নিয়ে টেবিলে বসলেই অনুবাদ হয়ে গেল। অনুবাদকে এরকম হেয় করে দেখা হয় বলেই সম্মানীও খুব কম দেয়া হয়। আরো একটা বড় ব্যাপার হল অনেক প্রকাশক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকাই দেন না। এমন তিন-চারটি প্রকাশনী আছে যারা আমাকে দিয়ে আগ্রহ করে বই করিয়েছে। এক-চতুর্থাংশ টাকা দিয়েছে এবং এখন আর আমার ফোনই ধরে না। ব্যাপারটাকে তাঁরা কিছুই মনে করেন না। ফলে অনুবাদক নানাভাবেই প্রতারিত হচ্ছে। অনেক লেখক আছেন নিজেই পয়সা দিয়ে তাঁদের অনুবাদের বই বের করছেন ফলে প্রকাশকরগণ একটা সুযোগ পেয়ে গেছে। এভাবে নানাভাবেই অনুবাদ থেকে অনুবাদক তেমন কিছুই পাচ্ছেন না।

অনুবাদের মান নিয়ে বেশ অসন্তোষ আর অতৃপ্তির জায়গা রয়েছে পাঠকদের মধ্যে। বলা হচ্ছে ভালো অনুবাদ তো হচ্ছেই না কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল টেক্সট থেকে বাদ দিয়ে অনুবাদ হচ্ছে। এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন–

অনুবাদ ভালো হচ্ছে না এটা খুবই সত্যি কথা। আগেই বলেছি অনুবাদের চাহিদা আছে তাই নানাভাবে অনুবাদ করা হচ্ছে এবং বাজারে অনুবাদের বইও চলে আসছে। বেস্ট সেলার বা পুরস্কারপ্রাপ্ত বইগুলোর বাজারে চাহিদা আছে তাই এসকল বই প্রকাশকেরা তাড়াতাড়ি বের করার চেষ্টা করছে। খুব দ্রুত অনুবাদ করা হচ্ছে এবং অনুবাদের মান পড়ে যাচ্ছে। ভালো মানের অনুবাদের জন্য যে বিষয়টির অনুবাদ করা হবে বা যে বইটির অনুবাদ করা হবে তার ভেতরে প্রবেশ প্রয়োজন। সব ভাষার মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য থেকে যায়। তাই যদি অনুবাদটা না বুঝে word to word করা হয় তাহলে অনুবাদের মানটা পড়ে যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেটাই করা হচ্ছে। আমার প্রথম বর্ষে পড়া মেয়ে 'নালন্দা' থেকে একটা অনুবাদের বই কিনে এনে পড়ে বলল, এটা কি অনুবাদ হয়েছে? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে দেখুন খুব সাধারণ পাঠকের

কাছেও কিন্তু বিষয়টি ধরা পড়ছে।

আগের বইগুলোর ভেতর দেখা যায় একটা গল্পের ভেতর আরো অনেকগুলো গল্প থাকে, এটা তো বুঝতে হবে এবং সেভাবেই অনুবাদ করতে হবে। তবে আমি বিশ্বাস করি এই সমস্যার জায়গাগুলো থাকবে না, আমরা এগুলো কাটিয়ে উঠব। একসময় এগুলো থেমে যাবে। অনুবাদ করতে করতে আমাদের অনুবাদকগণও তাঁদের খামতিটা বুঝতে পারবেন। তাঁরা ভালো অনুবাদক হয়ে উঠবেন।

অন্যভাষার বই আমরা বাংলাভাষায় অনুবাদ করছি কিন্তু আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে সেগুলো সেভাবে অনুবাদ তো হচ্ছেই না বলা যায় অনুবাদই হচ্ছে না। বিশ্বের কাছে আমাদের বইগুলোর পরিচিতির জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ খুব প্রয়োজন– কিন্তু সেরকম কোনো উদ্যোগ তো নেই।

এটা একেবারেই ঠিক যে আমাদের বই সেভাবে অনুবাদ হয়ে বাইরে যাচ্ছে না। এখানে আমার পর্যবেক্ষণ দুটি বিষয়ের ওপর। প্রথমত, আমাদের বাংলা বইগুলো আমাদের দেশে যদি আপনি ইংরেজি করেন তাহলে কী লাভ ? কারা এর পাঠক হবে? কে কিনবে এইসব বই? কিনবে না। হুমায়ুন আহমেদ সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক ছিলেন এবং তাঁর বইও যদি আপনি ইংরেজি করেন কেনার জন্য সেভাবে পাঠক পাবেন না। আপনি আপনার বইটা ইংরেজি করে বের করতে পারেন তাতে খুব বেশি লাভ হবে না পোকায় কাটা ছাড়া।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বই যদি ইংরেজি করে বাইরে পাঠাই তাহলে সেটার পাঠক বা ক্রেতা হবে কারা? সেভাবে আমরা পাঠক বা ক্রেতা পাব না। কারণ লেখককে না চিনলে পাঠক বই কিনবে না। তাহলে করে লাভ কী? অর্থাৎ বাইরে আমাদের বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের চাহিদা তৈরি করতে হবে।

বাইরে আমাদের বইয়ের চাহিদা তৈরি করতে হলে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু করতে হবে। সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুবাদ ফাউন্ডেশন বা এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে। যারা আমাদের বই প্রমোট করবে। বাইরে একটা পরিচিতি তুলে ধরবে। আপনি দেখেন অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, কানাডা, নরওয়ে, পর্তুগাল এবং পৃথিবীর আরো অনেক দেশে তারা তাদের লেখকদের পরিচিত করাতে বিনিয়োগ করে। এই যে আমরা একটু আগে হারুকি মুরাকামি'র কথা বললাম– তাঁর নামটা কি এমনি এমনি চলে এসেছে? তাঁকে পরিচিত করানোর জন্য প্রমোট করা হয়েছে। তাই এ ধরনের প্রমোশনাল একটিভিটি লাগবেই। বইগুলো অনুবাদ করে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে সেগুলোর রিভিউ করাতে হবে। তবেই লেখকগণ পরিচিতি পাবেন এবং বইগুলো অন্যভাষায় অনুবাদ করা যাবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' নামে একটি কোর্স আছে। এই 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' আমাদের এই ক্রমবর্ধমান অনুবাদের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারে? অথবা ওই কোর্সটির সম্ভাবনা কেমন মনে করেন?

বাংলা একাডেমি লেখক তৈরির জন্য একটা তরুণ লেখক প্রকল্প করেছিল। বিদেশেও ক্রিয়েটিভ রাইটিং-এর একটা কোর্স অনেক বিশ্ববিদ্যালয় করে থাকে লেখক সৃষ্টির জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এই কোর্স তাঁরই কাজে লাগবে– যাঁর মধ্যে লেখকসত্তা আছে– তাঁরই হয়তো কাজে লাগবে। তিনি হয়তো লিখতেন না– এই কোর্স করার পর তাঁর লেখকসত্তার জাগরণ হতে পারে। তাঁর লেখার ইচ্ছা হতে পারে। কিন্তু যাঁর মধ্যে লেখকসত্তা নেই তাঁর এই কোর্স খুব বেশি উপকারে আসবে না। অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমি মনে করি 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' খুব বেশি কিছু করতে পারবে না। 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' আপনাকে অনুবাদের টেকনিক শেখাবে। এখন অনুবাদের জন্য খুব বেশি টেকনিক আর কী আছে? যে ভাষার বই আপনি অনুবাদ করবেন আর যে ভাষায় করবেন এই দুটো ভাষার ওপর আপনার ভালো দখল থাকতে হবে। এখন উৎস-ভাষা যদি ইংরেজি হয় এক্ষেত্রে আমার কাছে খুব বেশি টেকনিকের কিছু মনে হয় না। আপনাকে অবশ্যই ইংরেজি ভাষায় এবং বাংলা করলে বাংলা ভাষায় দখল থাকতে হবে। আপনার যদি ভাষার ওপর দক্ষতা না থাকে তাহলে টেকনিক শিখে কী হবে? ভাষার ওপর দখল সাহিত্যের অনুবাদের জন্য তো বটেই নন-ফিকশনের জন্য আরো বেশি থাকতে হবে। আপনি যদি কারো জীবনী অনুবাদ করতে চান তাহলে তাঁর সে সময়ের ইতিহাস ও তাঁর অবস্থানের ভুগোল আপনাকে জানতে হবে। ইতিহাস, ভূগোল ছাড়া তো হবে না। যেমন ধরেন গজেন্দ্রনাথ মিত্রের *কোলকাতার কাছে* বইটি যদি কেউ অনুবাদ করতে চায় তাহলে তার অবশ্যই সে সময়ের কোলকাতার ইতিহাস এবং এ সময়ের কোলকাতাকে জানতে হবে না-হলে তো বইয়ের ভালো অনুবাদ সম্ভব হবে না। তাই অনুবাদের জন্য 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারে কিন্তু আপনার নিজের অনুবাদ-কাজের ইচ্ছা এবং ভাষার ওপর আপনার দখল অবশ্যই থাকতে হবে।

আরশাদ সিদ্দিকী

লেখক, গবেষক, অনুবাদক

উল্লেখযোগ্য কাজ– নীলি অনুবাদ।

আপনি তো অনুবাদ করছেন এবং নানাভাবেই অনুবাদের সাথে জড়িয়ে আছেন– এই জায়গাটার সম্ভাবনা কতটুকু দেখছেন?

অনুবাদের সম্ভাবনা আছে তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে আরো অনেক সচেতন হতে হবে। যেসব প্রকাশনী অনুবাদ করাচ্ছেন এবং তাঁরা যেসব বই করাচ্ছেন সে বিষয়ে এবং যাঁদের দিয়ে করাচ্ছেন সব ব্যাপারেই অনেক বেশি সচেতনতা জরুরি। বেস্ট সেলার বা বিখ্যাত বইগুলোর অনুবাদের

চাহিদা বাজারে রয়েছে তাই ওই বইগুলোয় বেশি করানো হচ্ছে। এখন এই বইগুলো খুব তাড়াহুড়ো করে করানো হচ্ছে। অনুবাদের জন্য ভালো পারিশ্রমিক দিতে হবে। ভালো পারিশ্রমিক না দিলে ভালো কাজ হবে না। এখন অনুবাদ কেন করা হয়। অনুবাদ প্রয়োজন হয় নানাবিধ কারণে। অন্য ভাষার কাজ জানার জন্য অনুবাদ করার প্রয়োজন হয়। শুধু সাহিত্যের রস আস্বাদন নয়, অন্য ভাষার লেখা পড়া বা জানার জন্যও অনুবাদ পড়তে হয় বা করতে হয়। যাঁরা ইংরেজি সাহিত্য পড়েন তাঁদেরও অনেকের অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন হয়। এখন অনুবাদ প্রফেশনাল হয়, আবার কেউ নিজের আনন্দে করে থাকেন। আপনি একটা বই পড়লেন– ভালো লাগল– সেটা নিজের ইচ্ছায় অনুবাদ করলেন– এখানে আত্মতৃপ্তির কাজ করে। সেটা একটা বিষয়। আবার আপনি প্রফেশনাল দিক থেকে অনুবাদ করলেন। ফরমায়েশি কাজ করলেন, আবার ভালো পারিশ্রমিকও পেলেন না। তাহলে আপনি তো কোনোটাই পেলেন না। অনুবাদের ক্ষেত্রে আত্মতৃপ্তির এই জায়গাটায় কমতি আছে। এগুলোর দিকে নজর দিলে অনুবাদের সম্ভাবনা অবশ্যই ভালো।

অনুবাদ করতে গিয়ে কোন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন?

আমার যেটা হয় আমি সৃজনশীল কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনুবাদ করি। আমি আমার পছন্দ ও অনুরাগ থেকেই অনুবাদ করি। অনুবাদ করতে গিয়ে নিজের ভেতরও কিছু সৃজনশীলতার জন্ম হয়। অনুবাদ করতে গিয়ে আমার প্রধানত যে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হয় সেটা হল কবি বা লেখক যেভাবে বা যে অর্থে শব্দ ব্যবহার করেছেন আমি ঠিক সে অর্থে অনুবাদ করতে পেরেছি কি না। আমি যখন নীলি অনুবাদ করি আর কবি যেহেতু এখনও বেঁচে আছেন তাই অনেকক্ষেত্রে আমি তাঁর কবিতা অনুবাদ করে তিনি শব্দটা কোন অর্থে ব্যবহার করছেন, কী বলতে চেয়েছেন আর আমি কী অনুবাদ করেছি সে বিষয়ে আলোচনা করি। যেমন নীলি'র কবিতায় আমি *চিফ জোসেফ* শব্দটি পেয়েছিলাম– এটার সঠিক মানে বের করার জন্য আমি বেশ পরিশ্রম করি এবং পরবর্তীতে দেখি এই শব্দটি আমেরিকার ওখানে *পাহাড়িদের প্রধান* এমন অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রথমে আমিই কিন্তু ভেবেছিলাম শব্দটি হয়তো জোসেফদের প্রধান এমন কোনো অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যাই হোক, এভাবে শব্দটার সঠিক মানে জানতে পারলে আমার অনুবাদের পর বাংলায় যাঁরা কবিতাটি পড়তেন তাঁরা কিন্তু এটার সঠিক মানে করতে পারতেন না। হুইটম্যানের ক্ষেত্রেও বলা যায় এমনভাবে কিছু প্রতীক হুইটম্যান ব্যবহার করেছেন বুঝতে হলে মূল ইংরেজির কাছে যেতে হবে।

অনেক সময় এমন হয় যে লেখক যা বলেছেন অনুবাদে তার পুরো অর্থটাই বদলে যায়। এটা যে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে হয় তা-ও কিন্তু নয় আসলে অনেক সময়ই একটা বিষয় নানারকমভাবে অনুধাবন করা যায়। তাই অনুবাদ অবশ্যই জটিল একটি বিষয়।

অনুবাদক বা যাঁরা আনুবাদ করছেন তাঁরা অনুবাদের সম্মানী নিয়ে হতাশার কথা বলেন– এ বিষয়ে আপনার কী মত?

এ বিষয়টি আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে অনুবাদের জন্য ভালো পারিশ্রমিক দিতে হবে। অনুবাদের সম্মানী অবশ্যই হতাশার সৃষ্টি করে কারণ অনুবাদক উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না। ভালো সম্মানী না পেলে ভালো অনুবাদ আশা করা যায় না।

অনুবাদের মান নিয়ে বেশ অসন্তোষ আর অতৃপ্তির জায়গা রয়েছে পাঠকদের মধ্যে। বলা হচ্ছে ভালো অনুবাদ তো হচ্ছেই না কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল টেক্সট থেকে বাদ দিয়ে অনুবাদ হচ্ছে– এ সে বিষয়ে যদি কিছু বলেন–

অনুবাদের মান নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শুরুর দিকে যাঁরা অনুবাদ করেছিলেন তাঁরা যেরকম নিবেদিতভাবে অনুবাদ করেছেন এবং যে মান বজায় রেখেছেন, যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বা বুদ্ধদেব বসু– তাঁদের সেই মানের অনুবাদ সেটা কিন্তু আমরা আর পরবর্তী সময়ে সেভাবে পাচ্ছি না। আর একটা বিষয় হচ্ছে আগে বড় লেখকরা অনুবাদ করতেন। পরে কিন্তু সেভাবে বড় লেখক বা সাহিত্যিকেরা সেভাবে আর অনুবাদ করেননি, বা করছেন না। বড় সাহিত্যিকেরা যদি অনুবাদ করতেন তবে হয়তো আমরা আরো ভালো কিছু পেতাম। অনুবাদ মানের ক্ষেত্রে আমি বলবো অনুবাদে আমরা সেরকম মনোযোগ দেইনি। তাই মানটা রাখা যায়নি। আর দ্রুত অনুবাদ, কম পারিশ্রমিকে অনুবাদ করার কথা তো বললামই। তাই মানসম্পন্ন অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই হচ্ছে না।

অন্যভাষার বই আমরা বাংলাভাষায় অনুবাদ করছি কিন্তু আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে যেগুলো সেভাবে অনুবাদ তো হচ্ছেই না– বলা যায় অনুবাদই হচ্ছে না। বিশ্বের কাছে আমাদের বইগুলোর পরিচিতির জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ খুব প্রয়োজন। কিন্তু সেরকম কোনো উদ্যোগ তো নেই।

দেখুন এ বিষয়ে আমি সহজে যা বলব তা হচ্ছে– বাজার থাকলেই অনুবাদ হয়ে যেত। বাজার না থাকার কারণেই হচ্ছে না। জবরদস্তি করে তো কিছু হবে না। তাই হচ্ছে না কেন এর উত্তর হচ্ছে চাহিদা নেই তাই হচ্ছে না। তাহলে কী করতে হবে– চাহিদা তৈরি করতে হবে। বিদেশি দূতাবাসগুলো প্রচুর বিনিয়োগ করে তাদের লেখকদের অন্যদেশে পরিচিত করানোর জন্য। তাই চাহিদা সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ লাগবে। বিদেশে দেশের দূতাবাসের কাজ কী প্রথমত, বাণিজ্য বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংযোগ সৃষ্টি এবং তৃতীয়ত হচ্ছে নিজের দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। আমাদের দূতাবাসগুলো তার কতটা করতে পেরেছে? তাই অবশ্যই চাহিদা তৈরি করতে হবে, আর তা যদি করা যায় তাহলে বাংলাভাষার সাহিত্য এবং লেখার একটা চাহিদা তৈরি হবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' নামে একটি কোর্স আছে। এই 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' আমাদের এই ক্রমবর্ধমান অনুবাদের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারে? অথবা ওই কোর্সটির সম্ভাবনা কেমন মনে করেন?

'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ'-এর প্রয়োজন আছে আজকের দুনিয়ায়। ব্যাপারটা শুধু ইংরেজির নয়। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা ঠিক আছে কিন্তু এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ইংরেজি ছাড়াও অনেক কাজ করছে। আমরা যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথা ধরি, তারা যদি একটি ডকুমেন্টারি বানায় তো ছাব্বিশটা ভাষায় সেটা রূপান্তর করে। সুতরাং দুনিয়াটা তো এখন সেই জায়গায় চলে এসেছে। তাই 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ'-এর প্রয়োজন আছে। শিল্প-সাহিত্য ছাড়াও নানাভাবে ভাষার প্রয়োজন হচ্ছে। এমনকি দাপ্তরিক কাজেও এখন ভাষা লাগছে।

বাইরের বিশ্বের ভাষার কথা অনেক বলি কিন্তু নিজের দেশেরটা বলি না। আমাদের নিজেদের দেশেও তো বেশ কিছু ভাষা রয়েছে– আমরা কি সেগুলোর দিকে নজর দিতে পেরেছি? ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি ২৬টি ভাষার মধ্যে সমন্বয় করে একটা হারমোনি তৈরি করতে পারে? আমরা কি আমাদের ভাষাগুলো বোঝার জন্য একটা কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর জায়গা তৈরি করতে পারতাম না! তাতে আমাদের পারস্পরিক একটা আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারতাম। আমরা আরো অনেক বেশি মানুষকে বুঝতে পারতাম।

ড. মোহা. আবু জাফর
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইংরেজি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' নামে একটি কোর্স আছে, যতদূর জানি আপনি এই 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' কোর্সের একজন শিক্ষক, আমাদের এই ক্রমবর্ধমান অনুবাদের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারে? অথবা ওই কোর্সটির সম্ভাবনা কেমন মনে করেন?

'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' কোর্স চালু হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। একজন শিক্ষক হিসেবে অবশ্যই এটির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এটা গ্লোবালাইজেশনের যুগ। আমাদেরকে নানাভাবেই বিশ্বের সাথে অনেক বিষয় সমন্বয় করতে হচ্ছে। অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা নানা কারণেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে অনুবাদের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো পড়ানো হয়। তবে একটি বিষয় হল, কেউ ইংরেজি সাহিত্য পড়লেই যে সে সাহিত্যিক হয়ে যাবে তা তো নয়, তেমনি কেউ 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' পড়লেই ভালো অনুবাদক হয়ে যাবে তেমনটিও কিন্তু নয়। তবে যেটা হবে সেটা হল কেউ যখন অনুবাদ করবেন, তিনি যদি অনুবাদের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো ও টেকনিকগুলো জানেন তবে তিনি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন। আর আমাদের কিন্তু শুধু অনুবাদ করলেই হবে না, কোন বই

অনুবাদ করা হবে, কোনটা বিশ্বমার্কেটে চাহিদা সৃষ্টি করবে সেটাও জানা প্রয়োজন। 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজে' কিন্তু এখন তত্ত্বের সাথে এই বাণিজ্যিক ব্যাপারটা পড়ানো হচ্ছে। আমাদের বইগুলো অন্যভাষায় অনুবাদ করার সময় সিলেকশেনের ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানও একটা সহায়ক ভূমিকা রাখবে। আর আমাদের দেশে যদিও 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি, কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশে কিন্তু এটাতে মাস্টার্স করার ব্যবস্থা আছে এবং তারা কিন্তু বেশ একটা ভালো অবস্থানে চলে এসেছে অনুবাদের ক্ষেত্রে। তাই 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ'-এর প্রয়োজন তো রয়েছেই এবং এর ভালো সম্ভাবনা বেশ ভালো বলেই মনে করি।

অন্যভাষার বই আমরা বাংলাভাষায় অনুবাদ করছি কিন্তু আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই রয়েছে যেগুলো সেভাবে অনুবাদ তো হচ্ছেই না– বলা যায় অনুবাদই হচ্ছে না। বিশ্বের কাছে আমাদের বইগুলোর পরিচিতির জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ খুব প্রয়োজন– কিন্তু সেরকম কোনো উদ্যোগ তো নেই।

এটা ঠিক বলেছেন যে আমাদের বই সেভাবে অনুবাদ হয়ে বাইরে যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের বইগুলোর জন্য কোনো চাহিদাও তো তৈরি হয়নি। এখন একটা বই যদি অনুবাদ করেন তার জন্য তো পাঠক তৈরি করতে হবে। পাঠক যদি বই না পড়ে বা আপনার বইটা সম্পর্কে যদি না-ই জানে তবে বই অনুবাদ করেই-বা আপনি কতটুকু আমাদের সাহিত্য অন্য দেশে পৌঁছাতে পারবেন। বাংলা সমৃদ্ধ ভাষা, এবং বাংলাসাহিত্যও সমৃদ্ধ, এখানে অবশ্যই অনেক ভালো কিছু সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এই ভালো কাজগুলোকে বাইরে পরিচিত করানোর জন্য আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু করতে হবে। সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। আবার আমাদের সবকিছু সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের বেসরকারিভাবেও উদ্যোগ নিতে হবে তবেই লেখকেরা পরিচিতি পাবেন এবং বইগুলো অন্যভাষায় অনুবাদ করা যাবে।

অনুবাদশিল্পের সমস্যাগুলো কী ?

অনুবাদশিল্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা আমি যেটা মনে করি– অনুবাদকর্মটির যথার্থ মূল্যায়ন নেই। এই মূল্যায়নহীনতা অনুবাদকের জন্য একটা সমস্যা। অনুবাদ-কাজকে মনে করা হয় যে কলম নিয়ে বসলেই বুঝি অনুবাদ হয়ে যায়। কিন্তু সেটা তো নয়ই বরং অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন কাজ– কারণ অনুবাদককে দুই দেশের সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে হয়। আর আমাদের দেশে অনুবাদশিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে আর একটি বড় সমস্যা হল যথার্থ সম্মানী না দেয়া। অনুবাদক যদি ভালো সম্মানী না পায় তবে সে কিভাবে ভালো অনুবাদ করবে। কারণ আপনি যে সময়টা বিনিয়োগ করবেন এই সময়টা যদি আপনি অন্য কাজে ব্যয় করেন তবে নিশ্চিতভাবেই আপনি একটা ভালো পারিশ্রমিক পাবেন। তাই অবশ্যই আপনার শ্রম, সময় এবং মেধার জন্য একটা মূল্যায়ন ও ভালো পারিশ্রমিক প্রয়োজন।

অনুবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন– এই জায়গাটার সম্ভাবনা কতটুকু দেখছেন?

সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। অনুবাদ ছাড়াও তো আপনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাহিত্য বা জ্ঞানের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারছেন না। তবে ওই যে বললাম, আমাদের দেশে অনুবাদ নিয়ে নানা সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অনুবাদশিল্পীদের সম্মান এবং তাঁদের সম্মানী দুটোর দিকেই নজর দিতে হবে।

আপনি তো বিশ শতকে করা বাংলা সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদগুলোর ওপর আপনার পিএইচডি'র গবেষণা করেছেন। এই বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণ জানতে চাই।

হ্যাঁ, আমি বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ– বিশেষ করে কবিতার অনুবাদের ওপর কাজ করেছি। ১৯০৯ সাল থেকে শুরু করে ২০০৮ পর্যন্ত যেসব কবিতার অনুবাদ হয়েছে সেগুলোর ওপর আমার কাজটি করা হয়েছে। ১৯০৯ সালে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদটি হয়। সেটা আমরা কম-বেশি সবাই জানি। বাংলা সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি বড় জায়গা জুড়ে আছেন। বিদেশিদের দ্বারা তিনি অনূদিত হয়েছেন। তাই ওটার বিষয়ে আমি মতামত রাখছি না। বাংলাদেশের কবিদের যেসব অনুবাদ হয়েছে ওটাকে আমি খুব ভালো মানের বলতে পারি না। আর এইসব অনুবাদ কিন্তু খুব বাইরের পাঠকরা নিয়েছে বা বাইরের পাঠকের জন্য হয়েছে এমন কিন্তু আমার মনে হয় না। এগুলোর পাঠক কিন্তু এদেশের পাঠকই। তা এদেশের পাঠকরা তাঁদের ইংরেজি অনুবাদের প্রতি কেন আর্কষণ বোধ করবে না? তাঁরাও লেখকের বাংলাটাই পড়তে পারেন।

শামীম ওয়াহিদ
প্রকাশক, আড়িয়াল প্রকাশনী
কানাডা।

আপনার আড়িয়াল প্রকাশনী থেকে দীর্ঘদিন বই প্রকাশ করে আসছেন। যেহেতু আপনার এই প্রকাশনীটি কানাডায় রেজিস্ট্রেশন এবং আপনার একটা বড় টার্গেট-পিপল হচ্ছে প্রবাসী বাঙালি– সে ক্ষেত্রে অনুবাদ গ্রন্থের চাহিদা কেমন?

আপনি যদি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত বইয়ের কথা বলেন– তাহলে আমি বলব সেভাবে কোনো চাহিদা এখনো তৈরি হয়নি। প্রবাসী বাঙালিরা বাংলা বই-ই বেশি পড়তে চায়। এখন ধরেন যাঁরা কানাডায় থাকছেন, যাঁরা আমাদের মতো বাংলাদেশে দীর্ঘদিন থেকে তারপর প্রবাসী হয়েছেন তাঁদের সবার ইংরেজি বই পড়ার অভ্যেস সেভাবে গড়ে ওঠেনি। আর পরবর্তী প্রজন্ম যাঁরা, তাঁরা আবার বাংলা সাহিত্য বা বাংলা বইয়ের সাথে সেভাবে সম্পৃক্ত নন– ফলে তাঁদের কাছেও খুব বেশি চাহিদা তৈরি হয়নি।

আপনি তো ইংরেজিতে কিছু বই করেছেন– সেগুলোর পাঠক- রেসপন্স কেমন পেয়েছেন?

খুব ভালো পেয়েছি সেরকম আমি বলব না। বই কিছু যা বিক্রি হয়েছে তা কিন্তু ওই বাঙালি কমিউনিটির কাছেই। নেটিভরা কিন্তু খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। এর কারণ হল বাঙালি লেখক তাঁদের কাছে পরিচিত নন। আর এখানে বই কেনে মানুষ বইয়ের রিভিউ পড়ে। বাঙালি লেখকদের বই-এর ওপর সেভাবে কোনো রিভিউ কিন্তু হয় না। যার ফলে তাঁদের কাছে এই বইগুলোর তেমন কোনো চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। আমি যা দেখতে পেলাম ব্রিটিশ-বাংলাদেশী ঔপন্যাসিক জিয়া হায়দার রহমান এখানে বেশ পরিচিত। এটার কারণ– তিনি ব্যাপক প্রচার পেয়েছেন। এবং তাঁর বইয়ের বুক রিভিউ প্রকাশ পেয়েছে। তবে আমরা যদি বই বের করতে থাকি এবং বিভিন্নভাবে আমাদের বইগুলো আলোচনায় নিয়ে আসতে পারি তাহলে হয়তো এখানে একটা চাহিদা তৈরি হবে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' নামে একটি কোর্স আছে। এই 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' আমাদের এই ক্রমবর্ধমান অনুবাদের ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারে? অথবা ওই কোর্সটির সম্ভাবনা কেমন মনে করেন?

'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' কোর্স হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। নানাভাবেই আমাদের যোগাযোগ বিভিন্ন দেশের সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এটা তো গ্লোবালাইজেশনের যুগ। এখানে তো নানাভাবেই সবকিছু ট্রান্সফরম হচ্ছে। আমাদের চিন্তা-ধারণাগুলো, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের নানা বিষয় বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্য অনুবাদ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প তো নেই। তাই 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ'-এর প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা আমার কাছে বেশ ভালো বলে মনে হয়।

উপসংহার

বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। আলোচনা-সমালোচনা যাই থাক– অন্য দেশ, অন্য জগৎ এবং অন্য জীবন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে অনুবাদের কোনো বিকল্প নেই। তাই অনুবাদ করতেই হবে। মানহীন অনুবাদ আমাদের অনুবাদশিল্পের একটা অন্যতম সংকট। তারপরও ব্যাপকসংখ্যক নতুন অনুবাদক সৃষ্টি হচ্ছে– এটি আমাদের জন্য একটি ইতিবাচক সংবাদ। নানা ভুল-ত্রুটির মধ্য দিয়ে একদল দক্ষ ও যোগ্য অনুবাদক বেরিয়ে আসবেন এটি আশা করা যায়। ভালো ও পরিশ্রমী কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অনুবাদকগণ উপযুক্ত সম্মানী পাচ্ছেন না। এটি অসমাধানযোগ্য কোনো সমস্যা নয়। অনুবাদকর্মের যথার্থ মূল্যায়ন করা হলে এবং এক্ষেত্রে আমাদের প্রকাশকগণ আরো

একটু আন্তরিক, স্বচ্ছ এবং তাঁদের মুনাফালোভী চরিত্রটি আরো একটু বদলে নিলেই অনুবাদকদের এই হতাশা আর ক্ষোভের জায়গাটি দূর করা সম্ভব। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান এই অনুবাদশিল্প আর তার ব্যাপক সম্ভাবনার প্রতি আমাদের এখনি যত্নবান আর সতর্ক হবার সময়। তা না হলে একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার জগৎ নানাবিধ হঠকারিতায় রুগ্ন ও ভঙ্গুর হয়ে পড়বে।

[লেখক: কবি, কথাসাহিত্যিক, সংগঠক। সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা।]

অনুবাদকের বর্তমান প্রেক্ষাপট

শৌ ফি ক বা বু

আমরা অনেকেই জানি যে, অনুবাদ একটি সাহিত্যশিল্প। এই শিল্প একান্তই অনুবাদকদের স্বতন্ত্র অধিকারের ব্যাপার, এটি কোনো দ্বিতীয় স্তরের বা 'ভায়া' কাজ নয়। অনুবাদ অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। অনুবাদক তাঁর মেধা ও মনন মিলিয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে এমনও ভেবে থাকেন যে, শেষপর্যন্ত হয়তো এই কাজটি তাঁর নামেই প্রকাশ পাবে না। কারণ প্রকাশকেরা মনে করেন, অনুবাদককে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এখন এ কাজটির সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর নিজের। এভাবে করে আসলে একজন সাহিত্যিককে বঞ্চিত করা হয়। এভাবে মেধা-চর্চার সামগ্রিক বিষয়টিকেই অবহেলা করা হয়। এতে করে ধীরে ধীরে এ কাজ থেকে অনেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাসাহিত্যের একটি বড় ধারাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। তাই নিম্নের পদক্ষেপগুলো মানতে পারলে আমরা হয়তো এই দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারব–

১. কারা কারা অনুবাদক তা নির্ণয় করা। যে জন্য একটি অনুবাদ সংস্থা বা সংগঠন থাকা জরুরি।
২. অনুবাদকের যথাযথ সম্মানী নির্ধারণ করা।
৩. অনুবাদকের নাম, মেধা-স্বত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং অনুবাদক যেন তাঁর নাম স্বত্ব অধিকার লাভ করতে পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. অনুবাদের কাজে হাত দেওয়ার আগেই এই সমস্ত বিষয়গুলো নির্দিষ্ট কতৃপক্ষের মাধ্যমে নির্ধারণ করা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোসহ আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি নজর না দেয়ার কারণে বিশ্বের নানাবিধ বুদ্ধি ও সংস্কৃতিগত কার্যকর সম্পদ আহরণ থেকে আমরা বঞ্চিত রয়েছি। এরকম বিবিধ অবহেলার কারণে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি ক্ষীণপ্রায় ও নিষ্প্রভ হয়ে আসছে!

আমার মনে হয় অনুবাদকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নতুন প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশের কারণে আরও কিছু আইনও তৈরি এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা করা দরকার।

সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার তা হল– সচেতনতা। কপিরাইট আইন সম্পর্কে জানা এবং কিভাবে সেটা দ্বারা সুরক্ষা পাওয়া যেতে পারে– সে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।

আমার তো মনে হয়, খেলাচ্ছলে লেখক ও অনুবাদকদের বিলুপ্ত করার পাঁয়তারা চলছে। আর অতিমাত্রায় শিক্ষিত হয়েও অনুবাদকেরা মুখ বুজে তা সহ্য করে যাচ্ছেন। কিন্তু কেন এই মুখ বুজে সহ্য করা, তা আমার বোধগম্য নয়। সেক্ষেত্রে সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে অনুবাদকদেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে বলে আমি মনে করি। অনুবাদক সমাজকে সুরক্ষা দেয়ার খাতিরে তাঁদের নিজেদের উচিত আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই বিষয়ে সমাধানের পথে সচেষ্ট হওয়া।

[লেখক: অনুবাদ শিল্পী। কর্মরত, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।]

বাংলাদেশে অনুবাদ চর্চায় করণীয়

হা বী বু ল্লা হ সি রা জী , আ মি নু ল ই স লা ম ভূঁ ই য়া, জি. এইচ. হা বী ব

আজ ৮ জুন ২০১৯ শনিবার। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে আমরা বসেছি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবনে অবস্থিত 'বাতিঘর' শীর্ষক বইয়ের দোকানটিতে। 'হালখাতা' গত ১৩ বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর একেকটি সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে। 'হালখাতা' এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৮টি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'বাংলাদেশে অনুবাদচর্চা' শীর্ষক আরেকটি স্বতন্ত্র সংখ্যা।

'বাংলাদেশে অনুবাদচর্চা' বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমরা আজ এখানে মুখোমুখি হয়েছি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবীবুলাহ সিরাজী, বাংলাদেশে অনুবাদ চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তিত্ব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন-কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং স্বনামধন্য অনুবাদশিল্পী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক জি. এইচ. হাবীবের। 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে উপস্থিত আছি আমি শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত।

প্রথমে আমরা জি. এইচ. হাবীবের কাছে জানতে চাইব, প্রায়ই অনুবাদশিল্পীদের কাছ থেকে অভিযোগ শোনা যায়, সামাজিকভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুবাদশিল্পীদেরকে সেভাবে মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। আপনি একজন অনুবাদশিল্পী হিসেবে বলবেন কি, এ ধরনের অভিযোগের সত্যতা আসলে কতখানি?

জি. এইচ. হাবীব

আমি বলব এই অভিযোগ শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সম্ভবত বিশ্বের সর্বত্রই অনুবাদকে কম গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়ে থাকে। আমার ধারণা বাংলাদেশে বিষয়টিকে তুলনামূলকভাবে আরও বেশি অসম্মানের চোখে দেখা হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে তো

বটেই, প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও এই ক্ষেত্রটিকে তুচ্ছতার সঙ্গে দেখা হয়ে থাকে। যার ভুক্তভোগী আমি নিজেও। বিশেষ করে সেটা যদি বাংলা অনুবাদ হয় তাহলে তো কথাই নেই। বাংলা অনুবাদ হলে সে কাজটিকে একটু বেশি করেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হয়ে থাকে।

হালখাতা

কিন্তু এর কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

জি. এইচ. হাবীব

কারণটা আসলে ঐতিহাসিক। মানুষের মনুষ্যত্বটাই বেড়ে উঠেছে এভাবে। আমার কাছে এটাকে সাংস্কৃতিক সংকট বলে মনে হয়। অনেকে মনে করে থাকেন, হাতে যদি একখানা অভিধান থাকে, তাহলে সহজেই যেকোনো একটি লেখা অনুবাদ করে দেওয়া সম্ভব। সুতরাং আরেকজনের অনুবাদের প্রতি আর মনোযোগ দেয়ার দরকার নেই। তাঁরা মনে করেন, এ কাজে কোনো পরিশ্রম দরকার হয় না, এখানে কোনো সৃষ্টিশীলতা দরকার হয় না, যেন এমনিতেই সবকিছু হয়ে যায়।

হাবীবুলাহ সিরাজী

এখন কিন্তু আরেক ধরনের 'গুগল অনুবাদ' বের হয়েছে। দেখা যাচ্ছে ৩০০ বা ৫০০ পৃষ্ঠার বই এক রাতের মধ্যে অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে।

হালখাতা

'গুগল অনুবাদ' সম্পর্কে হাবীবুল্লাহ সিরাজী যে কথাটি বললেন সে বিষয়ে, আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া, আপনার মন্তব্য শুনতে চাই।

আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

ইদানিং এটা হচ্ছে, কিন্তু এগুলো আমাদের আলোচ্য নয়। যাঁরা সত্যিকার অর্থে সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে অনুবাদ চর্চার মধ্যে আছেন, তাঁদের প্রতি যে বিরূপ মনোভাব দেখানো হয়, জি. এইচ. হাবীব আমার ধারণা সে কথাটিই বলাবার চেষ্টা করেছেন।

হাবীবুলাহ সিরাজী

'গুগল অনুবাদ' ইদানিং শুরু হয়েছে এবং আমাদের অনুবাদ চর্চার যে ধারা, তার মধ্যে এটা প্রধান দিক নয়– এসবই আমরা জানি। যেহেতু লেখালেখির সাথে আমিও জড়িত এবং কিছু অনুবাদের কাজ আমাকে করতে হয়েছে, সে-সব দিক থেকে আমিও মনে করি , আমরা কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ করি না– আমরা হয়তো অনুবাদ করি একটি সাহিত্য বা দর্শনের বই; সেখানে গুগলের যে

অনুবাদ, তার কোনো স্থান থাকতে পারে না। আর অনুবাদকে কে কিভাবে দেখে থাকে, সেটা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। তবে জি. এইচ. হাবীব এই ক্ষেত্রটির প্রতি প্রাতিষ্ঠানটিক অবহেলার যে কথাটি বললেন, সে-ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুবাদচর্চাকে কিভাবে দেখেন সেটা আমার জানা নেই, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছি বলে বলতে পারি, সাহিত্য ও চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অনুবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিজ ভাষায় মৌলিক সাহিত্য-দর্শন চর্চার তুলনায় অনুবাদকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। আমাদের কাছে এই ধারাটি অনেক শ্রদ্ধার এবং এর সঠিক বিস্তারের জন্য আমরা সবসময় আন্তরিক।

হালখাতা

অনুবাদশিল্পীদের নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া কিংবা সম্মানের জায়গায় পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে যা-যা করণীয়, সেখানে অনুবাদশিল্পীদের নিজেদের মধ্যে কোনো ঘাটতি রয়েছে কি-না, এ বিষয়ে কেউ যদি বলেন...

আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

একটা বিষয় হল প্রকৃত অনুবাদকদের একত্রিত হয়ে এই বিষয়ে কথা বলা অবশ্যই দরকার আছে বলে আমি মনে করি, যে কাজটি হয়তো একেবারেই করা হচ্ছে না। আরেকটি বিষয় হল– অনেকের কাছ থেকে এমনকি অনুবাদকদের মধ্যেও কারও কারও কাছ থেকে বলতে শোনা যায়, মূল টেক্সট থেকে অনুবাদ না হলে অনুবাদের পরিবর্তে মূলটাই পড়া ভালো। কিন্তু আমি সেটা মনে করি না। ইংরেজি ভাষা থেকে এমন সব ট্রানসিলেশনস হয়েছে, যেগুলোর মূল টেক্সট দেখা যাবে গ্রিক, ল্যাটিন বা অন্য কোনো ভাষায়, অথচ সেসব অনুবাদ পড়লে বোঝার উপায় নেই সেগুলো গ্রিক বা ল্যাটিন থেকে ট্রান্সসিলেট করা হয়নি! বিখ্যাত কবি আলাওলের কাব্য কিংবা রামায়ণ-মহাভারতও তো অনুবাদই! এ রকম অনেক সাহিত্য পৃথিবীর বেশ কিছু ভাষায় অনূদিত হয়েছে, যা সবসময় মূল টেক্সট থেকে হয়নি। এসব রচনা যে সেকেন্ড বা থার্ড ল্যাংগুয়েজ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে, সেটা কিন্তু বোঝার উপায় থাকে না। সুতরাং অনুবাদকদের মধ্যে যাঁরা বুঝে-শুনে কাজটি করছেন, তাঁদের বেলায় তো কোনো আপত্তি খাটে না। আবার আজকাল এমন ধরনের মানুষজন অনুবাদকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সত্যিই কঠোর ভাষা উচ্চারণ করতে ইচ্ছা হয়।

হালখাতা

যাঁরা ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের বাইরে গিয়ে দায়সারাভাবে কাজটি করছেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা সত্যিকার অর্থে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুবাদ করছেন, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই এক ধরনের অবহেলা লক্ষ করা যায়– এ বিষয়ে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য শুনতে চাই।

হাবীবুলাহ সিরাজী

সারা দেশে কোথায় কী ঘটছে সেই প্রশ্নের জবাবে আমি যাব না, তবে বাংলা একাডেমির কথা বলতে পারি, আমাদের কাছে অনুবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সে অর্থে অনুবাদ যাঁরা করেন, বিশেষ করে আন্তরিকতার সঙ্গে যাঁরা মান-সম্পন্ন অনুবাদ করে যাচ্ছেন, তাঁরা বাংলা একাডেমির কাছে নমস্য ।

জি. এইচ. হাবীব

বাংলা একাডেমি বা বাংলাদেশের বিষয়টি তো আছেই– সে আলোচনায় একটু পরে আসছি– তার আগে উল্লেখ করতে চাই, সারা পৃথিবীতেই কিন্তু অনুবাদের প্রতি এক ধরনের অবহেলা লক্ষণীয় । ধরা যাক, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকাশনাগুলোর কথা কিংবা পেঙ্গুইন প্রকাশনীর কথা, সে-সব আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনাগুলোর বইগুলোতেও অনুবাদকের নামটি পর্যন্ত ছাপতে কার্পণ্য লক্ষ করা যায় । সাধারণত সামনের পৃষ্ঠায় যেখানে বড় ফন্টে লেখকের নাম থাকে, সেখানে ওই একই ধরনের সকল প্রকাশনারই বইগুলোতে দেখা যায়, বইয়ের শেষপ্রান্তে অতি ছোট্ট করে অনুবাদকের নামটি ছাপছে । এমন একটা ভাব, যেন অনুবাদকের নাম-পরিচয় না ছাপতে পারলেই ভালো হত! আমার কথা হল, পুরো প্রকাশনা জগতেই অনুবাদকদের ক্ষেত্রে এই মানসিকতা কেন?

হাবীবুলাহ সিরাজী

পেঙ্গুইনসহ পৃথিবীর অনেক বড় বড় প্রকাশনী থেকে যেসকল বই অনুবাদ করানো হয়েছিল এবং এখনো যে-সব বই অনুবাদ করানো হচ্ছে, সে-সব বইয়ের অনুবাদের স্বত্ব তারা কিনে নেয় বলে, তারা মনে করে বইগুলোর সার্বিক মালিকানাই তাদের, সে-কারণে তারা অনুবাদকের নাম বড় করে প্রকাশ না করার পক্ষে ।

জি. এইচ. হাবীব

এটা কোনো কথা হতে পারে না যে, আপনি আমার অনুবাদের জন্য টাকা দিয়েছেন বলে আমার নামটি দেবেন না বা ছোট করে ছাপবেন। বইয়ের আর্থিক মালিক অবশ্যই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এখানে সৃষ্টির যে মালিকানা, সেটা তো অনুবাদকের । তাছাড়া অনুবাদকের নাম সামনের পাতায় বড় করে ছাপলে তো কোনো প্রতিষ্ঠানের লোকসান হচ্ছে না! অথচ যে প্রাপ্যটুকু পেলে একজন অনুবাদক সম্মানিত বোধ করতে পারেন এবং যা দিতে গেলে প্রকাশনার কোনো ক্ষতিও হচ্ছে না– সেরকম একটা বিষয় না দিতে চাওয়াটা আমি মনে করি পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক । মনস্তাত্ত্বিক এই জায়গাটা থেকে সরকারি-বেসরকারি প্রকাশনা

প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেরিয়ে আসতে হবে সবার আগে। প্রশ্ন হল, একটি বইয়ের মূল লেখকও তো সম্মানী তথা টাকা নেন, তাঁর নাম তো ছোট করে লেখা হয় না!

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

বাংলা একাডেমি অনুবাদকদের সম্মানের চোখেই দেখে থাকে– এটুকু জোর দিয়েই বলতে পারি। আরও সুখবর হল, আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলা একাডেমি নতুন উদ্যমে ভালো কিছু অনুবাদের বই প্রকাশের কাজে হাত দিচ্ছে, যার প্রক্রিয়া অনেকটাই শুরু হয়েছে বলা যায়। এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, আমাদের উচ্চমানসম্পন্ন বিশাল বাংলা-সাহিত্যের অনুবাদসমূহ আজ বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব শুধুই বাংলাদেশের। বাংলা একাডেমি সে-রকম একটি মিশন ও ভিশনকে সামনে রেখে কাজ করছে।

হালখাতা

আপনার ব্যক্তিগত সদিচ্ছাকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, কাজ করতে গেলে টাকার দরকার হয়, সে কাজটি যদি বড় আকারের হয়, তাহলে বড় টাকা লাগে। সে-ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমিতে অনুবাদের একটি উপ-বিভাগ রয়েছে; নিশ্চয় একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ আর একটি উপ-বিভাগের আর্থিক বাজেট সমান নয়। বাংলা একাডেমির অনুবাদ উপ-বিভাগকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগে রূপান্তর করবার কি আপনাদের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে?

আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

এ বিষয়ে আমি একটু বলি, সেটা হল, এই যে বাংলাদেশ লেখক ঐক্য 'লেখক আড্ডা' নামক জায়গাটিতে আজকে অনুবাদকদের দাওয়াত দিয়ে কথা বলবার যে আয়োজনটি করে থাকে, বাংলা একাডেমি মাঝে-মধ্যে এরকম অয়োজন যদি করতে পারে, আমার ধারণা অনুবাদ সেক্টরের আরো নানাবিধ সমস্যা ও সমাধানের বিষয়টি উঠে আসবে। তখন বিভাগ-উপবিভাগসহ সব বিষয়েই কিন্তু আলোকপাত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমার মনে হয়, বাংলা একাডেমি অনুবাদকদের নিয়ে বসে এভাবে আলাপের ব্যবস্থা করলে ভালো হবে।

হালখাতা

ধন্যবাদ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া আপনাকে। আমরা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের কাছে সুনির্দিষ্ট একটি প্রস্তাব রেখেছি, দেখি উনি এর ব্যাপারে কী জবাব দেন।

হাবীবুলাহ সিরাজী

অনুবাদের পূর্ণাঙ্গ বিভাগ ও উপ-বিভাগের মধ্যে ভেদ দেখি না। মূল কথা, গুরুত্বের সঙ্গে কর্মটি সম্পাদনা করা।

হালখাতা

কিন্তু আমরা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে বাংলা একাডেমিতে সরেজমিন গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ ও উপ-বিভাগের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্য কার্য-পরিধির দিক থেকে, বাজেটের দিক থেকে এবং সর্বোপরি সার্বিক সক্ষমতার দিক থেকে। যা হোক, আমরা সকল অনুবাদশিল্পী এবং পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে আবেদন রাখছি, বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ যেন, অনুবাদ উপ-বিভাগকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগে উত্তীর্ণ করবার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবেন।

জি. এইচ. হাবীব

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক যেহেতু এখানে উপস্থিত রয়েছেন, তাই উনার কাছে আমার একটি প্রস্তাব, সেটি হল, যেসকল বইয়ের অনুবাদ এপর্যন্ত হয়েছে, এবং আরও যে সব বইয়ের অনুবাদ হওয়া দরকার– এরকম একটি সার্বিক তালিকা বাংলা একাডেমি তৈরি করতে পারে কি না?

হাবীবুলাহ সিরাজী

এরকম একটি তালিকা তৈরি করাও কিন্তু একটি গবেষণা-কাজ। সেটি যে-কেউই করতে পারে। সব কিছু তো বাংলা একাডেমির কাছে চাইলে হবে না। এরকম একটি কাজ আপনাদের মধ্য থেকেও কেউ একজন শুরু করতে পারেন। আর একবার শুরু হলে এবং সেটি চলতে থাকলে ধীরে ধীরে সেই তালিকা আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আসলে এভাবেই তো কাজগুলো হয়ে থাকে।

হালখাতা

বাংলা সাহিত্যের রয়েছে গর্ব করার মতো উজ্জ্বল ইতিহাস। এবং এর বিস্তৃতিও যথেষ্ট ব্যাপক। কিন্তু এরকম একটি ভাষার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগুলো আজ অবধি ইংরেজি, স্প্যানিশ, জার্মান, ফ্রান্সসহ পৃথিবীর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হল না; সেখানে রাষ্ট্রের কী ধরনের দায় থাকতে পারে এবং রাষ্ট্র সে দায়-দায়িত্ব পালনে কতটা সফল বা অসফল বলে আপনারা মনে করেন?

জি. এইচ. হাবীব

বিষয়টি আমার কাছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হয়। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের কথাই, গীতাঞ্জলিই যদি

ইংরেজি ভাষায় অনূদিত না হত, তাহলে তো রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারও পেতেন না! এখন কথা হল, রবীন্দ্রনাথেরই আরও যে রচনাভাণ্ডার রয়েছে সেগুলোর কি অনুবাদ হওয়া দরকার না? আমার কথা হল, পুরো রচনা সমগ্র অনূদিত না হলেও বেছে বেছে হলেও তাঁর আরও অনেক রচনা অনুবাদের উদ্যোগ গৃহীত হতে পারত। এ-তো গেল রবীন্দ্রনাথের কথা, বাংলাভাষায় তার বাইরে আরও তো কত গুরুত্বপূর্ণ লেখক আছেন– তাঁদের রচনা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহ অনূদিত হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এসব বিষয় ভাববার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি আছে বলে মনে করা হয়, সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নজরে পড়বার মতো বিশেষ উদ্যোগ কি গৃহীত হয়েছে? যদি সেটা না হয়ে থাকে, তাহলে কীভাবে সে কাজ শুরু হতে পারে?

আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

বিষয়টি নিয়ে আমার ধারণা, অতীতে সেভাবে চিন্তা করা হয়নি।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

বাংলাভাষা ও সাহিত্য যে সমৃদ্ধ এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। সেখান থেকে যে-সকল সাহিত্য বিশ্বপাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া দরকার, সেগুলো অবশ্যই বাংলা থেকে অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। সেটা গত ৫০ বছরে যেভাবে যে গতিতে হওয়া দরকার ছিল, সেটা হয়তো হয়নি। তবে একেবারে যে হয়নি তা বলা যাবে না। যা হোক, বাংলা একাডেমি নতুন উদ্যমে বাংলা থেকে ভিন্নভাষায় অনুবাদ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যা হয়তো আজকের এই উত্থাপিত আকাঙ্ক্ষার আংশিক পূরণ করবে বলা যায়।

হালখাতা

অনেকে মনে করছেন, অনুবাদের ক্ষেত্র যে ধরনের ব্যাপক ও বিস্তৃত একটা ব্যাপার, সেখানে একটি স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রতিষ্ঠান আজ সময়ের দাবি। বাংলা একাডেমি সেই প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে কিনা সেই প্রশ্নটি বারবার সামনে চলে আসছে। এ বিষয়ে আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া কী মনে করেন?

আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। সেটা হল, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কিছু একটা করা প্রয়োজন তবে সেটা কোন পথে সমাধান সহজ হতে পারে সে-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা দরকার।

হালখাতা
হাবীব ভাই এ বিষয়ে কী মনে করেন?

জি. এইচ. হাবীব
আমি মনে করি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান অবশ্যই দরকার। তবে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান হওয়া তো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার– সে-কারণে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ইমেডিয়েটলি যেটা হতে পারে, সেটা হল, বাংলা একাডেমির অনেক বেশি সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নামে যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমেও ব্যাপকভাবে উদ্যোগ গৃহীত হতে পারে।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী
আমি আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়ার সাথে সহমত পোষণ করি এ ব্যাপারে। বিষয়টি নিয়ে এতকাল সেভাবে আলাপ-আলোচনা গড়ে ওঠেনি। এখন যে আলাপটি উঠেছে সেটি একটি ভালো দিক। তবে বাংলা একাডেমি থেকে এ ব্যাপারে আরও কী করা যায় সেটিও খতিয়ে দেখা হবে।

হালখাতা
অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও 'হালখাতা'-কে সময় দেয়ার জন্য জি. এইচ. হাবীব, আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি।

[পরিচিতি: হাবীবুল্লাহ সিরাজী: কবি, অনুবাদ শিল্পী, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি। আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া: অনুবাদ শিল্পী, সরকারি কর্মকর্তা (প্রাক্তন)। জি.এইচ. হাবীব: অনুবাদ শিল্পী, অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।]

অনুবাদ নিয়ে দুটি কথা

শ ও ক ত হো সে ন

বাংলাদেশে অনুবাদ সাহিত্য বরাবরই যেন কিছুটা অবজ্ঞা ও অবহেলার বিষয় হয়ে আছে। অনুবাদকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল শ্রমকে প্রায়ই এক শ্রেণির প্রকাশক, মায় নামিদামি সাহিত্যিকরাও নেহাতই প-শ্রম বিবেচনা করে এক ধরনের তৃপ্তি বোধ করেন বলে মনে হয়। এদেশে সাহিত্যের অন্য যেকোনো মাধ্যমে কাজ করে আপনি স্বীকৃতি পেতে পারেন বটে কিন্তু অনুবাদ? নৈব চ নৈব চ। বিশ্বসাহিত্যেও যত ভালো বই-ই অনূদিত হোক-না কেন সেটি নিয়ে খুব কমই আগ্রহ বা আলোচনা দেখা যায়। এ কারণেই হয়তো অনুবাদক এবং প্রকাশক কেউই পরিশ্রমসাপেক্ষ এই কাজটি করতে গিয়ে 'ভালো' বই অনুবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। আবার কিছু প্রকাশক আছেন যাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের কিছু জনপ্রিয়, বিশেষত রোমাঞ্চোপন্যাস ঘরানার বই অল্প খরচে তরুণ কিন্তু বই প্রকাশে অধীর আগ্রহী অনভিজ্ঞ অনুবাদকদের মাধ্যমে অনুবাদ করিয়ে 'ব্যবসা'র উদ্দেশ্যে দ্রুত প্রকাশে ভীষণ আগ্রহী। এমনকি দ্রুত 'বাজার ধরা'র জন্যে এই ধরনের একটি বই কয়েক জনকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে কোনো রকম সংশোধন বা সম্পাদনা ছাড়াই প্রকাশ করে থাকেন। এই প্রকাশকেরা মনে করেন বইটি বের করে তাঁরা অনুবাদকদের বিরাট উপকার করছেন; তাই অর্থের পরিমাণ নিয়ে মাথা ঘামানো অপরাধেরই সামিল। অরেক ক্ষেত্রেই অনুবাদকদের সাথে প্রকাশকদের গ্রন্থ প্রকাশ-পরবর্তী মনোভাব ভয়ঙ্কর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এর নজির টানতে পারি। এখন দেশের বেশ উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্বেষা'র স্বত্বাধিকারী শাহাদত হোসেন তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সূচনায় আমাদের মতো কজন অনুবাদকের কাছ থেকে বই নেওয়ার জন্যে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকতেন। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে হঠাৎ করে হুমায়ূন আহমেদের বই বের করার ফলে বাজারে কিছুটা 'নাম' ছড়িয়ে পড়লে তিনি আর আমাদের পাত্তা দেননি। এমনকি প্রকাশের জন্যে পা-ুলিপি নিয়ে প্রকাশ করা তো দূরের কথা, পা-ুলিপি হারিয়ে ফেলেছেন, এমনকি যোগাযোগও বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি পরবর্তীতে আমার বইয়ের নতুন মুদ্রণ করলেও আমাকে জানানোর মতো সৌজন্যও দেখাননি, সম্মানী দেওয়া

তো দুরস্ত। আরেক প্রকাশক, আকাশ প্রকাশনীর লোটন, তিনি আমার অনূদিত *ওসামা'জ রিভেঞ্জ* বইটি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু নির্ধারিত সম্মানী দেননি, সৌজন্য কপিও নয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতারক প্রকাশক হলেন শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের সন্দেশ-এর লুৎফর রহমান চৌধুরী। এই ভদ্রলোক বিভিন্ন বিদেশি প্রকাশনা সংস্থার সাথে তথাকথিত চুক্তির কথা বলে নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত বই অনুবাদ করিয়ে নেন। এরপর এসব অনুবাদ উপস্থাপন করে বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা থেকে বিপুল অঙ্কের অনুদান হাতিয়ে নেন, অনুবাদক কিছুই জানতে পারেন না। সন্দেশের প্রতারণার বিস্তারিত ফিরিস্তি আমার তর্জমায় রোদেলা প্রকাশনী থেকে বেরুনো ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের *স্রষ্টার জন্যে লড়াই*-এর ভূমিকায় নেহাত বাধ্য হয়েই উল্লেখ করেছি। এরপর আছেন ঐতিহ্য প্রকাশনীর আরিফুর রহমান নাঈম। বেশ কয়েক বছর আগে, সম্ভবত ২০০৬/৭ সালের দিকে তিনি আমার কাছে এসে ঐতিহ্য ব্ল্যাক নামে পেপারব্যাক বইয়ের নতুন প্রকাশনার সূচনা করার কথা জানিয়ে অনূদিত বই চান। আমি তাঁকে দুটি বই অনুবাদ করে দিই। নাগীব মাফুজের *দ্য ডে দ্য লিডার ওয়াজ কিল্ড* এবং মাইক্রেল ক্রেইটেনের *দ্য টার্মিনাল ম্যান*। জনাব নাঈম প্রথম বইটি প্রকাশ করে আমাকে কয়েক কপি বই সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে পাঠিয়েই ক্ষান্ত দেন। আমি বইটির বিনিময়ে এক পয়সাও সম্মানী পাইনি। দ্বিতীয় বইটি বের পর তিনি তালবাহানা শুরু করেন। এক সময় আমি বিরক্ত হয়ে বইটি অন্য প্রকাশনীতে দিই।

গত ২০১৭ সালের বইমেলায় আমার অনুবাদে অরুন্ধতী রায়ের নতুন উপন্যাস *দ্য মিনিস্ট্রি অভ আটমোস্ট হ্যাপিনেস* প্রকাশ করে কাঁটাবনের জয়তী প্রকাশনী। এর আগে প্রকাশনীর মালিক মাজেদুল হাসান আমার প্রায় হাতে-পায়ে ধরে আমাকে বইটি অনুবাদ করে দেওয়ার অনুরোধ জানালে অন্য ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইটি অনুবাদ করে দিই। মাজেদুল হাসানের সাথে আমার স্পষ্ট মৌখিক চুক্তি ছিল, বই বেরুনোর এক মাসের ভেতর তিনি আমার পুরো সম্মানীর অর্থ মিটিয়ে দেবেন। তিনি তাতে রাজিও হন। কিন্তু দু'বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও মাজেদুল আমার সম্মানীর টাকা পরিশোধ করেননি। নানা তালবাহানায় সময়ক্ষেপণ করে চলেছেন। এমনকি ফোন করলেও তিনি ধরেন না, কিংবা ফোন বন্ধ রাখেন। এটাই দেশের প্রকাশকদের একাংশের সত্যিকারের চেহারা। মুখে এঁরা যতই সাহিত্য-সংস্কৃতির সেবার কথা বলুন, মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়ার দাবি তুলুন, আসলে স্রেফ লেখক/অনুবাদকদের ঘাড়ে পা রেখে ফায়দা লোটাই এঁদের মূল উদ্দেশ্যে।

ব্যক্তি হিসেবে একা আমারই অভিজ্ঞতা এমন হয়ে থাকলে, বাকিদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কেমন বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না বলেই মনে করি। অনুবাদকেরা যে অমানুষিক পরিশ্রম করে এমনি প্রতিদানহীন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সেটাই অবাক করার মতো ব্যাপার। কেবল হৃদয়ের গভীরে এ কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকলেই এটা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এমন প্রতিকূল অবস্থাতেও বাংলাদেশে প্রচুর অনুবাদের কাজ হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধায় এখন খুব সহজেই দুনিয়ার যেকোনো দেশে প্রকাশিত ভালো বইয়ের খবর পাওয়া যায় বলে সেসব সংগ্রহ করে অতি অল্প

সময়ে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমরা গত কয়েক বছর ধরে এক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি লক্ষ করেছি। অনুবাদ গ্রন্থের প্রতি পাঠকদের যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে। দেশে প্রকাশিত ভালো বইয়ের পাশাপাশি পাঠকগণ বিভিন্ন ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ থেকে শুরু করে একেবারে হালের গল্প-উপন্যাসের অনুবাদ আগ্রহের সাথে কিনছেন। গত কয়েক বছরের ২১ শে বইমেলায় আমরা এই বিষয়টি লক্ষ করেছি। পাঠকদের এই আগ্রহকে আবার উপরে উল্লেখিত শ্রেণির প্রকাশকরা নিজেদের অসৎ মতলব হাসিলেও কাজে লাগাচ্ছেন, এটা আগেই বলেছি।

বাংলাদেশে অনুবাদের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমি মনে করি। তবে ব্যক্তিপর্যায়ে গৃহীত প্রয়াস এক্ষেত্রে খুব বেশি দূরে অগ্রসর হতে তেমন একটা কাজে আসবে না বলে ধরে নেওয়া যায়। প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, অনুবাদক ও পাঠকদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে। এটা সবাই জানেন, বর্তমানে যেসব অনূদিত গ্রন্থ বেরুচ্ছে সেগুলোর বেশিরভাগই উপযুক্ত সংস্থার অনুমতিহীন। আন্তর্জাতিক কপিরাইট আইনের আওতায় যথাযথভাবে অনুমতি নিয়ে বই প্রকাশে প্রচুর ঝক্কি রয়েছে। মূলধারার প্রকাশনার পাশাপাশি প্রকাশিত বইয়ের যথাযথ বিপণন এখনও অনূদিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। কেবল অনুবাদ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে উপকারে আসতে পারে।

আমাদের দেশে অনূদিত গ্রন্থের কোনো তথ্যভা-ার নেই। পাঠকেরা জানতে পারেন না কোন বইটি অনূদিত হয়ে বেরিয়েছে, কারা বের করেছে। অনুবাদকেরাও অজ্ঞ থেকে যাওয়ায় দেখা যায় একই বছর একই বইয়ের, বিশেষ করে সেটি যদি পশ্চিমের 'বেস্ট সেলার' হয়, একাধিক অনুবাদ একই বইমেলায় বের হচ্ছে। একাধিক অনুবাদ দোষের কিছু নয়, তবে অনুবাদের মান এবং নতুন একটি অনুবাদের যৌক্তিকতার বিষয়টি সবসময়ই বিবেচনার দাবি রাখে। অনুবাদ গ্রন্থের একটি তথ্যভা-ার প্রণয়ন এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রকাশনা রোধে উপকারে আসতে পারে।

আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অনুবাদের লক্ষ্যে কোন বইটি নির্বাচিত করা হচ্ছে সেটি অনূদিত গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতার বেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেকোনও বই অনুবাদের জন্যে বেছে নিলেই পাঠক-সমাদৃত হবে, এমনটা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। জ্ঞানভিত্তিক মননশীল বই হলে সেটির উপযোগিতা আমাদের পাঠকদের কাছে কতটুকু– বিবেচনা করে দেখা দরকার। অন্যদিকে সৃজনশীল সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে দেখা দরকার আমাদের দেশের পাঠকদের বিশেষ বইটির প্রতি আগ্রহ কতখানি। যেন-তেন প্রকারে যেকোনো একটি বই এর উৎস দেশে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পেতে পারে, কিন্তু এখানে সবর্জনগৃহীত হবে না, যদি এর বিষয়বস্তু পাঠকের মনে আগ্রহ ও প্রভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। আমাদের দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে বেখাপ্পা পটভূমি কিংবা পাঠক নিজেকে সম্পর্কিত করতে অপারগ বোধ করবেন এমন বই অনুবাদ না করাই হয়তো সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হবে।

এই মুহূর্তে এটা অস্বীকার করা যাবে না যে দেশে প্রতি মাসেই নতুন নতুন অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। পুরনোদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন নতুন অনুবাদক বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ/নিবন্ধ/উপন্যাস অনুবাদ করে সাহিত্যের এই শাখার কলেবর বাড়িয়ে তুলছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রেই অনুবাদকদের কাজে যত্নের ঘাটতি বা কাজের গুরুত্ব বোঝার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়ে গেছে। প্রায়ই লক্ষ করা যাচ্ছে যে অনুবাদের কৌশল না জানায় এমন উদ্ভট একটা রূপ তৈরি হচ্ছে যে বাংলা অনুবাদের অর্থ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ অনুবাদই ইংরেজি ভাষানির্ভর। অন্যান্য ভাষার রচনাও মূলত ইংরেজি অনুবাদ থেকেই তর্জমা করা হয়ে থাকে। যাহোক, অনভিজ্ঞতার কারণেই সম্ভবত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুবাদককে অনুবাদে বিশেষ করে ক্রিয়া পদ, সর্বনাম পদের প্রয়োগে ভুল করতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া, এমনকি ইংরেজি ভাষার প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা ইত্যাদি সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা না থাকায় এঁরা অবলীলায় প্রবাদ-বাগধারারও আক্ষরিক অনুবাদ করে বসছেন, এবং তাতে অনুবাদকর্মটি এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ নিচ্ছে। এই বিষয়টি জ্বলন্ত নজির দিয়েই প্রমাণ করতে চাই। বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের বিখ্যাত বই অনুবাদ করে আসছেন জনাব প্রমিত হোসেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের তালিকা নেহাত ক্ষুদ্র নয়। গুন্টার গ্রাস, এ.পি.জে. আব্দুল কালাম, অরুন্ধতী রায় থেকে শুরু করে দুনিয়ার এমন কোনো লেখক নেই যাঁর বই তিনি অনুবাদ করেননি। কিন্তু তার যেকোনো তর্জমা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেই বুঝবেন অনুবাদের কী হাল! জনাব হোসেন মার্গারেট অ্যাটউডের বুকার পুরস্কার পাওয়া গ্রন্থ *দ্য ব্লাইন্ড অ্যাসাসিন* অনুবাদ করেছিলেন পুরস্কার ঘোষণার ঠিক পরপর। পরে এটি আমিও অনুবাদ করি, বেরিয়েছিল 'সন্দেশ' থেকে। সন্দেশের কীর্তির কথা তো আগেই বলেছি। অ্যাটউড তাঁর অভিভূতকারী ভাষায় একটি পরিবারের দুটি বিপরীত মেরুর চরিত্রের দুই বোনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সেই কাহিনির ভেতর ভীষণ মুন্সিয়ানার সাথে জুড়ে দিয়েছেন অসাধারণ বিজ্ঞান কল্পগল্পের আদলে আরেকটি কাহিনি। যাক সেকথা। বলছিলাম, এই বইয়ে অ্যাটউড face the music, for a song, go to the wolves– এর মতো বিভিন্ন বাগধারা ব্যবহার করেছেন। প্রমিত হোসেন অবলীলায় এগুলোর তর্জমা করেছেন, আমি সংগীতের মোকাবিলা করব, গানের বিনিময়ে,

নেকড়ের কাছে যাব, ইত্যাদি! গুন্টার গ্রাসের টিনড্রাম অনুবাদের বেলায়ও তিনি এই সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। Bad blood-বাগধারার অনুবাদ করেছেন দূষিত রক্ত! প্রমিত হোসেন কিন্তু দমার পাত্র নন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্ম দুহাতে চালিয়ে যাচ্ছেন। তো, অনুবাদ কাজে লক্ষ ভাষার পাশাপাশি উৎস-ভাষার বিভিন্ন কৌশল জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি।

শেষে একটি কথা বলতে চাই। অনুবাদ সাহিত্য মূল ধারার সাহিত্য থেকে ব্যতিক্রম কিছু নয়। আমরা তো জানি, সারা বছর দেশে হাজার হাজার বই বের হচ্ছে, আমরা এ-ও জানি প্রকাশিত গ্রন্থের সবগুলোই ভীষণ মানসম্পন্ন এমনটা কেউই দাবি করেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভালোটিই সময়ের বিচারে টিকে যায়, স্থায়িত্ব পায়। ঠিক এভাবেই এই মুহূর্তে অনুবাদের যে শোরগোল চলছে সেটা এক সময় শান্ত হয়ে আসবে, অনুবাদকেরা পরিপক্ব হবেন, সঠিক অনুবাদে মনোযোগী হয়ে সত্যিকার অর্থে অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবেন বলে মনে করি। এটা যাঁদের ক্ষেত্র নয়, তাঁরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই একসময় হারিয়ে যাবেন। শিল্পসাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমের মতোই ব্যাপারটা।

[লেখক: অনুবাদ শিল্পী, ব্যাংক কর্মকর্তা]